ফ্রান্সিস সমগ্র (৪)

অনিল ভৌমিক



নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : দুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ, কাশীবোস লেন কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : অজয় গুপ্ত

যীশুর কাঠের মূর্তি



কর্সিকা দ্বীপের বোনিফেসিও বন্দর থেকে এবার ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে দেশে ফেরার জন্য বারবার বলতে লাগল। দেশ ছেড়ে এসেছে অনেকদিন। ওরা প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ফ্রান্সিসকে রাজী করাতে না পারলে কিছুই হবে না। বন্ধুরা মারিয়াকেও বারবার অনুরোধ করতে লাগল, রাজকুমারী—আপনি ফ্রান্সিসকে রাজী করান।

মারিয়ার নিজেরও এইসব বিদেশ বিভুঁইয়ে পড়ে থাকতে মন চাইছিল না। তবু সাবধানে কথাটা পাড়ল। ফ্রান্সিসকে বলল, এবার দেশেই ফিরে চলো। পরে আবার না হয় সমুদ্রযাত্রায় বেরুনো যাবে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, মারিয়া, দেশের টান সকলেরই থাকে। আমারও আছে। কিন্তু দেশে ফিরে ঐ যে সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন—এ আমার ভালো লাগে না। তবু তোমাদের বিশেষ করে তোমার অনুরোধে দেশের দিকে জাহাজ চালাতেই বলছি ফ্লাইজারকে। কিন্তু আবার যদি কোনো রহস্যের সন্ধান পাই তবে আবার লেগে পড়বো।

বেশ তো—দেখাই যাক। ফেরার পথে আবার কোনো রহস্যের সন্ধান নাও তো পেতে পারো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেখা যাক।

মারিয়া বলল, তোমার বন্ধুরা কেউ কেউ বলছিল পিসায় নেমে স্থলপথে দেশে ফিরে যাওয়া যায়।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল, না, না। স্থলপথে যেতে অনেক বেশি সময় লাগবে। তার ওপরে স্থলপথে বিপদ-আপদ অনেক বেশি। পরিষ্কার আকাশ আর তেজি হাওয়া পেলে জাহাজে অনেক তাড়াতাড়ি দেশে পৌঁছোনো যাবে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ তখন বন্দর থেকে অনেকটা দূরে মাঝসমুদ্রে চলে এসেছে। ফ্রান্সিস ডেক-এ উঠে ফ্লাইজারকে বলল, দিক ঠিক রেখে দেশের দিকে জাহাজ চালাও। ভাইকিং বন্ধুদেব তখন আনন্দ দেখে কে ! সবাই ছুটোছুটি করে সব পালগুলো টানাটানি করে দড়ি বেঁধেছেঁদে জাহাজের গতি বাড়াতে লাগল। পালগুলো যথেষ্ট হাওয়া পাচ্ছে। তবু সাত-আটজন ভাইকিং দাঁড়ঘরে নেমে এল। দাঁড় বাইতে লাগল। গতি চাই, আরো গতি। জাহাজ দ্রুত জল কেটে ঢেউ ভেঙে চলল।

তিন-চারদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ভাইকিংরা দেশে ফেরার চিন্তায় খুব খুশি। যার সবচেয়ে বেশি সাবধানী হওয়া উচিত ছিল সেই নজরদার পেড্রোও খুশিতে ওর কাজে ঢিলে দিল। এক রাতে মাস্তুলের মাথায় ওর নির্দিষ্ট জায়গায় বসে নজর রাখল না। ডেক-এ অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিজেও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ভাবল,

অল্পক্ষণ ঘুমিয়ে নজরদারির জায়গায় গিয়ে বসবে। পেড্রোর এই ভুলের জন্যে সবাইকে তার খেসারত দিতে হলো।

তখন ভোর হয় হয়। পেড্রোর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসতেই সামনে দেখল খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে এক কাফ্রি। পেড্রো ভয়ার্ত চোখে চারদিকে তাকাল। দেখল ওদের জাহাজের গায়ে গা লাগিয়ে আর একটা জাহাজও চলেছে। ডেক-এ যেখানে যেখানে ওর বন্ধুরা শুয়ে ঘুমুচ্ছে তাদের সকলের সামনে একজন করে খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি দাঁড়িয়ে। কাফ্রিরা নিঃশব্দে ওদের ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এই জাহাজে উঠে এসে জাহাজ দখল করে নিয়েছে।

ভোরের আধো আলো, আধো অন্ধকারে পেড্রো বোকার মতো তাকিয়ে রইল কাফ্রিটার দিকে। একবার ভাবল, চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। কিন্তু কাফ্রিটা ওর মনোভাব বুঝতে পেরে তরোয়ালের ডগাটা পেড্রোর গলায় ঠেকিয়ে মাথা দুলিয়ে হাসল। ঐ কুচকুচে কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো চক্‌চক্ করে উঠল।

ভোর হলো। ডেক-এ শুয়ে ঘুমিয়ে থাকা ভাইকিংদের ঘুম ভাঙতে লাগল। চোখ মেলে সবাই দেখল খোলা তরোয়াল হাতে কাফ্রি যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সামনে। ওরা অসহায় চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। ওদের তখন একটাই ভাবনা কেবিনঘরে বোধহয় ফ্রান্সিস হ্যারিরা নিরাপদেই আছে।

একটু পরেই ভোরের নরম আলো পড়ল সমুদ্রে জাহাজ দুটোয়। তখনই ডেকঘর থেকে একে একে উঠে আসতে লাগল ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারিরা। প্রত্যেকের পেছনেই কাফ্রি যোদ্ধারা। ফর্সা গা আরবীয় যোদ্ধারাও আছে তাদের মধ্যে। এত নিঃশব্দে এই কাফ্রি যোদ্ধারা জাহাজটা দখল করে ফেলল যে ভাইকিংরা এতটুকুও বুঝতে পারল না।

ফ্রান্সিসরা ডেক-এ উঠে আসতে একটি আরবীয় যোদ্ধা গ্রীক ভাষায় বলল, সবাই জাহাজের রেলিঙের ধারে সারি দিয়ে দাঁড়াও। ভাইকিংরা গ্রীকভাষা কিছুই বুঝল না। তখন হ্যারি গলা চড়িয়ে ওদের ভাষায় কথাটা বুঝিয়ে বলল। এবার ভাইকিংরা রেলিঙের ধারে সারি বেঁধে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস এবার ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে পেড্রোকে খুঁজতে লাগল। দেখলও পেড্রোকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পেড্রো। ফ্রান্সিস ডাকল, পেড্রো। পেড্রো চমকে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ছুটে এসে ফ্রান্সিসের দুই হাত জড়িয়ে ধরল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমরা এভাবে বন্দী হবো। ফ্রান্সিস, আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্যে আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও, দাও।

এখন ওসব কথা অর্থহীন। এখন এরা আমাদের নিয়ে কী করবে সেই কথা ভাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একজন আরবী সৈন্য এসে পেড্রোর পিঠে তরোয়ালের খোঁচা দিল। পেড্রো সারির মধ্যে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। দু'তিনজন ভাইকিং চিৎকার করে

বলে উঠল, ফ্রান্সিস, পেড্রোকে ফাঁসিতে লটকাও। অনেকে ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। ফ্রান্সিস হাত তুলে সবাইকে শান্ত হয়ে থাকতে বলল। এইভাবে বিনা বাধায় বন্দী হওয়াটা ভাইকিংরা মেনে নিতে পারল না। সবাই মনে মনে গজরাতে লাগল।

তখন সকাল হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় রোদ ঝিকিয়ে উঠছে। জোর হাওয়া বইছে। সাগরপাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। দু'টো জাহাজই পাশাপাশি চলেছে।

ক্যারাভেল জাহাজ থেকে এক আরবীয় যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের জাহাজের রেলিং ধরে উঠে এল। আরবী ভাষায় গলা চড়িয়ে কী বলল। যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। বোঝা গেল কেউ একজন ফ্রান্সিসদের জাহাজে আসবে এবং সে যে দলপতি এটাও বোঝা গেল।

একটু পরেই ক্যারাভেল জাহাজের ডেক-এ উঠে এল একজন আরবীয়। মাথায় কান-ঢাকা কালো বিড়ে বাঁধা পাগড়ি মতো। সে দু'একজন যোদ্ধার সাহায্যে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিসদের সারির কাছে এল। দলপতির গোঁফ আছে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। গায়ের রং ফর্সা। শরীরটা রোগাই।

দলপতি এবার ফ্রান্সিসদের দেখে খুব খুশি হলো। দু'তিনজন যোদ্ধা অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে খুশিমুখে হাসল। ফ্রান্সিস তখনও ভেবে পাচ্ছে না এরা কারা? ফ্রান্সিসদের দেখে দলপতির এত খুশি হবার কারণ কী?

এবার দলপতি গ্রীক ভাষায় বলল, তোমাদের দেখেই তো বুঝতে পারছি তোমরা এই ভূমধ্যসাগরের এলাকার লোক নও—তোমরা বিদেশী। এক হ্যারি বাদে ফ্রান্সিসরা কেউই কথাটার অর্থ বুঝতে পারল না। হ্যারি গ্রীক ভাষা মোটামুটি বোঝে। বলতেও পারে। হ্যারি ভাঙা ভাঙা গ্রীকভাষায় বলল, আমরা ভাইকিং। বীরের জাতি।

দলপতি এবার হ্যারির কাছে এল। হেসে বলল, হ্যাঁ তোমাদের ভাইকিং জাতির নাম আমরা শুনেছি। জাহাজ চালাতে দক্ষ তোমরা, আবার লুঠপাটও করো।

না—আমরা জলদস্যুতা করি না। হ্যারি বলল।

যাক গে—শোন—আমার নাম আল জাহিরি—আমি বণিক। দলপতি বলল।

আপনার কীসের ব্যবসা? হ্যারি বলল।

মানুষ কেনাবেচা। আল জাহিরি কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠল। হ্যারি বুঝল—খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। আল জাহিরির জাহাজে নিশ্চয়ই কয়েদখানা মতো আছে। সেটাতে মানুষদের বন্দী করে রাখা হয়। তারপর ক্রীতদাসদের বিকিকিনির হাটে বিক্রি করা হয়। হ্যারি বলল, বুঝেছি—আপনি আমাদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবেন।

ঠিক তাই—আল জাহিরি হেসে বলল, এটাই আমার ব্যবসা।

হ্যারি দেখল, আল জাহিরির গায়ে বেশ দামী রেশমি কাপড়ের সোনালি জরি বসানো পোশাক। গলায় মুক্তোর মালা। হ্যারি একটু হেসে বলল, তাহলে আপনার ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে?

আল জাহিরিও হাসল। বলল, হ্যাঁ—তবে এবার খুব ভালো দাম পাবো।

কেন? হ্যারি জানতে চাইল।

কারণ—ইউরোপীয় মানুষ আমরা কমই পাই। এবার এতগুলি যুবক ইউরোপীয়—ওঃ অনেক দাম পাবো। আল জাহিরি বলল। তারপর মারিয়াকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, এটার জন্যেই যা দাম পাবো তাতে কয়েক বছর আর মানুষ না ধরলেও চলবে।

হ্যারি বলল, মুখ সামলে কথা বলুন—ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী মারিয়া। আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী।

আল জাহিরি চোখ বড় বড় করে বলল, রাজকুমারী, বাব্বা—তাহলে তো দর আরও চড়াতে হবে।

হ্যারি কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। চুপ করে রইল। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে আল জাহিরির সঙ্গে ওর যা কথাবার্তা হয়েছে সবই বলল।

সব শুনে ফ্রান্সিস গভীর চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিসরা জানে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা কী নির্মম নিষ্ঠুর হয়। দয়া মায়া বলে কোনো বোধই থাকে না। বন্দী মানুষদের দেখে পশুর মতো।

আল জাহিরি চিৎকার করে বলতে লাগল, সব কটাকে আমাদের ক্যারাভেল-এ নিয়ে যাও। কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। তারপর মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ইনি নাকি রাজকুমারী। ইনি মুক্ত থাকবেন।

হ্যারি বলে উঠল, না ইনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

তা কি করে হয়—আল জাহিরি বলল, একে কত যত্নে রাখতে হবে। কয়েদখানায় থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে। না, না—রাজকুমারী আলাদা কেবিনঘরে থাকবে।

হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাগুলো বুঝিয়ে বললো। অন্য ভাইকিং বন্ধুরা শুনল সে কথা। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল, আল জাহিরি, দেখছেন তো রাজকুমারীকে আলাদা করে রাখতে কেউ রাজী নয়। রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

আল জাহিরি ভাইকিংদের ক্রুদ্ধ চেহারা আর ধ্বনি শুনে একটু ভাবনায় পড়ল। ভাইকিংরা নিরস্ত্র। ওর পাহারাদারদের হুকুম দিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরস্ত্র ভাইকিংদের মেরে ফেলা যায়। কিন্তু তাতে কী লাভ? বরং বাঁচিয়ে রাখলে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা পাবে। শুধু রাজকুমারীকে বিক্রি করলেই হাজার কয়েক স্বর্ণমুদ্রা মিলবে। কাজেই আল জাহিরি কোনো গোলমালে যেতে চাইল

না। মারিয়াকে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল, রাজকুমারী, আপনি কি কয়েদখানার অন্ধকারে পচতে চান না কোনো কেবিনঘরে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকতে চান?

মারিয়া বলল, আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাই না। আমার স্বামী আর তার বন্ধুরা যেখানে যেভাবে থাকবে আমিও সেখানে থাকবো।

কী মুশকিল—তাতে আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ক্রীতদাসের হাটে আপনার দাম কমে যাবে যে। আল জাহিরি মাথা নেড়ে নেড়ে বলল।

সেসব আমি বুঝি না। মারিয়া বলল।

আল জাহিরির ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় কথা বিস্কো শাঙ্কোরা বুঝল। ওরা আবার একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো।

এবার আল জাহিরি বলল, আমি ব্যবসাদার লোক—মারামারি কাটাকাটির মধ্যে নেই। তোমরা সবাই ক্যারাভেলের কয়েদখানায় থাকবে। মনে থাকে যেন, পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।

আল জাহিরি নিজেদের ক্যারাভেলে চলে গেল। কাফ্রি আর আরবী পাহারাদার এবার ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে গ্রীক ভাষায় চিৎকার করে বলল, ক্যারাভেলে চলো সব। কেউ চালাকি দেখাতে গেলেই মরবে।

হ্যারি ওদের দেশীয় ভাষায় কথাগুলি বন্ধুদের বুঝিয়ে বলল।

শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না, আমাদের জাহাজ ছেড়ে আমরা যাবো না। বন্ধুরা হৈহৈ করে শাঙ্কোকে সমর্থন করল। পাহারাদার সৈন্যরা বুঝল ওরা ক্যারাভেল-এ যেতে আপত্তি করছে। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে সৈন্যদের থামাল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, ভাইসব, আমরা ভালো করে জানি আল জাহিরি আমাদের মেরে ফেলবে না। তাতে ওর ব্যবসারই ক্ষতি। তবে নিরস্ত্র অবস্থায় লড়াইয়ে নামলে আমরা অনেকেই আহত হবো। আমি এটা চাই না। এখন লড়াই নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ক্যারাভেল-এ চলো। বন্দীজীবন মেনে নাও। সময় সুযোগ বুঝে যা করবার করা যাবে। ক্যারাভেল-এ চলো সব।

ভাইকিং বন্ধুরা বুঝল যে এই অবস্থায় ফ্রান্সিসের কথাই মেনে নিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পাহারাদারদের নির্দেশমতো ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠতে লাগল।

আল জাহিরির সৈন্যদের পাহারার মধ্যে ভাইকিংরা ক্যারাভেল-এ গিয়ে উঠল। ক্যারাভেল-এর সিঁড়ি বেয়ে একেবারে নিচের কয়েদখানার সামনে এল সবাই। কয়েদখানার লোহার দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে দু'তিনজন পাহারাদার। একজন গিয়ে লোহার দরজা খুলে দিল। ঠন্ঠন্ শব্দে দরজা ঠেলে খুলে ভাইকিংদের

ঢোকানো হতে লাগল।

এরকম কয়েদখানা ভাইকিংরা আগেও দেখেছে। কিন্তু মারিয়া তো দেখেনি। লোহার মোটা মোটা গরাদ দেওয়া। মারিয়া এইবার প্রথম বেশ ভীত হলো। এখানে তো পশুর মতো থাকতে হবে। মারিয়া এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত ধরল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মনের অবস্থা ভালোই বুঝতে পারল। মারিয়ার হাতে চাপ দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, ভয়ের কিছু নেই। তবে কষ্ট হবে তোমার। তুমি যদি ওপরের কেবিনঘরে থাকতে চাও—

মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, না—আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকবো। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। কয়েদঘরে ঢুকে দেখল আগে থেকেও পাঁচ-ছ'জন বন্দী রয়েছে। সবাই কাফ্রি। শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ। বোধহয় এই এলাকার লোক। জোব্বামতো চাষীদের পোশাক পরনে। একটা ব্যাপার দেখে ফ্রান্সিস খুশি হলো যে এই কয়েদঘরে ওদের হাত বেঁধে রাখা হলো না। তার কারণটাও ফ্রান্সিস ঠিক বুঝতে পারল—হাত-পা অনেকদিন বেঁধে রাখলে কড়া পড়ে যায়। ক্রীতদাস বিক্রির হাটে দাম কমে যায়। সুস্থ সবল মানুষ চাই। তবে না দাম উঠবে।

ভাইকিংদের মধ্যে কিছু বসে পড়ল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল কাঠের পাটাতনে, কেউ কেউ ছোট জায়গাতেই পায়চারি করতে লাগল।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া এককোণায় বসল। হ্যারি এসে ওদের পাশে বসল। তিনজনেই চুপচাপ বসে রইল। এমনভাবে এত দ্রুত ওরা বন্দী হয়ে যাবে এটা কল্পনাও করেনি।

কিছু পরে লোহার দরজা শব্দ তুলে খোলা হলো। তিনজন কাফ্রি খাবার নিয়ে এল। এক মস্তবড় কাঠের থালায় গোল করে কাটা রুটি। মস্তবড় গামলায় আলু টমেটোর মাংস ছড়ানো স্যুপ। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। আজ ফ্রান্সিস কিন্তু সেই কথাটা বলতে পারল না—পেট পুরে খাও—খেতে ভালো না লাগলেও খাও। সত্যিই আজ ফ্রান্সিসের মন চিন্তাভারাক্রান্ত। এই তলার ডেক-এর কয়েদখানায় থাকার অভিজ্ঞতা ওদের আছে। কিন্তু মারিয়া কি এই কঠোর জীবন কাটাতে পারবে? তার ওপর অসুখ থেকে উঠে মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। হঠাৎ-ই ফ্রান্সিসের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ও চুপ করে বসে রইল। ওর সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হলো মারিয়ার জন্যে।

একসময় বিস্কো উঠে এলো। ভালো লাগছে না। এভাবে বন্দী হওয়া স্বপ্নেও ভাবেনি। সময় কাটাবার জন্যে পুরনো বন্দীদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বিস্কো ওদের কাছে গেল। কাফ্রি ক'জনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। সবই বৃথা। কাফ্রিগুলো যে ভাষায় কথা বলল, সে তো অবোধ্য। কথা বলার সময় ওদের অঙ্গভঙ্গি দেখে যা কিছু বুঝল সেটাও তেমন কিছু নয়। অনেকদিন আগে আল জাহিরির দল নাকি ওদের গ্রাম থেকে ধরে এনেছে। ভাগ্যে কী আছে ওরা জানে

না।

শুধু একজন শ্বেতাঙ্গ অল্পস্বল্প স্প্যানিস ভাষা বলতে পারে। তার সঙ্গেই বিস্কো কথাবার্তা বলতে লাগল। সে তার নাম বলল পারিসি। পারিসি বিস্কোকে বলল, তোমরা তো দেখছি এই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের লোক নও। তোমারা এখানে কেন এসেছো? ধরাই বা পড়লে কীভাবে? বিস্কো তখন ওদের কথা, ফ্রান্সিসের কথা—কোন দ্বীপ থেকে ফ্রান্সিস কী উদ্ধার করেছে সবকিছুই সংক্ষেপে বলল। পারিসি বলল, আমিও একটা খুব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ উদ্ধার করেছিলাম। দিয়েছিলাম সাইপ্রাসের বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানকে। সেই গ্রন্থের প্রথম পাতায় আঁকা ছিল যীশুর একটা ছবি। এবার লুসিগনান চাইল সেই যীশুর মূর্তিটা। নিশ্চয়ই আমিই সেই মূর্তিটা লুকিয়ে রেখেছি এই সন্দেহ করে আমার ওপরে চলল অত্যাচার। পারিসি থামল।

তারপর? বিস্কো জানতে চাইল।

আমাকে আবার সেই দুরারোহ জেরস পাহাড়ে পাঠাল। আমি সুযোগ বুঝে পালালাম। চলে এলাম কেরিনিয়া বন্দরে। পর্তুগীজদের একটা জাহাজে উঠে পড়লাম। জাহাজটা তখন পর্তুগালেই যাচ্ছিল। হঠাৎই আল জাহিরি আমাদের জাহাজ আটকাল। লড়াই হলো। নৃশংস আল জাহিরি প্রায় সবাইকে মেরে ফেলল। কয়েকজন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা মেরিই জানে হাঙরের পেটে গেল না পালাল। আমাকে আর ঐ কাফ্রি কয়েকজনকে রেহাই দিল। এরমধ্যে অবশ্য একজন কাফ্রি পালাতে গিয়ে মারা গেল। পারিসি থামল।

বিস্কো বলল, তুমি কী একটা গ্রন্থের ছবি যীশুর মূর্তি এসবের কথা বললে।

সে অনেক কথা। পারিসি বলল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। বলল, আমার বন্ধু ফ্রান্সিসকে নিয়ে আসছি। তুমি তাকে ব্যাপারটা বলো তো।

একটু পরেই বিস্কো, ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মারিয়াকে সেখানে নিয়ে এল। পারিসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার কথা বিস্কোর কাছে কিছু শুনলাম। এবার সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো তো।

পারিসি বলল, সাইপ্রাস দ্বীপের নাম শুনেছেন? ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। হ্যারি বলল—শুনেছি।

মারিয়া বলল, সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরের পুবদিকের শেষ দ্বীপ।

ঠিক বলেছেন। পারিসি বলল। তারপর বলল, সাইপ্রাসের একটু ইতিহাস বলি। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শেষ করে প্রথম রিচার্ড ফেরার পথে সাইপ্রাসে আসেন। তখনকার শাসক আইজাক কমেনাসের কাছে দাবি জানালেন, এখানে তাঁর যে জাহাজগুলো আছে সেসব আর তাঁর দেশের নাবিকদের ফেরৎ দিতে হবে। আইজাক মানল না সেই দাবি। প্রথম রিচার্ড সাইপ্রাসবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে সাইপ্রাস দখল করলেন। তাঁর অনুগত গী দ্য লুসিগনানকে সাইপ্রাসের শাসক নিযুক্ত করে তিনি

চলে গেলেন। গী দ্য লুসিগনানও আইজাকের মতো সাইপ্রাসবাসীদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। পারিসি থামল।

আসল কথাটা বলো। ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই বলছি—পারিসি বলল, এবার একজন প্রকৃত খ্রীস্টিয় সাধুর কথা বলি। তাঁর নাম নিওফিতস। ছোটবেলা থেকেই তিনি খ্রীস্টিয় সাধু হতে চেয়েছেন। উত্তর সাইপ্রাসের বন্দর-নগর কেরিনিয়ার কাছে এক গির্জা তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে লোকজনের ভিড়ে বিরক্ত হয়ে তিনি জেরস পাহাড়ে এক গুহায় একেবারে নির্জনে বাস করতে লাগলেন।

তারপর? হ্যারি বলল।

সাত বছর ধরে এক কষ্টকর জীবন কাটালেন তিনি। ধারেকাছের পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে খাদ্য, পানীয়, জল দিয়ে আসতো। নিওফিতস নিজে কারো কাছে কিছু চাইতেন না। এদিকে মহান সাধুপুরুষ হিসেবে দেশবাসীর কাছে পরিচিত হন তিনি। এখন ঐ এলাকার নাম পাফোস। পাফোসের গীর্জার পাদ্রীরা নিওফিতসকে বারবার অনুরোধ জানাতে তিনি সেই গুহার আবাস ছেড়ে নিচে নেমে আসেন। শুরু হলো নিওফিতসের নতুন জীবন। খ্রীস্টিয়মণ্ডলীর কাজেকর্মে তিনিই নিয়মশৃঙ্খলা আনেন এবং এই নিয়ে তিনি বই লিখতে শুরু করেন।

ঐ বইটাই বোধহয় তুমি পেয়েছ! ফ্রান্সিস বলল।

না, কারণ তখন সবেমাত্র নিওফিতস লিখতে শুরু করেছিলেন। পারিসি বলতে লাগল, অদ্ভুত মানুষ এই নিওফিতস। এত খ্যাতি, এত জনপ্রিয়তা তাঁর সহ্য হলো না। তিনি আবার গুহাবাসী হলেন। জেরস পাহাড়ের যে গুহায় ছিলেন, এই গুহাটা সেটার চেয়েও অনেক উঁচুতে। প্রায় অসম্ভব সেই গুহায় যাওয়া। নিওফিতস কোনোভাবে সেই গুহায় গিয়ে উঠলেন। নিজেই ওখানে বসে বসে শুকনো ঘাস, গাছের ডাল দিয়ে একটা মই করলেন। প্রতিদিন সকালে সেই মই নামিয়ে দিতেন নিচের একটু সমতলমতো একটা জায়গায়। পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা খাবার-টাবার রেখে আসত সেখানে। সবাই চলে গেলে নিওফিতস দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে খাবার নিতেন তারপর উঠে যেতেন। সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মইটাও টেনে তুলে নিতেন যাতে কেউ ঐ মই বেয়ে তাঁর গুহায় যেতে না পারে, তাঁকে বিরক্ত করতে না পারে। পারিসি থামল।

তারপর? মারিয়া জিজ্ঞেস করল।

পারিসি বলতে লাগল—নিওফিতস যে খ্রীস্টমণ্ডলীর পরিচালনা পদ্ধতি নিয়ে বই লিখেছেন—এটা এখানকার সব বিশপ ধর্মযাজকরা জানতেন। তাঁরা আমাকে দায়িত্ব দিলেন—নিওফিতসের বইটা নিয়ে আসতে। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, আমি অনেক কষ্টে সমতলমতো জায়গাটায় পৌঁছলাম। কিন্তু নিওফিতসের গুহায় উঠতে পারলাম না। নিচের যে সমতল জায়গায় পাহাড়ি গাঁয়ের লোকেরা

খাবার রেখে যেত, আমি সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে। কাঠকুটো জ্বেলে আমি রাত কাটাতাম। পারিসি একটু থেমে বলতে লাগল—আমি কয়েকদিন পরে পরেই দেখতাম দড়ির মই ফেলে নিওফিতস খাবার-টাবার নিয়ে যেতেন। আশ্চর্য! জলভরা পাত্র নিতেন না। বুঝলাম নিশ্চয়ই ঐ গুহার কাছে পাহাড়ি ঝর্ণা আছে। একদিন নিওফিতস মইটা তুলে নেবার আগে আমি মইয়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দিলাম। নিওফিতস সেটা বুঝলেন না। তিনি ওপরে উঠে মই টেনে তুলে নিলেন। দড়িটা ঝুলতে লাগল। পারিসি থামল।

তাহলে মই নামিয়ে তুমি তো উঠতে পারতে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ—আমি তাই করেছিলাম। একনাগাড়ে প্রায় দিন সাতেক নিওফিতস নিচে নামলেন না। তখন তাঁর বয়েস সত্তরেরও বেশি। বুঝলাম, তিনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি আর অপেক্ষা না করে দড়িতে বাঁধা মইটা টেনে নামালাম। খাবার-টাবার নিয়ে মই বেয়ে সেই গুহার মুখে উঠে এলাম। বাইরে ঝকেঝকে রোদ। গুহার ভেতরটা কিন্তু অন্ধকার। আমি আস্তে আস্তে গুহার মধ্যে ঢুকলাম। অন্ধকারটা চোখে একটু সয়ে আসতে দেখলাম গুহার গায়ে মশাল বসানো। কিন্তু তখন নিভে গেছে। অস্পষ্টভাবে দেখলাম এবড়োখেবড়ো মেঝেয় মোটা কাপড়ের বিছানা। তারপরেই একটা অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু এখন নিভে গেছে। বিছানায় অসাড় শুয়ে আছেন নিওফিতস। প্রথম দেখে বুঝলাম না বেঁচে আছেন কিনা। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর দুই পা চুম্বন করলাম। মোটা কাপড়ে ঢাকা একটা পা যেন একটু নড়ল। আমি তাড়াতাড়ি এসে নিওফিতসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি নিওফিতস আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সর্দিবসা গলায় খুব আস্তে বললেন—তুমি কে? আমি বললাম—আমি পারিসি। আপনার সেবা করতে এসেছি।

আমার সেবার প্রয়োজন নেই। সেই একইভাবে বললেন।

আমি মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললাম, আপনার সেবা করতে পারলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। যীশুর নামে বলছি—আমাকে এটুকু সুযোগ দিন। নিওফিতস কী ভাবলেন। তারপর কাশতে লাগলেন। আমি আস্তে আস্তে তাঁর বুকে হাত বুলোতে লাগলাম। কাশির কষ্টটা কমতে আগের মতোই মৃদুস্বরে বললেন—বইটা শেষ করতে পারিনি। বইটা শেষ করার জন্য আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। কিন্তু শরীরে জোর পাচ্ছি না। ওরকম এক মহাপুরুষের এমন অসহায় অবস্থা দেখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। কেঁদে ফেললাম। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, আমি আপনাকে সুস্থ করে তুলবো।

কিন্তু এই ঠাণ্ডায় এখানে তুমি থাকবে কী করে? উনি বললেন। আমি বললাম—আমার জন্য ভাববেন না। খাবার এনেছি। অনুমতি দিন—আপনাকে

যেন খাওয়াতে পারি।

বেশ। নিওফিতস বললেন। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল—আমি দেখলাম নিভে-যাওয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে চকমকি পাথর রয়েছে। গুহার একপাশে বেশ শুকনো ডালপালাপাতা কাঠ রয়েছে। আমি কিছু কাঠ ডালপাতা দিয়ে অগ্নিকুণ্ড সাজালাম। তারপর চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। সেখান থেকে আগুন নিয়ে পাথরের খাঁজে রাখা মশাল জ্বাললাম। এতক্ষণে গুহার ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমার কোমরের ফেট্টির কাপড়টা খুলে আগুনে গরম করে করে সেই মহাপুরুষের পায়ে-হাতে-বুকে সেঁক দিতে লাগলাম। গুহাটাও ততক্ষণে বেশ গরম হয়ে গেছে। নিওফিতস এবার অসাড় হাত পা শরীরে সাড় পেলেন। হাত-পা নাড়লেন। উঠে বসার চেষ্টা করলেন। আমি পিঠে দু'হাত জড়িয়ে আস্তে আস্তে তাঁকে বসালাম। খেতে দিলাম। উনি আস্তে আস্তে খেতে লাগলেন। আমার সেদিন যে কী আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারবো না। এবার জল খাওয়ানো। জল তো আমি আনিনি। পারিসি থামলো।

ধারে কাছে নিশ্চয়ই পাহাড়ি ঝর্ণা ছিল। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক তাই—পারিসি বলল, উনি বললেন, এই গুহার শেষে গিয়ে দেখ একটা পাহাড়ি ঝর্ণা পাবে। সেখান থেকে জল নিয়ে এসো। আমি গুহার শেষে এসে দেখলাম গুহার ছোট্ট মুখ। তারপরেই একটা বড় ঝর্ণা। সেই জল নিয়ে এসে নিওফিতসকে খাওয়ালাম, নিজেও খেলাম। নিওফিতস আবার শুয়ে পড়লেন। আমিও খাওয়া সেরে ঐ এবড়োখেবড়ো মেঝের একপাশে শুয়ে পড়লাম।

তারপর? হ্যারি বলল।

এ ভাবেই সেবা-শুশ্রূষা করে নিওফিতসকে অনেকটা সুস্থ করে তুললাম। উনি কাগজ-কলম নিয়ে প্রত্যেকদিনই গ্রন্থটি লিখতেন। বোধহয় শেষ হয়ে যেত লেখা। কিন্তু শীতকাল পড়তেই তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তিনি দেহরক্ষা করলেন। আমি সারারাত কাঁদলাম। তারপর সেই শেষ না হওয়া গ্রন্থটা নিয়ে নিচে নেমে এলাম।

গ্রন্থ পেয়ে তো সাইপ্রাসের শাসকের খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কী এমন ঘটল যে তোমাকে পালাতে হলো? ফ্রান্সিস বলল।

সেটাই সমস্যা। গ্রন্থটির প্রথম পাতায় সাধু নিওফিতস যীশুর একটি কাঠের মূর্তি এঁকেছিলেন। এত জীবন্ত ছবি খুব কম দেখা যায়। এখন সাইপ্রাসের শাসক গী দ্য লুসিগনান সন্দেহ করল যে সেই কাঠের মূর্তিটা নিওফিতস সত্যি সত্যিই নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। আমি সেটা চুরি করেছি। আমি বারবার বললাম, আমি সেই কাঠের মূর্তি চোখেই দেখিনি। লুসিগনান বলল, ঐ গ্রন্থের ভূমিকাতেই নাকি সাধু নিওফিতস ঐ মূর্তি নিজের হাতেই তৈরি করার কথা বলেছেন। কাজেই আমাকে আবার কয়েকজন সৈন্যের সঙ্গে সেই গুহায় পাঠানো হলো। আমি সুযো .

বুঝে পালালাম।

ঐ কাঠের যীশুমূর্তি কি সত্যিই নিওফিতস তৈরি করেছিলেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

আমি অতদিন গুহায় ছিলাম। কোনোদিন কাঠের তৈরি যীশুমূর্তি কোথাও দেখিনি। পারিসি বলল।

আচ্ছা—ঐরকম কাঠের যীশুমূর্তি সম্পর্কে নিওফিতস কি কখনো তোমাকে কিছু বলেছিল? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

না। তবে মাঝে মাঝে যখন ঝর্ণার জলে গা ধুতে যেতেন—বলতেন যীশুও আমার সঙ্গে স্নান করবেন। পারিসি বলল।

এ কথার মানে কী? হ্যারি ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

এটা ঐ গুহা, ঝর্ণার চারপাশ ভালো করে না দেখে বলা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

ডঢাং ঢং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলল। রক্ষীরা খাবার নিয়ে ঢুকল। খাবার দেখে ভাইকিংরা একটু অবাক হলো। মাখন মাখানো কাটা গোল রুটি, শাকসব্জির জুস আর কাঠের থালাভর্তি মাংস। খুবই সুস্বাদু খাবার। সবাই পেট পুরে খেলো। ফ্রান্সিস মনে মনে হাসল—ক্রীতদাসের হাটে নীরোগ সুস্থ স্বাস্থ্যবান যুবকদের দাম বেশি। তাই সবাইকে সুস্থ রাখতে হবে। তাই কয়েদীদের জন্যে এই রাজকীয় খানা।

আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজ চলেছে। পেছনে কাছি দিয়ে বাঁধা ফ্রান্সিসদের জাহাজ।

এর মধ্যে দু'বার ঝড়ের পাল্লায় পড়তে হয়েছে। ঝড়ের সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় কয়েদঘরের বন্দীদের। জাহাজের প্রচণ্ড দুলুনিতে একবার কয়েদঘরের এই মাথায়, পরক্ষণেই গড়িয়ে গিয়ে ঐ মাথায়। ফ্রান্সিসরা এসবে অভ্যস্ত। কিন্তু মারিয়া তো এ জীবন কখনও কাটায়নি। ওর কষ্ট হলো সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়বার ঝড়ের সময় জাহাজের কাঠে মাথায় ধাক্কা লেগে মারিয়া প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এই ঝড়ের সময় ফ্রান্সিস সমস্ত শরীর দিয়ে মারিয়াকে চেপে ধরে রাখে। গড়াগড়ি খায়। মেঝেয় কাঠের দেয়ালে যা ধাক্কা লাগার ফ্রান্সিসের শরীরেই লাগে। মারিয়ার শরীর অক্ষত থাকে। তবু মাথায় লেগেছিল। অবশ্য ভেন-এর চিকিৎসায় মারিয়া সুস্থ হলো।

ক্যারাভেল আর জাহাজ চলেছে। ফ্রান্সিসদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝতে পারছে না। কয়েদঘরের রক্ষীদের কয়েকদিনই হ্যারি জিজ্ঞেস করেছে—কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের? রক্ষীরা চুপ করে নিজেদের কাজ করে যায়। কোনো কথা বলে না। একজন রক্ষী একদিন বলেছিল—আল জাহিরি কী করেন তা আগে থেকে কাউকে বলেন না। ব্যস

এইটুকুই জেনেছে ওরা।

একদিন সকালের খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা শুয়ে-বসে আছে, হঠাৎ রক্ষীদের মধ্যে খুব তৎপরতা দেখা গেল।

একটু পরেই আল জাহিরি গরাদের কাছে এসে দাঁড়াল। কাষ্ঠহাসি হেসে স্পেনীয় ভাষায় বলল—খাওয়াদাওয়া ভালো পাচ্ছো তো?

হ্যাঁ—হ্যারি বলল, কিন্তু আমরা এখনও জানি না আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

সাইপ্রাসের উত্তরে কেরিনিয়া বন্দরে। ক্রীতদাস কেনাবেচার বড় হাট বসে ওখানে। ওখানে দরে না পোষালে আবার অন্য হাটে নিয়ে যাবো। আল জাহিরি বলল।

তাহলে ক্রীতদাস হিসেবে আমাদের বিক্রি করবেনই। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি হো হো করে হেসে উঠল—তা না হলে ভালো ভালো খাবার খাইয়ে তোমাদের এত যত্নে রেখেছি কেন।

হ্যারি আর কোনো কথা বলল না। ঐ নরপশুটার সঙ্গে ওর আর কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। যা কথা হলো হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল—আর কোনো কথা বলো না। এরা সব হৃদয়হীন মানুষ। কথা বলারও অযোগ্য এরা। আল জাহিরি চলে গেল।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল, ফ্রান্সিস এখান থেকে পালানোর উপায় বের কর।

হ্যারি, ফ্রান্সিস বলল, এখান থেকে পালানোর কোনো নিশ্চিত উপায় আমি ভেবে পাচ্ছি না। পালানো সম্ভব কিন্তু তাতে কিছু বন্ধুর প্রাণ যাবে, কারণ লড়াই করতেই হবে। তার চেয়েও বড় কথা মারিয়া। মারিয়া এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। লড়াইয়ে নামলে সব কিছু সারতে হবে অতি দ্রুত। মারিয়া তা পারবে না। হয়তো মারিয়ার জীবন বিপন্ন হবে। তাই আমি কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসিকে এখানে নিয়ে এসো।

হ্যারি পারিসিকে ডাকতে গেল। মারিয়া বলল, ফ্রান্সিস আমার জন্যেই তোমাদের এই ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, ও কথা বলছো কেন? তোমার কী দোষ?

আমার জন্যেই তো পালাতে পারছো না। মারিয়া বলল।

তোমার জন্যে নয়, লড়াই করে পালাতে গেলেই বন্ধুদের প্রাণহানি ঘটবে। এটা আমি চাই না। পালাবার অন্য কোনো উপায়ও ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসিকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা পারিসি, তুমি তো সাইপ্রাসের অধিবাসী। কেরিনিয়া বন্দর কেমন? খুব বড়ো বন্দর না ছোট?

খুব বড়ো বন্দর নয়। মাঝারি রকমের বন্দর-শহর। পারিসি বলল।

এখন সাইপ্রাসের শাসক তো গী দ্য লুসিগনান। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি বলল।

নিওফিতসের গ্রন্থটি তো তুমি উদ্ধার করে গী দ্য লুসিগনানকে দিয়েছিলে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ওঠানামা করে বলল।

কাঠের যীশুমূর্তিটা গী দ্য লুসিগনান তোমাকেই উদ্ধার করতে পাঠিয়েছিল আর তুমি তখন পালিয়েছিলে।

হ্যাঁ, আমি ওরকম মূর্তি ওখানে কোনোদিন দেখিনি। পারিসি বলল।

আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ওরকম একটা যীশুমূর্তি আছে। ফ্রান্সিস বলল।

হতে পারে, আমি জানি না। পারিসি বলল।

দেখ পারিসি—ফ্রান্সিস বলল, তুমি বলেছিলে ঐ গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুর যে ছবিটি দেখেছিলে সেটা খুব সুন্দর ছবি ছিল।

শুধু সুন্দর নয়—পারিসি বলল, প্রভু যীশুর ওরকম জীবন্ত ছবি আমি কোথাও দেখিনি।

এমন ছবি যিনি আঁকতে পারেন—ফ্রান্সিস বলল—তিনি কাঠ কুঁদে কুঁদে ওরকমই একটা কাঠের মূর্তিও তৈরি করতে পারেন। নিওফিতস শুধু ধর্মপ্রাণ সাধুই ছিলেন না—প্রতিভাবান শিল্পীও ছিলেন।

তা ঠিক। পারিসি ঘাড় নেড়ে বলল। এবার হ্যারি বলল, ফ্রান্সিস এখন কী করবে?

কিচ্ছু করার নেই—ফ্রান্সিস বলল, কেরিনিয়া পৌঁছে রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারপর যীশুর কাঠের মূর্তি উদ্ধার করে আনবো, এই প্রস্তাব দেব।

কাঠের মূর্তিটা নিয়ে সবাই এত ভাবছে কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পারিসি বলল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, সত্যিই সেই মূর্তিটা কাঠের। কারণ নিওফিতস এত ধনবান ছিলেন না যে সোনা হীরে মানিক দিয়ে অত উঁচুতে গুহায় থেকে মূর্তি গড়বেন। কাজেই হাতের কাছে হয়তো ওক বা চেস্টনাট গাছ পেয়েছিলেন। তার ডাল কুঁদে কুঁদে মূর্তিটা গড়েছিলেন। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—মূর্তিটা মূল্যবান অন্য কারণে। ভেবে দেখ একজন মহান সর্বত্যাগী সাধুপুরুষ সেই মূর্তিটা তিলে তিলে গড়েছিলেন। তাহলেই বুঝতে পারছো কী পবিত্র সেই মূর্তি। এই জন্যেই গী দ্য লুসিগনান মূর্তিটা উদ্ধার করার জন্যে তোমাকে পাঠিয়েছিল। তুমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে এলে। তারপরেও হয়তো আরো লোক পাঠানো হয়েছিল। বোধহয় কেউই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারেনি।

আপনি পারবেন? পারিসি বলল।

দেখি। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

একদিন ভোর ভোর সময়ে আল জাহিরির ক্যারাভেল আর ফ্রান্সিসদের জাহাজ কেরিনিয়া বন্দরে এসে ভিড়ল। ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর ফেলার শব্দ হলো। কয়েদঘরের অনেক ভাইকিংদের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিসেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হ্যারিকে ডাকল, হ্যারি। হ্যারি চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। ফ্রান্সিস বলল, আমরা বোধহয় কেরিনিয়া বন্দরে এলাম।

তাই তো মনে হচ্ছে—হ্যারি বলল, দেখি পাহারাদারদের জিজ্ঞেস করে।

দু'তিনজন পাহারাদার সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল। ভাইকিংদের খেতে দিল। খেতে খেতে হ্যারি একজন পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করল, জাহাজ কোন্ বন্দরে ভিড়ল।

কেরিনিয়া বন্দরে। এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। সবাই পেট ভরে খাও। সবাই পেট পুরে খাও শরীর ঠিক রাখো। পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে বলল।

ফ্রান্সিস খাওয়া থামিয়ে হ্যারিকে বলল, পাহারাদারটি ঠাট্টার সুরে কী বলল?

ও কিছু না। হ্যারি বলল।

তবু বলো। ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল। হ্যারি বুঝল যে ঠাট্টার সুরে পাহারাদারটি যা বলেছে তা শুনলে ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে যাবে। ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল, হ্যারি—বলো। এবার হ্যারি আস্তে আস্তে বলল, বলল যে এখানে তোমাদের বিক্রি করা হবে। পেট ভরে খাও শরীর ঠিক রাখো। কথাটা হ্যারি বলে শেষ করতে না করতে ফ্রান্সিস এক লাফে উঠে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে সেই পাহারাদারটির ঘাড়ে এক রদ্দা কষাল। পাহারাদারটি 'অঁক্' শব্দ তুলে কাঠের পাটাতনে পড়ে গেল। ফ্রান্সিস পাহারাদারের কোমরে ঝোলানো তরোয়ালটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। এসব দেখে অন্য পাহারাদাররা খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। কাঠের পাটাতনে ছিটকে পড়া পাহারাদারটি উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস ওর গলায় তরোয়ালের ধারালো ডগাটা চেপে ধরে বলল, হ্যারি, এই রসিকটি ঠাট্টা করে যা বলেছে তার জন্যে তাকে ক্ষমা চাইতে বলো।

হ্যারি দ্রুত পাহারাদারটিকে গ্রীক ভাষায় কথাটা বলল। ক্ষমা চাওয়া দূরের কথা ও চিৎকার করে বন্ধুদের ডাকল। ততক্ষণে আট-দশজন সৈন্য কয়েদঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সবার হাতেই খোলা তরোয়াল। ফ্রান্সিস ওদিকে রুদ্রমূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্ফুটস্বরে ফ্রান্সিস বলল, সব ক'টাকে নিকেশ করবো।

হ্যারি কথাটা শুনে ভয়ে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ফ্রান্সিস শান্ত হও। তুমি লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মারিয়া এতক্ষণে অবাক চোখে ফ্রান্সিসের রাগের চেহারা দেখছিল। এবার হ্যারি রাজকুমারীকে বলল, আপনি ফ্রান্সিসকে শান্ত হতে বলুন।

মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস, শান্ত হও। আমাদের কথা ভুলে যেও না। ফ্রান্সিসের দৃঢ়ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা শরীরটা এবার নড়ল। ফ্রান্সিস চারদিকে তাকিয়ে তরোয়ালটা কাঠের মেঝেতে ফেলে দিল। আস্তে আস্তে বসে পড়ল। কাঠের থালাটা টেনে নিয়ে আধখাওয়া খাবার আবার খেতে লাগল।

এবার হ্যারি গ্রীক ভাষায় পাহারাদারদের বলল, তোমরা আর যাই কর, আমাদের এই বন্দীদশা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করো না। ফ্রান্সিসকে তোমরা চেন না। ওর হাতে তরোয়াল থাকলে তোমাদের মতো আট-দশজনকে একাই নিকেশ করতে পারে। কাজেই সাবধান, ফ্রান্সিসকে অনেক কষ্টে শান্ত করেছি আমরা। বাজে ঠাট্টা-রসিকতা করো না। এতক্ষণে সৈন্যরাও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝল। ওরা চলে গেল। পাহারাদাররাও এঁটো কাঠের থালা গ্লাস নিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পাহারাদারদের মধ্যে তৎপরতা দেখা গেল। কয়েকজন সৈন্যও এল। একটু পরেই আল জাহিরি কয়েদখানার গরাদের সামনে এল। মুখে হাসির ভঙ্গী এনে স্পেনীয় ভাষায় বলল, আসার পথে তোমরা গোলমাল করোনি এজন্য ধন্যবাদ। এবার তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে ক্রীতদাস কুটিরে। বিরাট ঘর। তোমরা আরামে থাকতে পারবে। তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই রয়েছে ওখানে। কোনোরকম চালাকি করো না, পালাবার চেষ্টা করো না। আমার মানুষ মারতে ইচ্ছে করে না। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতেই চাই আমি।

ক্রীতদাস হিসেবে—তাই না? ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

আল জাহিরি আবার কাষ্ঠহাসি হাসল। বলল, কী করি। এটাই তো আমার ব্যবসা। হ্যারির ভয় হলো ফ্রান্সিস না আবার চটে যায়।

হ্যারি তাই বলল, আল জাহিরি—আপনার কথামতোই আমরা চলবো।

আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন তখনও রাতের খাওয়া হয়নি। ফ্রান্সিস এতক্ষণে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল। এবার উঠে বসল। ডাকল—হ্যারি? হ্যারিও আধশোয়া হয়েছিল। উঠে বসল। বলল, কী ব্যাপার? ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, ভেবে দেখলাম—পারিসি যে খ্রীস্টমূর্তির কথা বলেছে সেটা উদ্ধার করতে আমাকে দিতে হবে। কিন্তু আল জাহিরি যেতে দেবে না। ওর মতো একটা নরপশুকে আমি এজন্য অনুরোধও করবো না। যে করেই হোক পারিসিকে নিয়ে আমি একা পালাবো। পারিসি এই সাইপ্রাসের লোক। ওর সাহায্যে আমি রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে দেখা করবো। আমার বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে এই শর্তে যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে যাবো।

কিন্তু—পারিসি বলছিল ঐ গুহার এলাকায় নাকি অসম্ভব শীত। ঠাণ্ডায় ঝর্ণার জল পর্যন্ত জমে যায়। হ্যারি বলল।

সেটা শীতকালে। এখন বসন্তকাল। খুব ঠাণ্ডা পড়বে না—ফ্রান্সিস বলল, ঠাণ্ডার জন্যে ভাবি না—ভাবছি ওরকম কাঠের মূর্তি আছে কিনা। যদি থাকে

আপ্রাণ চেষ্টা করবো খুঁজে বের করতে। এছাড়া আমাদের মুক্তির কোনো আশা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

তাহলে তুমি একাই পালাবে? হ্যারি বলল।

একা নয় পারিসিকেও সঙ্গে নিতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। তারপর পারিসিকে কাছে আসতে বলল। পারিসিকে পালাবার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল। এবার মারিয়াকে বলল, আমি আর পারিসি পালাবো। তুমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করো না। তুমি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি। দুশ্চিন্তা হলে তোমার শরীর খারাপ হবে।

না—আমি কোনোরকম দুশ্চিন্তা করবো না। তুমি সফল হও—এই কামনা করি। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল। ফ্রান্সিস অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

তখন রাত হয়েছে। ডঢাং ঢং শব্দ করে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন পাহারাদার খাবার নিয়ে ঢুকল। সবাই বসে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর পারিসি দরজার কাছে পায়চারি করতে করতে খেতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিস ভেজানো লোহার দরজাটা দ্রুত হাতে খুলে বাইরে চলে এল। পেছনে পারিসি। আচমকা এই ঘটনায় দরজার কাছে দাঁড়ানো দুই পাহারাদার হতবাক। ওর মধ্যে একজন ফ্রান্সিসের দিকে ছুটে এল। ও কোমর থেকে তরোয়াল খুলছে তখনি ফ্রান্সিস ওর বুকে লাথি মারল। পাহারাদার ছিটকে কয়েদঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। অন্য পাহারাদারটি কাছে আসার আগেই ফ্রান্সিস কাঠের থালা ছুঁড়ে মারল কাচে ঢাকা বাতিটার দিকে। কাচে ঢাকা বাতি ভেঙে চৌচির। অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। পাহারাদার অন্ধকারে ফ্রান্সিসদের দেখতে পেল না। পারিসির হাত ধরে ফ্রান্সিস ছুটল সিঁড়ির দিকে। কয়েদঘরের পাহারাদাররা চিৎকার চ্যাচামেচি করতে লাগল। কিন্তু সেই শব্দ ওপরে ডেক পর্যন্ত এল না। কাজেই ডেক-এ দাঁড়ানো সৈন্যরা কিছুই বুঝল না।

সিঁড়ি দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ফ্রান্সিস পারিসিকে নিয়ে উঠে এল ডেক-এ। ডেক-এর সৈন্যদের দু'একজনের হাতে তরোয়াল। বাকিরা গল্পগুজব করছে। ফ্রান্সিস আর পারিসিকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখে দু'একজন সৈন্য ছুটে এল। সৈন্যরা কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস পারিসির হাত ধরে বলল, আমার সঙ্গে লাফ দাও। দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে ঝপাৎ করে সমুদ্রের জলে পড়ল।

সব সৈন্য পাহারাদাররা ডেক-এর ধারে এসে রেলিং ধরে চিৎকার চ্যাচামেচি করতে লাগল। ততক্ষণে ফ্রান্সিস আর পারিসি ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

ফ্রান্সিস আর পারিসি ডুব সাঁতার দিয়ে বেশ কিছুটা গিয়ে আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল ক্যারাভেল-এর ডেক-এ আল জাহিরি এসে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, কোনোরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে সাঁতার

কেটে চলো। একটু দূরে গিয়ে আমরা সমুদ্রতীরে উঠবো। দু'জনেই আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তীরে পৌঁছল। পেছল পাথর বালির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে তীরে উঠল। মাথার জল ঝাড়তে ঝাড়তে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এই জলেভেজা অবস্থায় কোথাও একটু আশ্রয় তো নিতে হবে।

কিছু ভাববেন না। আমার বাড়িটা তো আছে। পারিসি বলল।

তোমার বাড়িতে কে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

আমার বুড়ি মা। তবে বেশ কয়েক মাস তো আমি বাইরে বাইরে। মার কী অবস্থা জানি না। পারিসি বলল।

চলো তো। একটা মাথা গোঁজার আস্তানা পেলেই হলো। ফ্রান্সিস বলল।

কেরিনিয়া বন্দর-শহরের রাস্তা দিয়ে ওরা চলল। রাত হয়েছে। রাস্তা নির্জন। রাস্তার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। বাড়িঘর অন্ধকারে ডুবে আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে বোধহয়।

প্রায় আধঘণ্টার ওপর হাঁটতে হাঁটতে ওরা পারিসির বাড়ির দোরগোড়ায় এল। পারিসি দরজার শেকলটা দরজায় ঠুকতে ঠুকতে ডাকল—মা, মা—। বারকয়েক ডাকার পর সাড়া পাওয়া গেল। বুড়ির ভাঙা গলায় কেউ বলছে—কে রে?

আমি পারিসি—মা দরজা খুলে দাও। পারিসি বলল। ঠক্ ঠক্ শব্দে কাঠের দরজা খুলল। মোমবাতি হাতে একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। পারিসিকে দেখে ফোকলা দাঁতে হাসল। বলল, তুই কী করেছিস? রাজার সৈন্যরা তোর খোঁজে তিন-চার দিন এসেছিল।

ওসব নিয়ে ভেবো না। আমি অন্যায় কিছু করিনি। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস, পারিসি আর ওর মার কথা গ্রীক ভাষায় বলে কিছুই বুঝছিল না। পারিসি ফ্রান্সিসকে বুঝিয়ে বলল। তারপর মাকে বলল—আমার এক বিদেশী বন্ধু এসেছে। আমাদের কিছু খেতে দাও।

এত রাতে কী দেব। ভালো পিঠে আছে—খাবি? মা বলল।

কেন খাবো না। চলো ভেতরে। খেতে দাও। পারিসি বলল। ফ্রান্সিস আর পারিসি তো আধপেটা খেয়েই পালিয়েছিল। কাজেই যখন একটা মাটির থালায় পারিসির মা পিঠে খেতে দিল তখন দু'জনেই হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিল। জলটল খেয়ে এতক্ষণে ওদের স্বস্তি হলো। দু'জনে ভেজা পোশাক পালটাল। তারপর ঐ ঘরেই দু'জনে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ফ্রান্সিস বলল, পারিসি—বর্তমান শাসক গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। তুমি এই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা কর।

মুশকিল হয়েছে যে আমি তো জেরস পাহাড় থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

আমাকে পেলে কয়েদখানায় পাঠাবে। পারিসি বলল।

ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল, আমাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি রাজসভায় চলো। তোমাকে যাতে কোনো ঝামেলা পোহাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।

আমাদের তো রাজধানী নিকোশিয়ায় যেতে হবে। প্যারিসি বলল।

তাই চলো। তুমি একটা চাষীদের শস্যটানা গাড়ির ব্যবস্থা কর। ফ্রান্সিস বলল।

দেখি। পারিসি এই কথা বলে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে পারিসি ফিরে এল। বলল—গাড়ি পেয়েছি। কিন্তু এতদূর পথ যেতে অর্ধ স্বর্ণমুদ্রার অর্থ চাইছে। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, তোমার জানাশুনো কোনো স্বর্ণকার আছে?

তা আছে। পারিসি বলল।

তাহলে গাড়িতে চড়ে আগে সেখানে চলো। আমার বিয়ের আংটিটা বন্ধক রেখে স্বর্ণমুদ্রার অঙ্ক নেব। গাড়িভাড়া দেব। ফ্রান্সিস বলল।

পারিসির মার হাতে তৈরি আরো পিঠে খেল দু'জনে। বাড়িতে তৈরি এত সুস্বাদু পিঠে ফ্রান্সিস যে কতদিন খায়নি। পিঠে খেতে খেতে ফ্রান্সিসের বারবার মার কথা মনে পড়তে লাগল।

ওরা চাষীর গাড়িতে চড়ে বসল। পথে এক স্বর্ণকারের দোকানে ঢুকল ওরা। পারিসির পরিচিত দোকানদার। আংটি বন্ধক রেখে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিল। ফ্রান্সিস বারবার বলল, আমি কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। এর মধ্যে সোনার আংটিটা গালিয়ে ফেলবেন না কিন্তু। দোকানদার মাথা নেড়ে বলল, না—না। অন্তত বছর খানেকের আগে আমরা বন্ধকী জিনিস গলাই না।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িতে উঠল দু'জনে। গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়ে গেছে বলে হ্যারিদের সবাইয়ের হাত বেঁধে দেওয়া হলো। হাত-বাঁধা অবস্থাতেই খাওয়া শোওয়া।

সেদিন বিকেলে ঢ্যাং ঢং করে কয়েদখানার লোহার দরজা খুলে গেল। ভাইকিংরা একটু আশ্চর্যই হলো। এ সময় তো দরজা খোলা হয় না।

দরজা দিয়ে ঢুকল আল জাহিরি। সঙ্গে এক রোগা লিকলিকে আরবী। বেশ ফর্সা। চিবুকে ছাঁটা দাড়ি। মাথায় লাল ফেজ টুপি পরা। দু'জন পাহারাদারকে আল জাহিরি কী বলল। তারা মারিয়ার কাছে এল। মারিয়ার হাত ধরল। মারিয়া এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। এবার হ্যারিরা বুঝতে পারল মারিয়াকে ক্রীতদাসীর মতো ঐ শুঁটকো লোকটার কাছে বিক্রি করা হবে। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো—। সঙ্গে সঙ্গে সব ভাইকিং বন্ধুরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল।—ও-হো-হো—। পাহারাদার দু'জন বেশ ঘাবড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। আল জাহিরি দেখল এসব। তারপর ইঙ্গিতে

হ্যারিকে ডাকল। ঐ শুঁটকো লোকটা বোধহয় গ্রীক আর আরবি ভাষা জানে। অন্য ভাষা জানে না। তাই হ্যারিকে ডাকল আল জাহিরি।

হ্যারি এগিয়ে গিয়ে আল জাহিরির সামনে দাঁড়াল। আল জাহিরি বলল, আজ হোক, কাল হোক, তোমাদের সবাইকে বিক্রি করা হবে। তবে তোমরা বাধা দিচ্ছো কেন?

হ্যারি বলল, শুধু রাজকুমারীকে আমরা বিক্রি করতে দেব না। আমাদের সবাইকে যেদিন বিক্রি করবেন সেইদিন রাজকুমারীকে বিক্রি করতে পারবেন। তার আগে নয়। আল জাহিরি হেসে বলল, ভালো দামে বিক্রি হতো।

সে তো আপনার কেঠো হাসি দেখেই বুঝতে পারছি। হ্যারি বলল।

আল জাহিরি ব্যবসাদার। বুঝল—এত তাড়াহুড়ো করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হবে। ওর দরকার হ্যারিদের আর মারিয়াকে বিক্রি করা। সময় সুযোগ মতো সেটা করতে হবে। দু'চারজনকে অন্য কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই অজুহাত দেখিয়ে দফায় দফায় নিয়ে বিক্রি করতে হবে। ভাইকিংদের সংখ্যাও কমে আসবে। তখন রাজকুমারীকে বিক্রি করা হবে। কারণ তখন বাধা দেওয়ার মতো ভাইকিংরা খুব কম থাকবে। সহজেই সব মিটে যাবে।

সেই শুঁটকো মতো লোকটাকে কী বোঝাতে বোঝাতে আল জাহিরি চলে গেল।

সেদিন একটু বেলায় কয়েদঘরের দরজা ঢাং ডঢাং শব্দে খুলে গেল। সৈন্যরা কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল। সকলের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগল। মারিয়াও বাদ গেল না। তারপর আট-দশজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে ওপরে ডেক-এ ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল। পাহারাদাররা হ্যারিকে বলল, সবাইকে বলো—ডেক-এ উঠতে হবে। হ্যারি গলা চড়িয়ে সেই কথাই সবাইকে বলল। ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা একে একে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

প্রায় অন্ধকার কয়েদঘর থেকে বাইরের আলোয় আসতেই সবাই কিছুক্ষণ তাকাতেই পারল না। এই অভিজ্ঞতা ফ্রান্সিস আর বন্ধুদের আছে, কিন্তু মারিয়ার এই অভিজ্ঞতা নেই। মারিয়া বলে উঠল, আমি যে তাকাতেই পারছি না।

হ্যারি বলল, রাজকুমারী—কিছুক্ষণের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাইরের আলোর তীব্রতা মারিয়ার চোখে সয়ে গেল। ক্যারাভেল থেকে কাঠের পাটাতন ফেলা হয়েছে। পাটাতন দিয়ে হেঁটে হেঁটে সবাই নেমে এল। সৈন্যদল ওদের ঘিরে নিয়ে চলল। যেখানে হ্যারিদের নামানো হলো সেখান থেকে কেরিনিয়া বন্দর বেশ দূরে।

কেরিনিয়া বন্দরে তখন ব্যস্ততা। বেশ কয়েকটি নানা দেশের জাহাজ ভেড়ানো আছে। দু'একটা জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হ্যারিরা যেখানে নামল সেখানটায় দেখল দু'তিনটে লম্বাটে ঘর। ঘরগুলোর মাথায় শুকনো ঘাস আর পাতার ছাউনি।

কাফ্রি আরবী গ্রীক পাহারাদার সৈন্যরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা সবাই ঐ তিনটি কয়েদঘরের পাহারাদার।

ভাইকিংদের নিয়ে আসা হলো মাঝখানের ঘরটার সামনে। লোহার গরাদ লাগানো দরজা। দু'জন পাহারাদার তালা খুলে ঢং ডঢাং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ওদের সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করা হলো।

এই পাথরগাঁথা কয়েদঘরে ওপরের দিকে গরাদ দেওয়া দু'টো জানালা। এই দিনের বেলাও মশাল জ্বলছে। মেঝেয় শুকনো ঘাস লতাপাতা দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্ত করা বিছানা মতো।

ভাইকিংরা কেউ বসল, কেউ শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল।

হ্যারি কয়েদঘরের কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল। মাথায় নানান চিন্তা। ফ্রান্সিস আর পারিসি তো পালাল। ওরা নির্বিঘ্নেই পালিয়েছে। কিন্তু ওরা কী করে হ্যারিদের মুক্ত করতে পারবে সেটাই চিন্তার। হ্যারিদের একমাত্র সান্ত্বনা ফ্রান্সিস বাইরে আছে। ও মুক্ত। একটা কিছু উপায় ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই বুদ্ধি করে বের করবে। ওদিকে শাঙ্কো ভাবল—সে একা পালাবে। ক্রীতদাসের হাটে হ্যারিদের বিক্রি করার আগেই সবাইকে মুক্ত করতে হবে। এই নিয়ে শাঙ্কো ভাবতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্থির করল পালাতে হবে। ও হ্যারির কাছে গিয়ে বসল। মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি আমি পালাবো।

—কী করে? হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়েই বলল।

—সে সব আমার ভাবা হয়ে গেছে। শাঙ্কো বলল।

—শাঙ্কো ভেবেচিন্তে পা ফেলো—হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়েছে। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। তার আগে তুমি পালাতে যেও না। তোমার যদি কোন বিপদ হয় ফ্রান্সিস রাগ করবে আমাদের ওপর। কেন আমরা তোমাকে বাধা দিই নি এইজন্যে। শাঙ্কো বলল—

—আমার কোন বিপদ হবে না। আমি আটঘাট বেঁধেই নামবো।

—বেশ—তোমার দায়িত্বেই তুমি এই ঝুঁকি নিচ্ছো। পরে আমাদের দোষ দিও না। হ্যারি বলল।

—আমি কাউকেই দোষ দেব না। এই ঝুঁকির সব দায়িত্ব একা আমার। শাঙ্কো বলল।

তখনও রাতের খাবার দেবার সময় হয়নি। শাঙ্কো হ্যারিকে বলল—রাতের খাবার দেবার সময় আমি পালাবো। এবার হ্যারি আমার জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা বার কর। হ্যারি দড়িবাঁধা দু'হাত শাঙ্কোর গলার কাছে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করে আনল। শাঙ্কো বলল এবার আমার হাতের দড়িটা কাটো। হ্যারি জোড়া দু'হাতে ছোরা ধরে শাঙ্কোর হাত বাঁধা দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। ছোরাটা তো হ্যারি ভালো করে ধরতে পারছে না। ছোরা

এদিক ওদিক ঘুরে যাচ্ছে। শাঙ্কোর হাত কেটে যাচ্ছে। রক্ত বেরুচ্ছে। শাঙ্কো মুখ বুজে আছে। একসময় দড়িটা কেটে গেল। শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

রাত হল। ঢ্যাং ঢং শব্দে লোহার দরজা খুলে গেল। তিনজন পাহারাদার খাবার নিয়ে ঢুকল। লোহার দরজার বাইরে দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ফ্রান্সিস আর পারিসি পালাবার পর ওরা সাবধান হয়ে গেছে। তিন পাহারাদার যখন খাবার দিতে শুরু করল শাঙ্কো একলাফে উঠে লোহার দরজা পার হয়ে বাইরে চলে এল। তিন পাহারাদার খাবার কাঠের মেঝেয় রেখে তরোয়াল খুলে দরজার দিকে ছুটল। ততক্ষণে শাঙ্কো লোহার দরজা বাইরে থেকে কড়া টেনে বন্ধ করে দিয়েছে। তিন পাহারাদার আটকা পড়ে গেল। বাইরের খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্য শাঙ্কোর দিকে ছুটে এল। শাঙ্কো প্রথম সৈন্যটিকে আর তারোয়াল চালাতে দিল না। দ্রুত ছুটে এসে ওর পেটে মাথা দিয়ে টুঁ মারল। সৈন্যটি কাত হয়ে কাঠের মেঝেয় পড়ে গেল। হাতের তরোয়াল ছিটকে গেল। পরের সৈন্যটি তরোয়াল চালাল। শাঙ্কো মাথা নিচু করে তরোয়ালের মার এড়াল। তারপর ছুটল কাঠের সিঁড়ির দিকে। সৈন্যটিও খোলা তরোয়াল হাতে পেছনে পেছনে ছুটল। শাঙ্কো ততক্ষণে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ দ্রুত উঠে গেছে। শাঙ্কো বুঝল যে সৈন্যটি এবার চেঁচিয়ে অন্য সৈন্যদের ডাকবে। কাজেই ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। শাঙ্কো ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপে-ওঠা সৈন্যটির মুখে গায়ের সমস্ত জোর একত্র করে লাথি মারল। সৈন্যটা চিত হয়ে সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। চিৎকার করে উঠতে পারল না।

এবার শাঙ্কো দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডেক-এ উঠে এল। সৈন্যরা কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো রেলিং ডিঙিয়ে এক লাফে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব সাঁতার দিয়ে যতটা দমে কুলোয় ততটা এগিয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে জলের ওপর মাথা তুলল। দেখল জাহাজ থেকে অনেকটা দূরেই চলে এসেছে। ডেক-এ সৈন্যদের সঙ্গে আল জাহিরি এসে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো আস্তে আস্তে জলে কোনরকম শব্দ না করে নিজেদের জাহাজটার দিকে সাঁতার কেটে চলল।

একসময় জাহাজটার পেছনের দিকে এল। তারপর হালের খাঁজে পা রেখে জল থেকে উঠল। তারপর হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে ডেক-এর কাছে উঠে এল। আগেই ডেক-এ নামল না। রেলিঙের আড়াল থেকে দেখল মাত্র দু'জন সৈন্য ডেক-এ রয়েছে। একজন ডেক-এর কাঠের মেঝেয় শুয়ে আছে অন্যজন বসে আছে। শাঙ্কো ডেক-এ শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে চলল সিঁড়িঘরের দিকে। সিঁড়ির কাছে এসে আস্তে সিঁড়িতে পা রেখে উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারে সৈন্য দু'জন কিছুই দেখতে পেল না। ওরা আগের মতই গল্প করতে লাগল। শাঙ্কো সিঁড়ি দিয়ে কেবিনঘরে নেমে এল। নিজের কেবিনঘরে গিয়ে

শুকনো পোশাক বের করল। তখনও শাঙ্কো হাঁপাচ্ছে। জলে ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে নিল। এবার খাওয়া। রাতের খাবারটা খাওয়া হয়নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে। শাঙ্কো রসুইঘরে ঢুকল। দেখল বেশ কয়েকটা গোল রুটি আছে। দু'তিনদিনের নামে নিশ্চিন্ত। ছুরি দিয়ে গোল রুটি কেটে কেটে খেতে লাগল। খাওয়া হলে জল খেয়ে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমনো পর্যন্ত একটা চিন্তাই ঘুরে ঘুরে মাথায় এল—মারিয়া হ্যারিদের কীভাবে মুক্ত করা যায়? ফ্রান্সিস পালিয়েছে। আমিও পালালাম। কিন্তু বন্ধুরা সবাই তো ফ্রান্সিস বা আমার মত পালাতে পারবে না। ওদের পালাবার উপায় একটা বের করতে হবে। ফ্রান্সিস আর পারিসি পালিয়ে কী করল সেও জানি না। রাজা গী দ্য লুসিগনানের সঙ্গে ফ্রান্সিস দেখা করতে পেরেছে কি না কিছুই জানি না। যা হোক—আমিই বন্ধুদের মুক্ত করবো। তার উপায়টা ভেবে ভেবে বের করতে হবে। দেখা যাক। রাত বাড়তে শাঙ্কোর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

সকালে ঘুম ভেঙে গেল। শাঙ্কো রসুইঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এল। সারাক্ষণই ভাবতে লাগল কী উপায়ে হ্যারি, মারিয়া আর বন্ধুদের মুক্ত করা যাবে। কিন্তু কোন উপায় ভেবে ভেবে স্থির করতে পারল না।

এমন সময় আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজ থেকে উচ্চস্বরে কথাবার্তা ভেসে এল। শাঙ্কোর কৌতূহল হল। কী ঘটল ঐ জাহাজে।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। তারপর জাহাজের পাটাতনে শুয়ে পড়ে গড়িয়ে চলে এল মাস্তুলের পেছনে। মাস্তুলের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখল মারিয়া হ্যারিদের জাহাজ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। বোঝা গেল ওদের সমুদ্রতীরের কাছে কোন কয়েদখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মারিয়া হ্যারিদের জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে ওদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর হাঁটিয়ে নিয়ে চলল কিছুদূরে একটা লম্বাটে ঘরের দিকে। শাঙ্কো বুঝল—ঐ লম্বাটে ঘরটাই কয়েদঘর। ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট এখানেই আছে। হাতবাঁধা মারিয়া হ্যারিরা ততক্ষণে ঐ কয়েদখানায় পৌঁছে গেছে। শাঙ্কো গভীরভাবে ভাবতে লাগল—কী করবে ও? এটুকু ভেবে ভেবে বের করল যে জাহাজের বাইরে আসায় হ্যারিদের মুক্ত করা সহজ হবে। মৃত্যু রক্তপাত না ঘটিয়ে জাহাজ থেকে মুক্ত করা অসম্ভব ছিল। এখন কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেল। শাঙ্কো ভেবে ভেবে স্থির করল যা করার আজ রাতেই করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না। হয়তো কাল পরশুর মধ্যেই এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। মারিয়া হ্যারিরা একবার বিক্রি হয়ে গেলে আর তাদের খোঁজ পাওয়া অসম্ভব। কাজেই আজ রাতেই ওদের মুক্তির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। শাঙ্কো এরমধ্যে উপায়টা ভেবে নিল। সবকিছুই নির্ভর করছে কয়েদখানায় ক'জন পাহারাদার রাখা হয় তার ওপর।

শাঙ্কো নিজের কেবিনঘরে নেমে এল। বিছানায় শুয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল। অনেক ভাবনা মাথায়।

দুপুরে গোল রুটি কেটে নিয়ে চিনি দিয়ে খেল। খিদের মুখে ঐ খাবারই অমৃত মনে হল।

সন্ধ্যে হল। শাঙ্কো তখনও চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

রাত হল। রাতের খাওয়া খেয়ে শাঙ্কো ওদের অস্ত্রঘরে গেল। তীর ধনুক নিল। কোমরে তরোয়াল গুঁজল। বলা যায় না যদি লড়াইয়ে নামতে হয়।

রাত বাড়তে লাগল। শাঙ্কো তখনও বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে।

রাত গভীর হল। শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। ডেক-এ শুয়ে পড়ে গড়িয়ে মাস্তুলের আড়ালে এল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল—পাহারাদার সৈন্যরা ডেক-এর এখানে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। যাক্ নিশ্চিন্ত।

শাঙ্কো কাঠের পাটাতন দিয়ে অন্ধকারে আস্তে আস্তে তীরে নেমে এল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলল কয়েদঘরের দিকে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কয়েদঘরের কাছে এসে দেখল কয়েদঘরে দরজার কাছে দু'তিনটে মশাল জ্বলছে। চারজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। দু'জন বসে আছে। দু'জন খোলা তরোয়াল হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শাঙ্কো অন্ধকারে হাঁটু গেড়ে বসল। ধনুকে তীর পরাল। তারপর মশালের আলোয় নিশানা ঠিক করতে লাগল। বেশি তীর খরচ করা চলবে না। একটুক্ষণ নিশানা ঠিক করে শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। তীর গিয়ে লাগল খোলা তরোয়াল হাতে এক পাহারাদারের পায়ে। সে তরোয়াল ফেলে পা চেপে বসে পড়ল। অন্য তিনজন পাহারাদার চারদিকে তাকাতে লাগল। ওরা বুঝে উঠতে পারলো না কোথা থেকে তীর ছুটে এল। শাঙ্কো আবার তীর ছুঁড়ল। এই তীর একজন পাহারাদারের বুকে গিয়ে লাগল। সে উবু হয়ে দরজার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ল। বাকি দু'জন সভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। শাঙ্কোর পরের তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তীরটা ঠং করে লোহার দরজায় লেগে নিচে পড়ে গেল। দু'জন পাহারাদার আর ওখানে থাকতে সাহস পেল না। দু'জনেই অন্ধকারে লাফিয়ে নেমে ছুটল নিজেদের জাহাজের দিকে। অন্ধকারে শাঙ্কো লক্ষ্য স্থির করতে পারল না। ওরা নিশ্চয়ই জাহাজে গিয়ে আল জাহিরিকে খবর দেবে। হাতে সময় কম। ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে শাঙ্কো দ্রুত ছুটে এল। দেখল একজন পাহারাদার পা টিপে ধরে বসে আছে। অন্যজন উবু হয়ে পড়ে আছে। ওর কোমরেই শাঙ্কো দেখল চাবির গোছা। শাঙ্কো এক হ্যাঁচ্কা টানে চাবির গোছা নিয়ে নিল। শাঙ্কো আহত পাহারাদারকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—একেবারে চুপ করে থাকবে। টুঁ শব্দটি করেছো কি তোমাকে শেষ করে দেব। সব কথা না বুঝলেও পাহারাদারটি বুঝল ওকে চ্যাঁচামেচি করতে

মানা করছে। ও চুপ করে হাত চেপে পায়ের রক্তপড়া বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। ছুটে গেল কয়েদঘরের দরজার কাছে। বড় তালাটায় চাবি ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে দেখতে লাগল। একটা চাবি লেগে গেল। কট্ করে তালাটায় শব্দ হল। তালা খুলে গেল। শাঙ্কো বেশ শব্দ করেই দরজা খুলল যাতে সবাই সজাগ হয়। ভেতরে ঢুকে শাঙ্কো চাপা গলায় বলল—ভাইসব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পালাতে হবে। জলদি। ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াতে লাগল। তারপর ছুটল দরজার দিকে। সবারই দু'হাত বাঁধা। ছুটে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। পালাবার এই সুযোগ ছাড়া চলবে না।

সবাই কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। শাঙ্কো বলল—এখন আমরা শহরে যাবো না অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকবো।

হ্যারি বলল—বাঁদিকে কিছুদূরে একটা জঙ্গলা জায়গা দেখা যাচ্ছে। ওখানেই আমরা আশ্রয় নেব। ছোটো সবাই। সবাই ছুটল সেই জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলে ঢুকে একটা ফাঁকা জায়গামত পেল। সেখানেই বসে পড়ল সবাই। হাঁপাতে লাগল।

শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরা বের করল। তারপর মারিয়ার হাতবাঁধা দড়ি কেটে দিল। একে একে সবাইর হাতের দড়ি কাটা হল।

হ্যারি ওপরের দিকে তাকাল। একফালি আকাশ দেখল। তারাগুলোর আলো ম্লান হয়ে আসছে। তার মানে রাত শেষ হয়ে আসছে।

কিছু পরে সূর্য উঠল। হ্যারিরা জঙ্গলের মধ্যে থাকায় সূর্য ওঠা দেখতে পেল না। ততক্ষণে পাখিদের ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেছে।

আল জাহিরির কয়েদখানা থেকে তো পালানো গেল। এবার চাই খাদ্য আর আশ্রয়। এতজনের খাদ্য আর আশ্রয় জোগাড় করা এক সমস্যা। হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাইসব—এবার খাদ্য আর আশ্রয় চাই। কিন্তু এতজন সবাই একসঙ্গে বাইরে বেরুনো যাবে না। আমি জনাদশেককে সঙ্গে নিয়ে বেরুবো। ফিরে এসে আবার জনা দশেককে নিয়ে যাবো। তোমরা কেউ গ্রীক ভাষা জানো না। কথা বলে আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। এবার জনা দশেক আমার সঙ্গে চলো। হ্যারি থামল। তারপর মারিয়াকে বলল—আপনিও চলুন। মারিয়া বলল—সবাই আশ্রয় পাক তারপর আমি যাবো।—না রাজকুমারী—আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। আপনার কথা আমাকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। চলুন।

মারিয়া আর জনাদশেক বন্ধুকে নিয়ে হ্যারি বন থেকে বেরিয়ে এল। দেখল কিছুটা খোলা মাঠের মত। তারপর কেরিনিয়া নগরের রাস্তা।

ওরা রাস্তা দিয়ে চলল। রাস্তায় লোকজনের খুব একটা ভীড় নেই। একটা পাথরের বড় বাড়ির সামনে এসে হ্যারি বলল—দাঁড়াও সবাই। সবাই দাঁড়িয়ে

পড়ল। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে কাঠের দরজায় বড় কড়াটা দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল। একটু পরেই দরজা খুলে একজন প্রৌঢ় এসে দাঁড়ালেন। তিনি বেশ অবাক হয়েই হ্যারিদের তাকিয়ে দেখলেন। প্রৌঢ়ের গায়ে বেশ দামি পোশাক। বোঝা গেল যথেষ্ট স্বচ্ছল পরিবার। হ্যারি ভাঙাভাঙা গ্রীক ভাষায় বলল—আমরা বিদেশী—ভাইকিং। প্রৌঢ় বললেন—হ্যাঁ তোমাদের কথা আমরা শুনেছি। দক্ষ জাহাজ চালক তোমরা। দুঃসাহসী। তবে জলদস্যু বলে তোমাদের দুর্নামও আছে।

—আমাদের সঙ্গে যারা পেরে ওঠে না তারা এই দুর্নাম দেয়। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। ওসব কথা থাক। তোমরা কী চাও? প্রৌঢ়টি বললেন।

—দেখুন—আমাদের জাহাজডুবি হয়েছে। কোনরকমে এই ক'জন প্রাণে বেঁচেছি। আপনার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় চাই। হ্যারি বলল।

—নিশ্চয়ই—প্রৌঢ়টি বললেন—আপনারা থাকুন। আসুন। প্রৌঢ়টি দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন। প্রথমে মারিয়া পরে শাঙ্কো, বিস্কোরা কয়েকজন ঢুকল। প্রৌঢ়টি হ্যারিকে বললেন—আমার নাম অ্যান্তিকো। তোমাদের যখন যা প্রয়োজন পড়ে জানাবে।

বাইরের ঘরটায় এসে দাঁড়াল সবাই। দেখল—কাঠের তক্তায় পাতা বিছানামত। ওরা বসল। বাড়ির ভেতর থেকে একজন বয়স্কা মহিলা এঘরে এলেন। অ্যান্তিকো তাকে হ্যারিদের কথা বললেন। মহিলাটি মারিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? গ্রীক ভাষা। মারিয়া কিছুই বুঝল না। হ্যারি বলল—উনি গ্রীক ভাষা জানেন না। আমি ওঁর পরিচয় দিচ্ছি। উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—তা রাজকুমারী রাজপ্রাসাদের আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এভাবে বিদেশে এসেছেন কেন? মহিলাটি বললেন।

—রাজকুমারী দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। তাঁর স্বামীও আমাদের সঙ্গে আছেন। হ্যারি বলল।

—তা রাজকুমারীর স্বামী কে? মহিলাটি বললেন।

—ওসব জেনে তোমার কী হবে? অ্যান্তিকো বললেন—ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা কর। মহিলাটি আর কোন কথা বললেন না। বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। হ্যারি বলল—রাজকুমারী আপনারা এখানে থাকুন। আমি যাচ্ছি। অন্য বন্ধুদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হ্যারি চলে গেল।

হ্যারি আরও দুটো বাড়িতে বন্ধুদের ভাগ ভাগ করে থাকার ব্যবস্থা করল। আশ্রয় আহার জুটল। এবার ফ্রান্সিসের আসার জন্য অপেক্ষা করা।

কিন্তু হ্যারিদের ভাগ্য খারাপই বলতে হবে। হ্যারিদের পালিয়ে যাবার খবর শুনে আল জাহিরি রেগে আগুন হয়ে গেল। কয়েদঘরের পাহারাদার ক'জনকে চাবুক মারল। মনের ঝাল মিটিয়ে এবার ভাবতে বসল কী করে বন্দীদের আবার

ধরা যায়। ফিরিয়ে আনা যায়।

খোঁজখবর করতে করতে অ্যান্তিকোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো আল জাহিরি। আশপাশের দোকানে বাড়িতে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানল কিছু ভিনদেশি লোক অ্যান্তিকোর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই আল জাহিরির হ্যারিদের হদিশ পেতে অসুবিধে হয়নি।

বাড়ির বাইরে আটদশজন সৈন্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে আল জাহিরি বাড়ির দরজায় হাত ঠুকে টক্‌টক্ শব্দ করল।

একটু পরে অ্যান্তিকো দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আল জাহিরিকে দেখে সৈন্যদের দেখে একটু অবাকই হলেন। বললেন—কী ব্যাপার?

—আপনার বাড়িতে আমার ক্রীতদাসরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আল জাহিরি বলল। অ্যান্তিকো বললেন—আমাকে তো ওরা বলেছে ওদের জাহাজডুবি হয়েছে।

—মিথ্যে কথা। ওরা আমার ক্রীতদাস। আল জাহিরি বলল।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অ্যান্তিকো বললেন।

আল জাহিরি ঢোলা পোশাকের নিচে থেকে একটা গুটোনো পার্চমেন্ট কাগজ বের করল। অ্যান্তিকোর হাতে দিয়ে বলল—এটা রাজা গী দ্য লুসিগনানের ফরমান। এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ক্রীতদাস কেনাবেচার ফরমান আমি পেয়েছি। কাজেই পলাতক ক্রীতদাসদের বন্দী করে ধরে নিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে।

—তা ঠিক। তবে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে এরা। এভাবে এদের—

—কোনো কথা নয়। অ্যান্তিকোকে কথা শেষ না করতে দিয়েই আল জাহিরি বলে উঠল—আপনি সরে দাঁড়ান। আমি দেখছি।

আল জাহিরি অ্যান্তিকোকে প্রায় হঠিয়ে দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল। বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। হ্যারিরাও চমকে উঠল। একেবারে দোরগোড়ায় আল জাহিরি দাঁড়িয়ে আছে। আল জাহিরি কেঠো হাসি হাসল। বলল—আমার হাত থেকে নিস্তার নেই। সব চলো কয়েদখানায়। হ্যারি বলে উঠল—না—আমরা যাবো না। আমরা আপনার ক্রীতদাস নই। এসময় অ্যান্তিকো এলেন। বললেন—তোমরা ক্রীতদাস এটা আমাকে বলোনি। হ্যারি বলে উঠল—আল জাহিরি আমাদের জাহাজ দখল করে আমাদের ধরে নিয়ে এসেছে। আমাদের অর্থের বিনিময়ে কেনেনি। তাহলে আমরা ক্রীতদাস হলাম কী করে? অ্যান্তিকো বললেন—এসব তো প্রমাণসাপেক্ষ। তাছাড়া ক্রীতদাস কেনাবেচার অধিকার দিয়ে একে রাজা গী দ্য লুসিগনান ফরমান দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এবার হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেশীয় ভাষায় সব বলল। তারপর বলল—আমরা যাবো না। সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। আল জাহিরি এতে খুব ঘাবড়াল না। কারণ ওর হাতে রাজার ফরমান রয়েছে।

আল জাহিরি বাইরে সদর দরজার দিকে তাকিয়ে ইশারায় সৈন্যদের ডাকল। সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে এসে ঘরে ঢুকল। হ্যারি বুঝল আল জাহিরি তৈরি হয়েই এসেছে। বুঝল সশস্ত্র সৈন্যদের নিরস্ত্র অবস্থায় বাধা দেওয়া অসম্ভব। বাধা দিতে গেলে বন্ধুদের অনেকেই মারা যাবে। কাজেই ধরা দেওয়াই এখন ভালো। পরে মুক্তির উপায় ভেবে বের করতে হবে।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—জানি এখন ধরা দিতে আমাদের পৌরুষে বাধবে। কিন্তু উপায় নেই। আমাদের ধরা দিতেই হবে। তাহলেই আমরা সবাই বেঁচে থাকবো। পরে মুক্তির উপায় ভাববো। বন্ধুদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। অনেকেই এভাবে কাপুরুষের মত হার স্বীকার করতে রাজি হচ্ছিল না। হ্যারি বুঝল বিপদ। যদি বন্ধুরা মাথা গরম করে সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে এক রক্তঝরা লড়াই হবে। নিরস্ত্র বন্ধুদের অনেকেই মারা যাবে বা ভীষণ আহত হবে। তাই হ্যারি চিৎকার করে বলল—কেউ লড়াইয়ে নেমো না। আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির কোনো পথ নিশ্চয়ই বের করবে। এখন সবাই শান্ত হও। কেউ মাথা গরম করো না। বুদ্ধিমানের মতো মাথা ঠাণ্ডা রাখো। ফ্রান্সিস থাকলে সেও ঠিক এ কথাই বলতো। এবার বন্ধুরা শান্ত হলো। বুঝল—এখন লড়াইয়ে নামা বোকামি হবে। তাছাড়া ফ্রান্সিস তো মুক্ত আছে। ফ্রান্সিসের ওপর ওদের বিশ্বাস খুবই গভীর। শুধু বিস্কো বলল—আমরা আল জাহিরির সঙ্গে ফিরে যাবো। কিন্তু আমাদের হাত বাঁধা চলবে না। আমরা কেউ পালাবার চেষ্টা করবো না। আর একটা কথা—রাজকুমারী মারিয়াকে কয়েদঘরে রাখা চলবে না। তাঁকে আমাদের জাহাজে রাখতে হবে। হ্যারি কথাগুলো আল জাহিরিকে বুঝিয়ে বলল। আল জাহিরি খুবই বুদ্ধিমান। ও দুটো শর্তেই রাজি হলো। ওর তখন চিন্তা কোনোরকমে একবার কয়েদঘরে ঢোকাতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

হ্যারি ওরা সৈন্যদের পাহারায় বাড়ির বাইরে এলো। রাস্তায় দাঁড়াল। সৈন্যরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। আল জাহিরি হ্যারিকে বলল—তোমাদের আরো বন্ধু আছে। তারা কোথায়?

—আমি জানি না। হ্যারি বলল।

—একসঙ্গে পালালে আর এখন বলছো জানি না। আল জাহিরি বলল।

—যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়েছে নয় তো এ নগর থেকেই পালিয়ে গেছে। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। তাদেরও ধরবো। আল জাহিরি বলল।

—দেখুন চেষ্টা করে। হ্যারি বলল।

সবাই চলল জাহাজঘাটার দিকে। শাঙ্কো ওর তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিল। একজন সৈন্য আল জাহিরির ইঙ্গিতে তীর ধনুক কেড়ে নিল।

সৈন্যদের পাহারায় হ্যারিরা যখন যাচ্ছে তখন রাস্তার লোকজন ওদের দেখতে লাগল। হয়তো ভাবল এরা কোন দেশের লোক। এদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন।

জাহাজঘাটা থেকে একটু দূরে সেই কয়েদখানার সামনে এলো সবাই। হ্যারিদের এক এক করে ঢোকানো হতে লাগলো। সবশেষে হ্যারি ও মারিয়া। হ্যারি বলল রাজকুমারী আপনি এই কয়েদখানায় থাকবেন না। আমাদের জাহাজে আপনার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আল জাহিরি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছে। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না—আমি তোমাদের সঙ্গে এখানেই থাকবো। হ্যারি বলল—রাজকুমারী এসময় আপনি অবুঝ হবেন না। আপনি জাহাজে থাকলে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত থাকবো। তাছাড়া আপনাকে জাহাজে রাখার কারণ আছে। একটু থেমে হ্যারি বলল—আল জাহিরির সঙ্গে শর্ত থাকবে আপনি প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে আমাদের এই কয়েদঘরে দেখতে আসবেন। এবার হ্যারি গলা নামিয়ে আস্তে বলল—আসার সময় আপনি গাউনের নিচে যে ক'টা তরোয়াল আনা সম্ভব আনবেন। এভাবে কিছু অস্ত্র হাতে পেলে আমরা লড়াইয়ে নামবো। আপনি এখানে থাকলে সেটা সম্ভব হবে না। কাজেই আপনি জাহাজেই থাকুন। আপনার শরীরের দুর্বলতা এখনো যায়নি। মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। বুঝল হ্যারি ঠিকই বলেছে।

হ্যারি কয়েদঘরে ঢুকল। আল জাহিরি একজন সৈন্যকে হুকুম করল—মারিয়াকে তাদের জাহাজে রেখে আসতে। দু'জন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়াকে তাদের জাহাজের দিকে নিয়ে চলল।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়ার পর মারিয়া পোশাক রাখার চামড়ার পেটিটা খুলল। খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে বড় আর ঢোলা গাউনটা বের করল। গাউনটা বেশ জমকালো।

এবার মারিয়া অস্ত্রঘরে এলো। কোমরের দু'পাশে আর পেছনে—তিনটে তরোয়াল দড়ি দিয়ে শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিল। তারপর কেবিনঘরে এসে সেই বড় গাউনটা পরল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় রইল না। তরোয়ালগুলো মারিয়া খাপসুদ্ধু বেঁধেছিল। তাই হাঁটতে গিয়ে তরোয়ালের খোঁচা লাগল না। তরোয়ালের খাপগুলো লাগল। তাতে কেটে ছড়ে গেল না।

সেই জমকালো গাউন পরে মারিয়া জাহাজ থেকে পাটাতন দিয়ে নেমে এলো। দু'জন সৈন্য ছুটে এসে মারিয়ার দু'পাশে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে দাঁড়ালো। সৈন্যরা সবাই হাঁ করে মারিয়ার সেই জমকালো পোশাক দেখতে লাগলো। যেন নাচের আসরে যাচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে মারিয়া কয়েদঘরের দিকে চলল।

কয়েদঘরের দরজার কাছে এসে পাহারাদারদের ইঙ্গিতে দরজা খুলে দিতে বলল। পাহারাদার দরজার তালা খুলল। দরজা খুলে দিল। মারিয়া কয়েদঘরে

ঢুকে একপাশে ডানদিকে সরে গেল। পাহারাদাররা আর মারিয়াকে দেখতে পেল না।

মারিয়া এবার শাঙ্কোকে ডেকে বলল—আমার শরীরে তরোয়াল বাঁধা আছে। খুলে নাও। শাঙ্কো আস্তে আস্তে খাপসুদ্ধু তরোয়াল তিনটের বাঁধা দড়ি খুলে তরোয়াল বের করে আনল। তারপর দ্রুতহাতে ঘাসের বিছানার নিচে তরোয়াল তিনটে গুঁজে রাখল।

একটুপরে কিছু কথাবার্তা বলে মারিয়া চলে এলো।

এভাবে তিনদিন ধরে মারিয়া গাউনের নিচে তরোয়াল নিয়ে কয়েদঘরে আসতে লাগল। শাঙ্কো আর বিস্কো তরোয়াল লুকিয়ে রাখতে লাগল।

পরের দিন দুপুরে দুটো জাহাজ জাহাজঘাটায় এসে লাগল। হ্যারি পাহারাদারদের কথাবার্তা থেকে জানল ঐ দুটো জাহাজে শুধু ক্রীতদাসদের বিক্রির জন্যে আনা হয়েছে। কালকেই ক্রীতদাসদের কেনাবেচার হাট বসবে। একটু দূরে দুটো বাদামগাছের নিচে কাঠের পাটাতন পাতা মাচার মতো। ওখানেই ক্রীতদাসদের তোলা হয়। ক্রেতারা চারদিকে জড়ো হয়। ক্রীতদাসদের দেখেশুনে দাম হাঁকে। দরাদরির পর ক্রীতদাসদের কিনে লোকেরা নিয়ে যায়। হ্যারি বুঝল আর দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই যা অস্ত্র পাওয়া গেছে তাই নিয়ে লড়াইতে নামতে হবে।

হ্যারি বন্ধুদের ডেকে বলল—ভাইসব—কালকে এখানে ক্রীতদাস বিকিকিনির হাট বসবে। তাই আজকে রাতেই লড়াইয়ে নামতে হবে। বেশ কিছু তরোয়াল পেয়েছি। এই নিয়েই লড়াই করতে হবে। সবাই চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো। পাহারাদার কয়েকজন লোহার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বন্দীরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল কেন কিছুই বুঝল না ওরা। হ্যারিরা নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলছে তাও বুঝল না। ওরা একটুক্ষণ দেখে দরজা থেকে সরে গেল।

তখন রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। যে সৈন্যরা খাবার দিতে এসেছিল তারা চলে গেছে।

হ্যারি মৃদুস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো। হ্যারির সামনে এসে মাথা নিচু করল। হ্যারি বাঁধা হাত দুটো শাঙ্কোর ঢোলা পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে ছোরাটা বের করল। ছোরাটা দিয়ে শাঙ্কোর হাতের দড়ি ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। উত্তেজনায় ছোরার মুখ এদিক ওদিক ঘুরে যেতে লাগল। তাতে শাঙ্কোর হাত কেটে যেতে লাগল। রক্ত বেরুলো। শাঙ্কো দাঁত চেপে সব সহ্য করতে লাগলো।

একসময় দড়িটা কেটে গেল। শাঙ্কো এক হ্যাঁচকা টানে সবটা কাটা দড়ি ছিঁড়ে ফেলল। তারপর ছোরাটা হাতে নিয়ে সবার হাতের দড়ি কেটে ফেলতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবার হাতের দড়ি কাটা হলো।

'তারপর মারিয়া যে দশ বারোটা তরোয়াল এনেছিল সেইসব তরোয়ালগুলো ঘাসের বিছানার তলা থেকে বের করে ভাইকিংরা লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হলো।

হ্যারির নির্দেশ মতো দু'তিনজন ভাইকিং কয়েদঘরের দরজার কাছে গিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করল। দু'জন পাহারাদার দরজার কাছে এলো। বলতে লাগল কী হয়েছে? ভাইকিংরাও আজেবাজে বকতে লাগল। কেউ কারো কথা বুঝল না। ভাইকিংরা ইঙ্গিতে পাহারাদারদের ভেতরে আসতে বলল। পাহারাদার দরজা খুলল। তিনজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে ভেতরে ঢুকল। সশস্ত্র ভাইকিংরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। পাহারাদাররা ঘরে ঢুকতেই ওদের ওপর তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাহারাদাররা স্বপ্নেও ভাবেনি এরকমভাবে আক্রান্ত হবে। ওরা তরোয়াল চালিয়ে লড়াই করতে লাগল। কিন্তু ভাইকিংদের নিপুণ তরোয়াল চালানোর সামনে ওরা দাঁড়াতেই পারল না। তিনজন পাহারাদারই আহত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। গোঙাতে লাগল।

হ্যারিওরা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এলো। কয়েদঘরের বাইরে উঠোন মতো জায়গায় আল জাহিরির একদল সৈন্য শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল। কয়েদঘরের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ওরা কয়েদঘরের দরজার কাছে জ্বলন্ত মশালের আলোয় দেখল হ্যারিরা খোলা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে আসছে। সৈন্যরা পরস্পরকে ধাক্কাধাক্কি করে ঘুম ভাঙাল। তারপর খাপ থেকে তরোয়াল খুলে নিয়ে ছুটে এলো।

ভাইকিংরাও ছুটে এলো। শুরু হলো তরোয়ালের লড়াই। আল জাহিরির সৈন্যরা একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝল—এ বড় কঠিন ঠাঁই। দুর্ধর্ষ ভাইকিংদের অভিজ্ঞ হাতের তরোয়ালের মারের কাছে ওরা একে একে হার স্বীকার করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্ধেক সৈন্য আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। উঠোনমতো জায়গাটা ভরে উঠল আহত সৈন্যদের গোঙানিতে আর্ত চিৎকারে। বাকিরা প্রাণভয়ে অন্ধকারে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

ওদিকে এখানে লড়াইয়ের চিৎকারে আর্তনাদে আল জাহিরির জাহাজের সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। ওরা খোলা তরোয়াল হাতে দল বেঁধে জাহাজ থেকে নেমে এলো। ভাইকিংরাও ওদের দিকে ছুটে গেল। আল জাহিরির একদল সৈন্যকে হারিয়ে ভাইকিংরা প্রত্যেকেই তরোয়াল পেয়েছে। ভাইকিংরা একবার অস্ত্র হাতে পেলে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সহজ কথা নয়।

দু'দল পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে হ্যারি গিয়ে দু'দলের মাঝখানে দাঁড়াল। হ্যারি দু'হাত তুলে চিৎকার করে উঠল—থামো। দু'দলই দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যারি আল জাহিরির সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—সৈন্যরা—এইমাত্র তোমাদের একদল সৈন্যকে আমরা হারিয়ে দিয়ে এসেছি। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে তোমাদেরও সেই দশা হবে। তার আগে বলছি—তোমরা অস্ত্রত্যাগ কর। হার

স্বীকার কর। তোমাদের জাহাজে করে তোমরা চলে যাবে। আমরা কোনো বাধা দেব না। হ্যারি একটুক্ষণের জন্যে থেমে বলল—এখন তোমরাই বিবেচনা কর কী চাও তোমরা—মৃত্যু না বেঁচে থাকা। আল জাহিরির সৈন্যদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। এসময় আল জাহিরি জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। চিৎকার করে ওর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল—বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন? আক্রমণ কর। সৈন্যরা দ্বিধায় পড়ে গেল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা—তোমরা একবার লড়াইয়ে নামলে কেউ বাঁচবে না। আল জাহিরির কথায় তোমরা বোকার মতো মরতে যাবে কেন? অস্ত্র ত্যাগ কর। আবার সৈন্যদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। ওরা সংখ্যায় বেশি হলেও লড়াইয়ে নামতে ইতস্তত করতে লাগল। হ্যারি আবার চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা—অস্ত্র ত্যাগ কর। আল জাহিরি চিৎকার করে বলে উঠল—কাপুরুষের দল—লড়াই কর্—আক্রমণ কর্।

এবার কিছু সৈন্য তরোয়াল মাটিতে ফেলে দল থেকে সরে দাঁড়াল। বাকিরা এগিয়ে এল। মুহূর্তে ভাইকিংরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো লড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল জাহিরির অর্ধেকের বেশি সৈন্য হয় মারা গেল না তো আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল। লড়াই চলল। কিন্তু আল জাহিরির বাকি সৈন্যদের মনোবল ততক্ষণে ভেঙে গেছে। ওরা অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিল। নয়তো পালিয়ে গেল।

ভাইকিংরা ধ্বনি তুলল ও—হো—হো। লড়বার জন্যে আল জাহিরির একটি সৈন্যও আর তখন সামনে নেই।

হ্যারি দেখল—জাহাজের রেলিঙের কাছে আল জাহিরি নেই। হ্যারি চিৎকার করে বলল—শাঙ্কো শিগগিরি জাহাজে যাও। আল জাহিরি না পালিয়ে যায়।

শাঙ্কো এক ছুটে জাহাজে উঠে পড়ল। ডেক-এর কোথাও আল জাহিরিকে দেখল না। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। কেবিনঘরেব মধ্যে দেখতে লাগল। আল জাহিরি কোনো কেবিনঘরে নেই। রসুইঘরেও নেই। নিশ্চয়ই ডেক-এ কোথাও লুকিয়ে আছে। অন্ধকারে জলে নেমে পালাবার ধান্দায় আছে। শাঙ্কো দ্রুতপায়ে ডেক-এ উঠে এলো। চারদিকে খুঁজতে লাগল। তখনই অস্পষ্ট জলে সাঁতার কাটার শব্দ শুনল। শাঙ্কো জাহাজের পেছনের দিকে এলো। হালের কাছে এসে নিচে জলের দিকে তাকাল। অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখল কেউ যেন জলে সাঁতরে চলেছে তীরের দিকে। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল দাঁতে চেপে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দ্রুত সাঁতার কেটে পলায়নপর আল জাহিরির পেছনে পেছনে চলল।

কিছুক্ষণ পরে আল জাহিরি তীরে উঠল। শাঙ্কোও শ্যাওলাধরা পাথরে পা রেখে সাবধানে তীরে উঠল। অন্ধকারে আল জাহিরি ছুটে পালাতে যাবে তখনই শাঙ্কো ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

তরোয়াল হাতে নিয়ে শাঙ্কো তরোয়ালের ডগাটা আল জাহিরির গলায় ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে। কথাটা শাঙ্কো স্পেনীয় ভাষায় বলল। আল জাহিরি এটুকু বুঝল যে আর পালাবার উপায় নেই। আল জাহিরিও তখন হাঁপাচ্ছে। শাঙ্কো বলল—তোমার সৈন্যরা কিছু মরেছে কিছু আহত হয়ে গোঙাচ্ছে কিছু পালিয়েছে। মোট কথা আল জাহিরি এখন তুমি একেবারে একা।

আল জাহিরি হঠাৎ একটু নিচু হয়ে এক হ্যাঁচকা টানে কোমরের ঝোলানো তরোয়ালটা খুলে আনল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—এখন তুমিও একা। লড়ে আমাকে হারাও দেখি। শাঙ্কোও কোমর থেকে তরোয়াল বের করল। আকাশে ভাঙা চাঁদ। অনুজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দু'জনের তরোয়ালের লড়াই শুরু হলো। প্রায় অন্ধকারে দু'জনের হাঁপানোর শব্দ আর তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ।

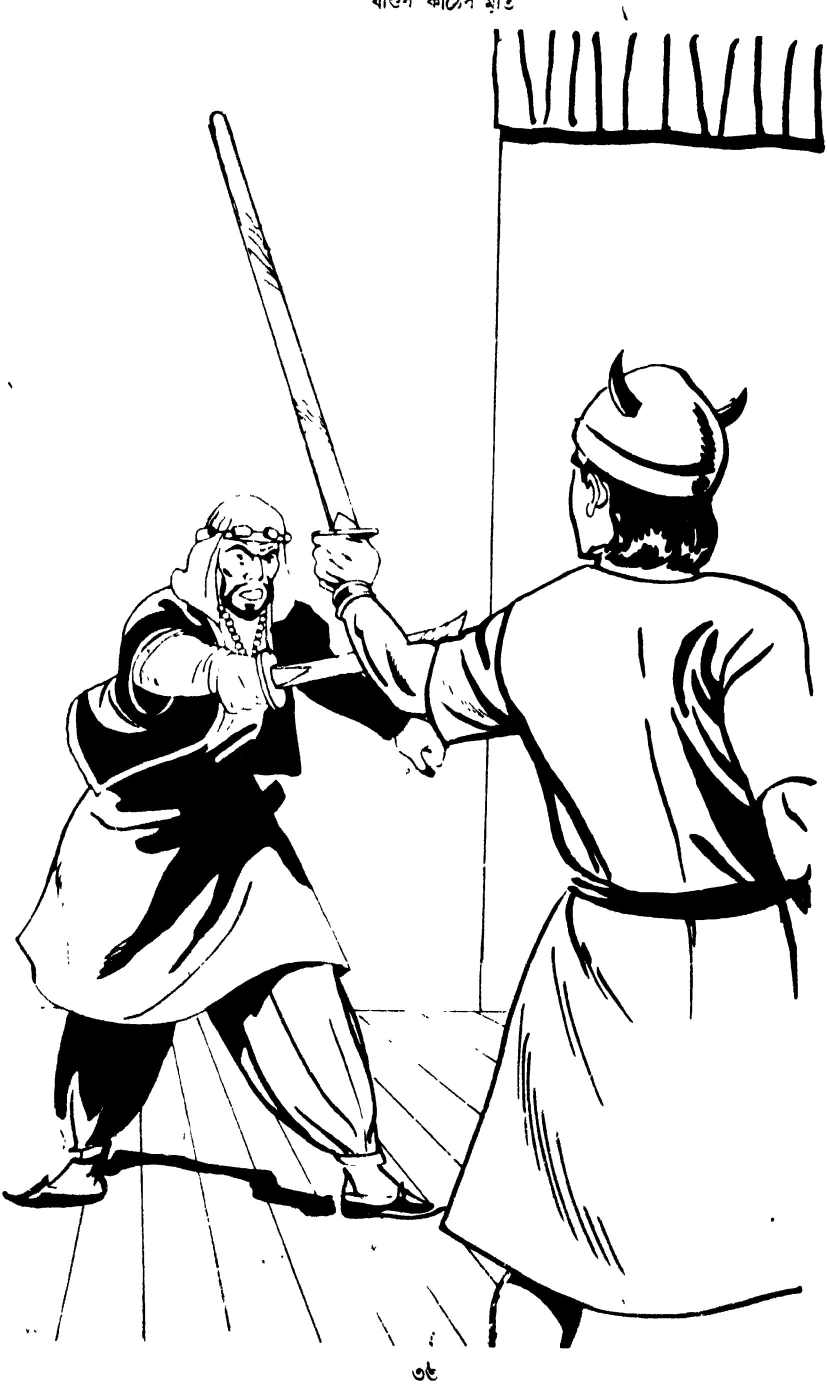
কিছুক্ষণ লড়েই আল জাহিরি বুঝল কেন ভাইকিংদের দুর্ধর্ষ বলা হয়। শাঙ্কোর নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে আল জাহিরি বুঝল ওকে সহজে হারানো যাবে না। অথচ এখন শাঙ্কোকে হারাতে না পারলে ওর আর পালিয়ে যাওয়া হবে না। আল জাহিরি প্রাণপণে লড়তে লাগল। দু'জনের নাক মুখ দিয়ে বেশ শব্দ করে শ্বাস পড়ছে। লড়াই চলল।

একসময় শাঙ্কো কয়েক পা দ্রুত পিছিয়ে গেল। আল জাহিরি এক লাফে এগিয়ে এল। শাঙ্কো এই সুযোগ কাজে লাগালো। শাঙ্কো সামনে লাফিয়ে পড়ে দ্রুত তরোয়াল চালাল। এত দ্রুত তরোয়ালের ঘা নেমে এলো যে আল জাহিরি আত্মরক্ষা করার সময় পেল না। শাঙ্কো আল জাহিরির ডানবাহুতে তরোয়ালের কোপ বসিয়ে দিল। তীব্র ব্যথায় আল জাহিরি কঁকিয়ে উঠল। হাতির দাঁতে বাঁধানো বাঁটওয়ালা তরোয়ালটা মাটিতে ফেলে বাঁ হাত দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরল।

শাঙ্কো তরোয়ালটা তুলে নিল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—তোমাকে এক্ষুণি নিকেশ করতে পারি। কিন্তু তা করবো না। তোমাদের জাহাজের কয়েদঘরে তোমাকে বন্দী করে রাখবো। কত নিরীহ মানুষদের রক্তে আর চোখের জলে ভেজা ঐ কয়েদঘর। তোমাকে সেখানে বন্দী করে রাখা হবে। নিরীহ মানুষগুলো দিনের পর দিন কী অমানুষিক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থেকেছে তার স্বাদ তুমিও পাও। তোমার প্রায়শ্চিত্ত হোক। আল জাহিরি অনুনয়ের সুরে বলল—আমাকে ছেড়ে দাও। কথা দিচ্ছি—আমি আর ক্রীতদাস বিক্রির ব্যবসা করবো না।

—না—শাঙ্কো বলল—তুমি অনেক রক্ত ঝরিয়েছো, অনেক চোখের জল ঝরিয়েছো। তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে। চলো তোমাদের জাহাজে। শাঙ্কো ওর তরোয়াল আল জাহিরির পিঠে ঠেকাল। বলল চলো।

দু'জনে যখন আল জাহিরির জাহাজ থেকে ফেলা কাঠের পাটাতন দিয়ে



উঠছে তখন ভাইকিংরা নিজেদের জাহাজ থেকে উল্লাসের ধ্বনি তুলল ও—হো—হো।

সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে নেমে কয়েদঘরের দরজার কাছে এলো। আল জাহিরি এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—এই কয়েদঘরে থাকলে আমি মরে যাবো।

—তোমাকে তিলে তিলে মারবার জন্যেই এই কয়েদঘরে রাখা হবে। শাঙ্কো বলল। এবার আল জাহিরি বলল—আমার কাছে মুক্তো মণি-মাণিক্য আছে। সব তোমাকে দেব। আমাকে ছেড়ে দাও।

—ও সব লোভ আমাকে দেখিও না। ঢোকো কয়েদঘরে। কথাটা বলে শাঙ্কো আল জাহিরির পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়ালো। আল জাহিরি এবার কেঁদে ফেলল। বলল—আমাকে এভাবে তিল তিল করে মেরো না। বুকে তরোয়াল ঢুকিয়ে একবারে মেরে ফেলো।

—না—তোমাকে এই কয়েদঘরেই মরতে হবে। ঢোকো কয়েদঘরে। কথাটা বলে শাঙ্কো তরোয়ালের চাপ বাড়ালো। আল জাহিরি কাঁদতে কাঁদতে কয়েদঘরে ঢুকল। শাঙ্কো বাইরে থেকে লোহার দরজা বন্ধ করে দিল।

কোমরে তরোয়াল গুঁজে শাঙ্কো সিঁড়ি দিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এলো। জাহাজের পেছন দিকে হালের কাছে এলো। দেখল এই ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে ওদের জাহাজটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। শাঙ্কো কোমর থেকে ছোরা বের করল। বাঁধা দড়িটা ছোরা দিয়ে ঘষে ঘষে কেটে ফেলল। ওদের জাহাজটা হাত দশেক দূরে সরে গেল।

এবার শাঙ্কো কয়েকজন ভাইকিংকে এই জাহাজে আসতে বলল। ওরা এলো। শাঙ্কো বলল—চলো নোঙর তুলতে হবে।

কয়েকজন মিলে টেনে টেনে নোঙর তুলল। যেখানে নোঙর আটকানো থাকে সেখানে নোঙর তুলে রাখলো তারপর ক্যারাভেল জাহাজ থেকে সকলেই নেমে এসে নিজেদের জাহাজে উঠল। ক্যারাভেল জাহাজটা হাওয়ার ধাক্কায় আস্তে আস্তে মাঝ সমুদ্রের দিকে চলল। জাহাজটার নিচের কয়েদঘরে একা আল জাহিরি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল—শাঙ্কো, আল জাহিরিকে কী করেছো?

—ঐ জাহাজের কয়েদঘরে বন্দী করে রেখে এসেছি। শাঙ্কো বলল।

—ভালো করেছো। নিজের জীবন দিয়ে ও বুঝুক মানুষের ওপর অত্যাচারের ফল কী? হ্যারি বলল। আল জাহিরিকে কী শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেটা সকলেই শুনল। আনন্দে ওরা আবার চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো।

ওদিকে আল জাহিরর যে পাঁচ ছ'জন পাহারাদার সৈন্য অক্ষত দেহে পালাতে পেরেছিল তারা কয়েদঘরের পেছনের জঙ্গলটায় জড়ো হল। ওরা কয়েদঘরের আড়াল থেকে দেখেছিল একজন ভাইকিং আল জাহিরিকে ওদের জাহাজে নিয়ে

যাচ্ছে। ওদের অশঙ্কা ছিল হয়তো ওরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলেছে। এখন দেখল আল জাহিরি বেঁচে আছে। ওদের জাহাজেই আল জাহিরিকে বন্দী করে রাখা হয়েছে—এটা বুঝল।

ওরা আরো দেখল ভাইকিং যোদ্ধাটি ওদের জাহাজ থেকে নেমে এল। ঘাট পর্যন্ত পাতা কাঠের পাটাতন তুলে ফেলল। তারপর ভাইকিংটা নিজেদের জাহাজে গিয়ে উঠল। বোঝাই গেল আল জাহিরিকে কয়েদঘরেই বন্দী করে রেখে ভাইকিংটা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দেখল ওদের জাহাজ মাঝ সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে।

একজন সৈন্য বলে উঠল—জাহাজটা চালাবার মত কেউ নেই। এভাবে ভেসে গেলে অনেক দূর চলে যাবে। আমরা আর জাহাজটার কোন খোঁজই পাবো না। কাজেই এখনি আমাদের ঐ জাহাজটায় গিয়ে উঠতে হবে।

—কিন্তু যাবো কিভাবে? একজন সৈন্য বলল।

—সাঁতার কেটে চলো। একজন সৈন্য বলল।

—না। এতদূর সাঁতরে যেতে গিয়ে হয়তো হাঙরের মুখে পড়বো। কেউ বাঁচবো না তাহলে। অন্যজন বলল।

—তাহলে এক কাজ করা যাক। জেলেপাড়ায় চলো।

ওখানে নিশ্চয়ই একটা মাছধরা নৌকো পাবো। একজন বলল। এ কথায় সবাই রাজি হল। অন্ধকারে চলল জেলেপাড়ার দিকে।

কিছুক্ষণ পরে জেলেদের বস্তী দেখল। পাথ আর কাঠের বাড়িঘরদোর। সমুদ্র তীরটা এখানে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকে অন্ধকারেও দেখা গেল আট দশটা জেলে নৌকো জল থেকে একটু দূরে বালিয়াড়িতে তুলে রাখা হয়েছে।

সৈন্যরা পাঁচজন নৌকোগুলোর কাছে গেল। শক্তপোক্ত দেখে একটা নৌকো ওরা বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলল। তারপর সমুদ্রের জলে নামাল। নৌকোতে উঠল ওরা। দাঁড় নিল একজন। অন্যজন দাঁড় হালের মত জলে রাখল। দাঁড় বাওয়া চলল। নৌকোও চলল আল জাহিরির জাহাজ লক্ষ্য করে। রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠল। ভোরের নরম আলো ছড়ালো আকাশে সমুদ্রে। ওদের ভাগ্যি ভালো যে একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণে ওদের নৌকোটা ঢাকা পড়ে গেছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজের নজরদার পেড্রো কুয়াশায় ঢাকা পড়া নৌকোটা দেখতে পেল না।

কুয়াশা ঢাকা সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ওদের নৌকো চলল আল জাহিরির জাহাজ লক্ষ্য করে। আল জাহিরির জাহাজও কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে না। স্রেফ আন্দাজেই দিক ঠিক করে ওরা নৌকো বেয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরেই ঘন কুয়াশাঘেরা আল জাহিরিব জাহাজটা ওরা দেখতে পেল।

ওরা নৌকোটা আরো দ্রুত চালাল।

একসময় জাহাজের গায়ে এসে লাগল ওদের নৌকোটা। জাহাজ থেকে ঝুলে-থাকা দড়িদড়া ধরে ওরা জাহাজটায় উঠল। দেখল ডেক-এ কেউ নেই। ওরা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচের কেবিনঘরগুলোর সামনে এল। প্রত্যেকটি কেবিনঘর খুঁজে দেখল—আল জাহিরি কোথাও নেই। ওদের চিন্তা হল—তাহলে কি ঐ ভিনদেশি লোকেরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? একজন পাহারাদার সৈন্য বললও সেকথা। আর একজন বলল—ওরা আল জাহিরিকে মেরে ফেলে নি। চলোতো একবার কয়েদখানাটা দেখি।

এবার সবাই ছুটল নিচের কয়েদঘরের দিকে। কয়েদঘরের গরাদের সামনে এসে দেখল কয়েদঘরে মেঝেয় দুই হাঁটুতে হাত রেখে মাথা নিচু করে আল জাহিরি বসে আছে। ওদের পায়ের শব্দে আল জাহিরি মুখ তুলে তাকাল। সৈন্যদের দেখেই ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। চিৎকার করে বলল—শিগগিরি দরজা খোল্। আমাকে বাঁচা। সৈন্যরা দেখল দরজায় তালা লাগানো। কিন্তু চাবি কোথায়? ওরা লোহার দরজার কাছে জায়গাটা ভালো করে খুঁজল। কোথাও চাবিটা পড়েনি।

তখন একজন সৈন্য ছুটল যেখানে জাহাজ মেরামতির জন্যে হাতুড়ি গজাল থাকে।

একটা মোটা হাতুড়ি আর গজাল নিয়ে সৈন্যটি ফিরে এল। গজালটা তালার ওপর রেখে গজালটায় হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। ও কয়েকটা হাতুড়ির ঘা মেরে আর একজনের হাতে হাতুড়িটা দিল। সে এবার হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল। লোহার গরাদের ওপাশে আল জাহিরি তখন ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে—আমাকে বাঁচা তোরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তালার জোড়াটা ভেঙে খসে পড়ল। ওরা দরজা খুলল। আল জাহিরি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল। চিৎকার করে বলল—ওরা আমাকে এখানে বন্দী করে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মারার ব্যবস্থা করেছিল। আমি এর শোধ তুলবো। ওদের দেশের রাজকুমারীর ওপর নজর রাখবো। একা পেলেই বন্দী করে এই জাহাজে নিয়ে আসবো। তারপর উত্তর কর্সিকায় যে ক্রীতদাস কেনাবেচার বড় হাট বসে সেখানে রাজকুমারীকে বিক্রি করে দেব। এত দাম পাবো যে বাকি জীবন আমার রাজার হালে কেটে যাবে। কথাগুলো বলে আল জাহিরি হাঁপাতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—শিগগিরি আমায় খেতে দে। খিদের জ্বালায় মরে গেলাম।

সৈন্যদের মধ্যে একজন চলে গেল রসুইঘরে। তাড়াতাড়িতে কিছু খাবার রান্না করতে লাগল।

আল জাহিরি চলল নিজের কেবিনঘরের দিকে। পেছনে চারজন সৈন্যও চলল। আল জাহিরি কেবিনঘরে ঢুকেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে

রইল।

আল জাহিরি বলল—কালকে সকালেই তোরা তীরে যাবি। আমার সৈন্যরা অনেক মরেছে। তবে কিছু বেঁচেও তো আছে। তাদের খুঁজে বের করবি। এভাবেই সৈন্যসংখ্যা বাড়াতে হবে। একটু থেমে জাহিরি বলল—একজন সৈন্য সবসময় কয়েদঘরের আড়াল থেকে লক্ষ্য রাখবি ওদের রাজকুমারী নিশ্চয়ই জাহাজ থেকে নেমে একা একটু বেড়িয়ে বেড়াতে পারে। সুযোগ বুঝে রাজকুমারীকে বন্দী করতে হবে। কী? পারবি তো? চারজনেই বলল—হ্যাঁ পারবো। একজন সৈন্য বলল—রাজকুমারী ঐ ভিনদেশিদের চোখের আড়ালে গেলেই আমরা রাজকুমারীকে ধরবো। আল জাহিরি বলল—তোরা এই জাহাজে এলি কী করে? সাঁতরে?

—না—জেলেদের নৌকোয় চড়ে এসেছি। একজন সৈন্য বলল।

—এবার ঐ নৌকো করেই তীরে যা। যা যা বললাম তাই করবি। আল জাহিরি বলল।

সৈন্য চারজন চলে গেল।

তখনই রাঁধুনি সৈন্যটি কাঠের থালা বাটিতে গোল রুটি আর মাংসের ঝোল নিয়ে ঢুকল। বিছানায় রাখল। আল জাহিরি পাগলের মত খাবারের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল।

সৈন্য চারজন জাহাজ থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিল। মই বেয়ে বেয়ে ওরা নৌকোয় উঠল। দাঁড় হাতে নিয়ে নৌকো চালাল তীরভূমির দিকে।

তখন ভোর হয়েছে। সকালের নরম রোদ সমুদ্রের জলের ওপর ছড়িয়েছে। কয়েদঘরের পেছনে জঙ্গলে পাখির ডাকাডাকি শুরু হয়েছে। নৌকো তীরে এসে লাগল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে নজরদার পেড্রো অস্পষ্ট নৌকোটা দেখল। কিন্তু জেলেদের নৌকো বলে ও নৌকোটাকে কোন গুরুত্ব দিল না।

আল জাহিরির জাহাজটা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যেখানে সমুদ্রের তীরভূমি বাঁক নিয়েছে সেখানটায় এল। এই বাঁকের জন্যেই ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেকে নজরদার পেড্রো জাহাজটা দেখতে পাচ্ছিল না।

আল জাহিরির চার সৈন্য তীরে নামল। চলল জেড়ে পাড়ার দিকে। জেলেপাড়া থেকে তখন জেলেরা বেরিয়ে আসছে। নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। ওরা জেলেদের জিজ্ঞেস করতে লাগল—আমাদের কয়েকজন সৈনিক বন্ধু কি তোমাদের কারো বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে? জেলেরা মথো নেড়ে বলল—না। একজন জেলে বলে উঠল—দু'জন সৈন্য আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তবে সে দু'জন তোমাদের বন্ধু কি না জানি না। একজন সৈন্য বলল—আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। ঐ দু'জন সৈন্যকে দেখলেই বুঝতে পারবো আমাদের বন্ধু কি না। জেলেটি বলল—বেশ—এসো। আমি দেরি কবতে পারবো না। আমাকে এখুনি নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যেতে হবে।

—না-না। আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো। একজন সৈন্য বলল।

জেলের পেছনে পেছনে সৈন্য চারজন চলল। জেলেটি ওদের নিজের কাঠপাথরের বাড়িতে নিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বৌকে বলল—যে দু'জন সৈন্য আশ্রয় নিয়েছে তাদের বাইরে আসতে বলো। দু'জন সৈন্য তখন ঘরের ভেজানো দরজার আড়াল থেকে বাইরে কারা এসেছে দেখল। ওরা নিশ্চিন্ত হল। ওদেরই বন্ধু। দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। একজন সৈন্য বলল—এখানে দেরি করা চলবে না। অন্য বন্ধুদের খুঁজতে হবে। চলো সব।

সৈন্যরা দল বেঁধে চলল। ওরা জাহাজঘাটার দিকে গেল না। কয়েদঘরের পেছনের জঙ্গলটায় ঢুকল। বড় বড় গাছের গুঁড়ি আর লতাপাতার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে চলল ওরা। গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে কোথাও কোথাও ভাঙা ভাঙা রোদ পড়েছে। ওরা আস্তে আস্তে যেতে যেতে বন্ধুদের নাম ধরে ডাকতে লাগল। হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে থেকে তিনজন বন্ধু সাড়া দিল। তারপর ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওরা এসে বলল—আরো দু'জন কেরিনিয়া নগরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে। এবার সবাই মিলে চলল কেরিনিয়া নগরে। নগরের পথে খুব একটা ভীড় নেই। ওরা এই রাস্তা ঐ রাস্তা দিয়ে ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল দুই বন্ধুকে।

খুঁজতে খুঁজতে বেশ বেলা হল। খিদেও পেয়েছে। ওরা একটা সরাইখানায় ঢুকল খাবার খেতে। তখনই ওরা দেখল বন্ধু দু'জনও খাচ্ছে। দুই বন্ধুকে পেয়ে ওরা খুশিই হল।

খেয়েদেয়ে সবাই হাঁটতে হাঁটতে জেলেপাড়ায় এল। শুধু একজন সৈন্য কয়েদঘরের আড়ালে দাঁড়াল। মারিয়ার ওপর নজর রাখার জন্যে।

জেলেপাড়ার ঘাটে নৌকো পেল না ওরা। সবকটা নৌকো চালিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে চলে গেছে। অগত্যা ওরা নৌকো ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিকেল নাগাদ জেলেরা নৌকো নিয়ে ফিরল। সৈন্যরা দুটো জেলে নৌকো জোগাড় করল। নৌকোয় চড়ে চলল আল জাহিরির জাহাজের দিকে।

সেদিন বিকেল থেকেই মারিয়া বুঝতে পারল জ্বর আসছে। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা শুরু হল। মারিয়া চুপ করে বিছানায় শুয়ে রইল।

সন্ধ্যের সময় হ্যারি মারিয়ার কাছে এল খোঁজখবর করতে। মারিয়াকে শুয়ে থাকতে দেখে বলল—আপনার কি শরীর খারাপ?

—না-না—একটু বিশ্রাম করছি। মারিয়া বলল। হ্যারি বলল—বেশি শুয়ে থাকবেন না। এসময় তো আপনি ডেক-এ যান। এখন যান। একটু ঘুরে আসুন।

—আজকে ভালো লাগছে না। মারিয়া বলল। এবার হ্যারি চিন্তিতস্বরে বলল—ফ্রান্সিসরা ফিরল না। যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছে কি না—এখন

ওরা কোথায় আছে—কী করছে কোন খবরই পাচ্ছি না।

—এতে ভাববার কী আছে। মূর্তি খুঁজে পেলেই চলে আসবে। মারিয়া বলল।

—তা ঠিক। তবু দুশ্চিন্তা হয়। হ্যারি বলল। একটু থেমে বলল—আপনি বিশ্রাম করুন আমি যাচ্ছি। হ্যারি চলে গেল।

রাতের খাবার খেল না মারিয়া। মাথা যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। জ্বর বেড়েই চলেছে। মারিয়া বুঝল—অসুখের কথা আর গোপন করা চলবে না। জ্বর বাড়তে বাড়তে ও হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। ভেনকে খবর দিতে হয়। মারিয়া ঠিক করল ও নিজেই ভেনকে ডেকে আনবে। আর কাউকে জানতে দেবে না। যদি ভাইকিং বন্ধুরা জানতে পারে যে মারিয়া অসুস্থ তাহলে ওরা খুবই চিন্তায় পড়ে যাবে। আবার ফ্রান্সিসও এখানে নেই। ওদের দুশ্চিন্তা আরো বাড়বে।

রাত বাড়ল। মারিয়া বুঝল আর দেরি করা উচিত হবে না। মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠল। যে মোটা কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে ছিল সেটা গায়ে দিয়ে চলল। মাথার যন্ত্রণায় ভালো করে তাকাতে পারছে না। কানের দু'পাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে। দরজার কাছে যেতেই মাথা ঘুরে উঠল। দরজা চেপে ধরে টাল সামলাল।

একটা ঝুলন্ত কাচে-ঢাকা আলো জ্বলছে বাইরে। ঐ সামান্য আলোতেই দেখে দেখে ভেন-এর কেবিনঘরের দরজার সামনে মারিয়া এল। দরজা খোলাই ছিল। মারিয়া কেবিনঘরে ঢুকে, ডাকল—ভেন-ভেন। ভেন-এর ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। জিজ্ঞেস করল—কে? রাজকুমারী?

—হ্যাঁ। একবার এসো তো। একটু জ্বরমত হয়েছে। মারিয়া বলল।

—সে কি! এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলেন। ভেন বলল।

ঐ কেবিনঘরে বিস্কোও থাকে। বিস্কোর ঘুম ভেঙে গেল। বলল—রাজকুমারীর কী হয়েছে?

—একটু জ্বর হয়েছে—ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে। মারিয়া বলল। বিস্কো বিছানা থেকে নেমে এল। বলল—চলুন আপনাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। ভেনকে বলল—ভেন—তুমি ওষুধ নিয়ে এসো। বিস্কো মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে চলল মারিয়ার কেবিনঘরের দিকে। এতক্ষণ মারিয়া শরীরের ব্যথা বেদনা মাথার অসহ্য যন্ত্রণা প্রবল জ্বর অনেক কষ্টে সহ্য করছিল। আর পারল না। নিজের কেবিনঘরের দরজার কাছে এসে মাথা ঘুরে মেঝেয় পড়ে গেল। বিস্কো তো অবাক। সামান্য জ্বরে মারিয়া এতটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও মারিয়ার পিঠে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে উঠে বসাল। তারপর মারিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলল। এইবার বিস্কো বুঝল—রাজকুমারীর শরীর প্রচণ্ড জ্বরে যেন পুড়ে আছে। বিস্কো আস্তে আস্তে মারিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল।

মারিয়ার গলা থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। বিস্কো মারিয়ার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ভেন ঢুকল। হাতের ওষুধের বোয়ামটা বিছানায় রাখল। মারিয়ার কপালে গলায় হাত রেখে জ্বরের তাপ দেখল। তারপর চোখ দেখল। হাতের নাড়ির গতি দেখল। তারপর মেঝেয় গিয়ে বসল। বোয়ামটা নিল। বোয়াম থেকে সবুজ রঙের আঠালো একটা ওষুধ বের করল। হাত দিয়ে চারটে বড়ি করল। বিস্কোকে বলল—জল এনে ওষুধের একটা বড়ি রাজকুমারীকে খাইয়ে দাও। বিস্কো কাঠের গ্লাসে জল এনে মারিয়াকে মৃদুস্বরে বলল—রাজকুমারী এই ওষুধটা খেয়ে নিন। এটা খেলে কষ্ট কমবে। মারিয়া তখন প্রায় অজ্ঞানের মত। বিস্কো বুঝল সেটা। তবু ওষুধটা খাওয়াতে হবেই। বিস্কো মারিয়ার পিঠে হাত রেখে মাথাটা উঁচু করল। জলের গ্লাস থেকে মুখে জল ঢালল। মারিয়া জল খেল। বিস্কো এবার একটা বড়ি খাইয়ে দিল। তারপর মারিয়াকে শুইয়ে দিল।

বিস্কো ভেনকে বলল—ভেন তুমি চলে যেও না। ভেন বলল—আমাকে এখানে সারারাতই জেগে থাকতে হবে।

—আমি হ্যারিকে ডেকে আনছি। বিস্কো বলল। তারপর দ্রুত পায়ে কেবিনঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরেই হ্যারি এল। সঙ্গে শাঙ্কো। হ্যারি এগিয়ে গিয়ে মারিয়ার কপালে হাত রাখল। গলায় হাত রাখল। বলল—ভেন—জ্বর খুব বেশি—তাই না? ভেন বলল—হ্যাঁ। ওষুধ দিয়েছি। জ্বর কমবে।

ভেন বিছানায় বসল। মাঝে মাঝে মারিয়ার কপালে হাত দিয়ে দেখতে লাগল। হ্যারিরা মেঝেয় বসে রইল। হ্যারি ভাবছিল এই বিপদের সময় ফ্রান্সিস নেই। ফ্রান্সিস থাকলে মনে অনেক জোর পাওয়া যেত।

ততক্ষণে ভাইকিংরা খবর পেয়েছে রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ। ওরা কেবিনঘরের বাইরে ভীড় করল।

শেষ রাতের দিকে মারিয়াকে পরীক্ষা করে ভেন বলল—হ্যারি—জ্বর অনেকটা কমেছে। হ্যারি মারিয়ার কপালে হাত রাখল। হ্যাঁ—জ্বর অনেক কম।

ভোর হল। ভেন আর হ্যারিরা তখনও বসে আছে। রাতে কেউ আর ঘুমোয় নি।

হ্যারি ভেনকে বলল—তোমার কি মনে হয় এই ওষুধেই রাজকুমারী সুস্থ হবেন?

—তা ঠিক বলতে পারছি না। কয়েকদিন যাক—তখন বলতে পারবো। ভেন বলল।

বিকেল হতেই মারিয়ার আবার জ্বর এল। জ্বর বাড়তে লাগল। জ্বর এত বাড়ল যে মারিয়া প্রায় অজ্ঞানের মত হয়ে গেল। হ্যারি ভেনকে ডেকে নিয়ে

এল। ভেন মারিয়ার কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। ভেন-এর মুখ চিন্তাকুল হল।

ভেন মেঝেয় বসল। যে ঝোলাটা এনেছিল সেটা থেকে একটা শুকনো শেকড় বের করল। তারপর বের করল দুটো পাথর। বিস্কোকে জল আনতে বলল। বিস্কো কাঠের গ্লাশে জল ভরে দিল। ভেন শেকড়টা কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখল। তারপর শেকড়টা একটা পাথরের ওপর রাখল। অন্য পাথরটা দিয়ে শেকড়টা ঘষতে লাগল। হলুদ রঙের রস বেরোতে লাগল। সেই রসটা কাঠের গ্লাশের জলের সঙ্গে মেশাল। হ্যারিকে বলল—হলুদ জলটুকু রাজকুমারীকে খাইয়ে দাও।

হ্যারি সাবধানে মারিয়ার মাথাটা দু'হাতে তুলে ধরল। আস্তে আস্তে মারিয়াকে ওঠাতে ওঠাতে বলল—রাজকুমারী—কষ্ট করে ওষুধটা খেয়ে নিন। মারিয়া দু' একবার দম নিয়ে ওষুধটা খেল। হ্যারি সাবধানে মারিয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিল। এবার জ্বর কমে কিনা তার জন্য প্রতীক্ষা করা।

সন্ধ্যে হল। রাত বাড়তে লাগল। ভেন মাঝে মাঝেই মারিয়ার গলায় কপালে হাত দিয়ে জ্বর বাড়ছে না কমছে তা দেখতে লাগল।

একসময় ভেন হ্যারিকে বলল—আমি এখানে আছি। তোমরা গিয়ে খেয়ে এসো। হ্যারিরা খেতে গেল। কিন্তু কেউই বেশি খেতে পারল না।

ওরা কেবিনঘরে ফিরে এল।

হ্যারিরা মেঝেয় বসে রইল। কারো চোখেই ঘুম নেই।

শেষ রাতের দিকে মারিয়ার শরীর আরো খারাপ হল। জ্বর এত বাড়ল যে মারিয়া অজ্ঞান হয়ে গেল।

ভেন মারিয়ার চোখ দেখল। কপালে গলায় হাত দিয়ে দেখল। পা ও হাত চেপে দেখল। মৃদুগলায় ডাকল—হ্যারি। হ্যারির একটু তন্দ্রামত এসেছিল। ডাক কানে যেতেই ও দ্রুত ভেন-এর কাছে এল। ভেন বলল—হ্যারি আমার জ্ঞান বুদ্ধিমত চিকিৎসা আমি করেছি। আমার আর কিছু করার নেই। এখন কেরিনিয়া নগরে ভালো বৈদ্যের খোঁজ কর। তাঁকে দেখাও। এছাড়া আর কিছু করার নেই।

ভোরবেলা। মারিয়ার জ্বর একটু কমল। কষ্টও একটু কমল।

হ্যারি বিস্কোকে ডেকে বলল—চলো—ভালো বৈদ্যের খোঁজে কেরিনিয়া নগরে আমাদের যেতে হবে।

—কিন্তু বৈদ্যের খোঁজ পাবে কী করে? বিস্কো বলল।

—দেখি। যে ভদ্রলোকের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম তাঁকেই জিজ্ঞেস করবো। চলো। হ্যারি বলল।

ওরা দু'জন জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। হ্যারি দেখল—এখানে ওখানে ভাইকিং বন্ধুরা দল বেঁধে বসে আছে। গতরাত্তে কেউই বোধহয় ঘুমোয় নি।

দু-একজন ভাইকিং বন্ধু হ্যারির কাছে এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি রাজকুমারী এখন কেমন আছেন?

—ভালো না—আমরা ভালো বৈদ্যের সন্ধানে যাচ্ছি।

হ্যারি আর বিস্কো জাহাজ থেকে নেমে এল। মারিয়ার শিয়রের কাছে ভেন বসে রইল। মেঝেয় বসে রইল শাঙ্কো। ভাইকিং বন্ধুরা মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাচ্ছে। মারিয়া তখন জ্বরে অজ্ঞান।

হ্যারি আর বিস্কো অ্যান্তিকোর সামনে এল। পেতলের কড়াটা দরজায় ঠুকে শব্দ করল। দরজা খুলে গেল।

অ্যান্তিকো দাঁড়িয়ে। বললেন কী ব্যাপার? হ্যারি বলল—আমাদের দেশের রাজকুমারী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্যে একজন ভালো বৈদ্যের খোঁজ দিতে পারেন?

—আমি পেশায় বৈদ্য। তোমরা রাজকুমারীকে নিয়ে এসো। আমিই চিকিৎসা করবো। কোন ভয় নেই। অ্যান্তিকো বললেন।

হ্যারি আর বিস্কো দু'জনেই নিশ্চিন্ত হল। খুশিও হল।

ওরা অ্যান্তিকোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। হ্যারি বলল—বিস্কো একটা কৃষকদের শস্যটানা গাড়ি জোগাড় করতে হবে।

দু'জনে বাজার এলাকায় এল। খুঁজে খুঁজে একটা গাড়ি পেল। ভাড়া করল গাড়িটা। গাড়িতে চেপে দু'জনে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠল। কেবিনঘরে ঢুকে দেখল ভেন বসে আছে। ভেন বলল—বৈদ্যের খোঁজ পেলে?

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল রাজকুমারীকে নিয়ে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ—তবে সাবধানে গাড়ি করে নিয়ে যাবে। ভেন বলল।

—আমরা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। হ্যারি বলল।

তখন বেলা হয়েছে। হ্যারি মারিয়ার মুখের কাছে মুখ এনে বলল—রাজকুমারী ভালো চিকিৎসার জন্যে আপনাকে নিয়ে যাবো। গাড়িতে করে। একটু কষ্ট হবে। সহ্য করবেন।

বিস্কো বিছানার কাছে গেল। মারিয়ার পিঠে বাঁ হাতটা রাখল। ডান হাত পায়ের নিচে দিয়ে আস্তে আস্তে মারিয়াকে তুলে পাঁজাকোলা করল। আস্তে আস্তে কেবিনঘরের বাইরে নিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে ডেক-এ উঠে এল। পেছনে হ্যারি।

মারিয়ার দুই চোখ সোজা। এবার মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। মারিয়ার এই কষ্ট দেখে বিস্কোও সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু মারিয়াকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্যে মারিয়াকে তো এই কষ্ট মেনে নিতেই হবে।

বিস্কো মারিয়াকে নিয়ে জাহাজ থেকে জাহাজঘাটায় পেতে রাখা কাঠের তক্তায় উঠল। একজনের যাওয়ার জন্যে তক্তা। বিস্কো সাবধানে মারিয়াকে নিয়ে তক্তায় উঠল। তারপর পা টিপ টিপ করে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। তক্তা শেষ।

বিস্কো জাহাজঘাটায় নামল। বিস্কোর আগেই হ্যারি একটা বড় মোটা কাপড় আর বালিশমত নিয়ে এসেছিল। সেসব ঐ গাড়িতে আগেই পেতে রেখেছিল হ্যারি।

বিস্কোকে এত সন্তর্পণে মারিয়াকে আনতে হল যে বিস্কোর দু'হাত ধরে এল। হাত দুটোয় ব্যথা করতে লাগল।

বিস্কো মারিয়াকে আস্তে আস্তে গাড়ির মধ্যে পাতা কাপড়ে শুইয়ে দিল। বালিশমত পুঁটুলিটা মাথার নিচে দিল। মারিয়ার তখনও চোখ বোঁজা। গোঙানিটা কমেছে।

হ্যারি আর বিস্কো গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ির চালককে গাড়ি চালাতে বলল। ঘর্ ঘর্ শব্দ তুলে এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি চলতে শুরু করল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মারিয়ার কষ্ট বাড়ল। মুখ থেকে জোরে গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। হ্যারি চালককে বলল—এমনভাবে গাড়ি চালাও যাতে ঝাঁকুনি কম হয়। চালক এবার আস্তে আস্তে চালাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি অ্যান্তিকোর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হ্যারি গাড়ি থেকে নেমে দরজার পেতলের কড়াটা দরজায় ঠুকল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন অ্যান্তিকোর স্ত্রী। বললেন—তোমরা রোগীকে এনেছো?

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। ভদ্রমহিলা বললেন।

এবার হ্যারি আর বিস্কো দু'জনেই মারিয়াকে তুলে আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে নিয়ে এল। ঘরে লম্বা তক্তপোষমত পাতা। ওপরে বিছানা পাতা। দু'জনে মারিয়াকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিয়ে হ্যারি বাইরে এল। চালকের দাম মেটাল। মোটা কাপড় আর বালিশ গাড়ি থেকে নিয়ে এল। মারিয়ার মাথার নিচে বালিশটা দিয়ে দিল হ্যারি। মোটা কাপড়টা একপাশে রাখল।

দু'জনে ঐ বিছানায় বসল। একটু পরেই অ্যান্তিকো এলেন। খুব মনোযোগ দিয়ে মারিয়াকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপব পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে মৃদুস্বরে কিছু বললেন। স্ত্রী বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চিনেমাটির ছোট বোয়াম নিয়ে এলেন। অ্যান্তিকো বোয়ামের মুখ খুলে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কালো রঙের আঠামত ওষুধ বের করলেন। মারিয়ার মুখ একটু খুলে ওষুধটা মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। মারিয়ার চোখ মুখ কুঁচকে গেল। বোঝা গেল ওষুধটা তেতো। তবে মারিয়া ওষুধটা ফেলে দিল না। আস্তে আস্তে খেয়ে নিল।

অ্যান্তিকো বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আজকের রাতটা কাটলেই উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হবেন। এখন আপনারা চলে যেতে পারেন। হ্যারি বলল—আমরা দুপুরে একবার খেতে যাবো। তারপর দুপুরের পর থেকে সারারাত এখানেই থাকবো।

—বেশ। তাহলে ভালোই হয়। রোগীকে রাতে দু'বার দুটো ওষুধ খাওয়াতে

৮

হবে। আপনারা থাকলে ওষুধ দুটো আপনারাই খাওয়াতে পারবেন। অ্যান্তিকো বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। বোয়ামটা নিয়ে অ্যান্তিকোর স্ত্রী ভেতরে চলে গেলেন।

হ্যারি আর বিস্কো বিছানার একপাশে বসে রইল।

দুশ্চিন্তায় গত রাতটা ওরা দু'চোখের পাতা এক করেনি। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। রাত জাগার ক্লান্তিতে হ্যারির মাথা টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। নিজেকে বেশ দুর্বল মনে হতে লাগল। বিস্কো বুঝল সেটা। ও বলল—হ্যারি তুমি একপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নাও। আমি তো জেগে আছি। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল—না। বিস্কো ধমকের সুরে বলল—পাগলামি করো না। তুমি যে শরীরের দিক থেকে খুব দুর্বল সেটা আমরা জানি। এবার তোমার কিছু হলে আমাদের বিপদই বাড়বে। কথা শোন—ঘুমিয়ে নাও। দুপুরে খেতে যাবার সময় তোমাকে ডেকে নেব। হ্যারি বুঝল—না ঘুমলে শরীরের দুর্বলতা যাবে না। হ্যারি বিছানার একপাশে শুয়ে পড়ল। চোখ দুটো জ্বালা করছে। মাথাটাও টিপ্‌টিপ্ করছে। দেখা যাক—শরীরের এই অবস্থায় ঘুম আসে কি না।

একটু পরেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে বিস্কো হ্যারির ঘুম ভাঙাল। হ্যারি উঠে বসল। চোখ কচলাল। তারপর মারিয়ার কপালে হাত রাখল গলায় হাত রাখল। জ্বর অনেক কমে গেছে। খুশির চোখে বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—বিস্কো জ্বর অনেক কমে গেছে। তখনই দেখল—মারিয়ার চোখ খোলা। ওর দিকে তাকিয়ে মারিয়া দুর্বল স্বরে বলল—আমার জন্যে তোমাদের ভোগান্তির শেষ নেই।

হ্যারি বলে উঠল—ওসব নিয়ে ভাববেন না। আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হোন। তারপরে এসব কথা ভাববেন। বিস্কো বলল—রাজকুমারী—আমরা এখন খেতে যাচ্ছি। কতটা খেতে পারবো জানি না। তবু আমাদের তো সুস্থ থাকতে হবে।

দু'জনে এবার চলল জাহাজঘাটার দিকে। জাহাজে উঠতেই বন্ধুরা ছুটে এল। হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—রাজকুমারীর জ্বর কমেছে। এখন অনেকটা ভালো আছেন। সবাই আনন্দের ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

খাওয়া দাওয়া সেরে হ্যারি আর বিস্কো আবার অ্যান্তিকোর বাড়িতে ফিরে এল। রাজকুমারী বেশ দুর্বলস্বরে আস্তে আস্তে বলল—অ্যান্তিকোর স্ত্রী মায়ের মত আমাকে দুপুরে ফলের রস খাইয়েছেন। ওষুধও খাইয়েছেন। হ্যারি বিস্কো শুনে আশ্বস্ত হল।

ওদিকে কয়েদঘরের পেছনে থেকে আল জাহিরির যে সৈন্যটা মারিয়ার দিকে নজর রাখছিল সে সবই দেখল। অসুস্থ মারিয়াকে গাড়িতে তোলা হল। গাড়িতে দু'জন ভাইকিং চলল। গাড়িটা যেহেতু খুব জোরে যাচ্ছিল না সৈন্যটি একটু জোরে হেঁটে গাড়ির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলল।

অ্যান্তিকোর বাড়িতে ঢোকা এসবই সৈন্যটি দেখল। তারপর পিছু ফিরে ও

চলল জেলেপাড়ার দিকে। সমুদ্রতীরে এসে একটা জেলেনৌকোয় চড়ে ও জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজে উঠে চলল আল জাহিরির কেবিনঘরের দিকে। আল জাহিরিকে ও সব বলল। আল জাহিরি তখন সৈন্যটিকে বলল—তুই আবার যা। শুধু লক্ষ্য রাখবি কখন ভাইকিং দু'জন নিজেদের জাহাজে খেতে যায়। ঐ সময় রাজকুমারী একা থাকবে। সেই সুযোগটাই তখন কাজে লাগাতে হবে। তুই সেই সময়ে আসবি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সৈন্যটি এবার চলল নৌকোয় চড়ে তীরের দিকে।

অ্যান্তিকোর বাড়ির সামনে গিয়ে সৈন্যটি দাঁড়াল। নজর রাখল কখন ভাইকিং দু'জন বেরোয়।

হ্যারি গভীর রাতে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। বিস্কো একটানা জেগে রইল। অ্যান্তিকোর নির্দেশমত মারিয়াকে ওষুধ খাওয়াল।

পরদিন সকালে মারিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করল। অ্যান্তিকোর স্ত্রী মারিয়াকে ওষুধ খাইয়ে গেলেন।

কিছু পরে অ্যান্তিকো এলেন। মারিয়াকে পরীক্ষা করে দেখে হ্যারিকে বললেন—আপনাদের রাজকুমারীর বিপদ কেটে গেছে। উনি এবার আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। হ্যারি আর বিস্কো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসল।

মারিয়া আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল। হ্যারিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তখনও দুর্বলতা কাটেনি।

একটু বেলায় হ্যারি আর বিস্কো খেতে চলল। ওরা রাস্তা ধরে কিছুটা যেতেই নজরদার সৈন্যটি বাজার এলাকা থেকে একটা শস্যটানা গাড়ি ভাড়া করে দ্রুত গিয়ে জেলেপাড়ায় উঠল। আল জাহিরিকে বলল—পাহারাদার দু'জন ভাইকিংই ওদের জাহাজে খেতে চলে গেছে।

আল জাহিরি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল—চারজন আমার সঙ্গে চল। যে নৌকোয় পাহারাদার এসেছিল সেই নৌকোয় চড়ে সবাই তীরে এল। যে গাড়িটায় পাহারাদার এসেছিল সেই গাড়িতে চড়ে ওরা দ্রুত চলল অ্যান্তিকোর বাড়ির দিকে।

অ্যান্তিকোর বাড়িতে পৌঁছে দরজায় পেতলের কড়া দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন অ্যান্তিকোর স্ত্রী। আল জাহিরি তাঁকে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল। চলল বাইরের ঘরের দিকে। অ্যান্তিকোর স্ত্রী বললেন—আপনারা কারা? কী চান? আল জাহিরি হেসে বলল—আমরা আমাদের রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কিন্তু রাজকুমারী এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। অ্যান্তিকোর স্ত্রী বললেন।

—জাহাজে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব। আল জাহিরি বলল।

সৈন্য নিয়ে আল জাহিরি বাইরের ঘরে ঢুকল। দেখল মারিয়া বিছানায় শুয়ে আছে। আল জাহিরিকে দেখে মারিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় উঠে বসল। বলল কী চাই তোমাদের? আল জাহিরি হেসে বলল—কোন কথা নয়। আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। যদি যেতে না চান চিৎকার চ্যাঁচামেচি করেন তাহলে বুকে তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব। একটু থেমে বলল—উঠে বসুন।

—আমি যাবো না। বেশ চড়া গলায় মারিয়া বলল। আল জাহিরি বলল—চ্যাঁচাতে মানা করেছি। দু'জন সৈন্যকে বলল—যা ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোল।

দু'জন সৈন্য মারিয়ার দু'হাত ধরে দাঁড় করাল। আল জাহিরি তরোয়াল বের করল। তরোয়ালের ডগা মারিয়ার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—আর একটা কথা বলেছেন কি তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব। মারিয়া বুঝল এখন ওকে বাঁচাবার কেউ নেই। অ্যান্তিকো বা তাঁর স্ত্রী কিছুই করতে পারবেন না। মারিয়া চুপ করে রইল। আল জাহিরি পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়াল। বলল—চলুন।

মারিয়া দুর্বল পায়ে হেঁটে চলল বাইরের দরজার দিকে। অ্যান্তিকো আর তাঁর স্ত্রী দু'জনে ছুটে এলেন। অ্যান্তিকো বললেন—আপনারা কারা? আল জাহিরি বলল—আমরা ভাইকিং। আমাদের রাজকুমারীকে জাহাজে নিয়ে যাচ্ছি। মারিয়া বলে উঠল—মিথ্যে কথা। অ্যান্তিকো বললেন—এই তো রাজকুমারী বলছেন আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আল জাহিরি রাগতস্বরে বলে উঠল—সত্য মিথ্যে জানি না। আমরা রাজকুমারীকে নিয়ে যাবোই। বাধা দিতে এলে আপনারা দু'জনই খতম হয়ে যাবেন।

—কিন্তু রাজকুমারীর অসুখ এখনও সম্পূর্ণ সারেনি। অ্যান্তিকো বললেন।

—আমাদের জাহাজের বৈদ্য চিকিৎসা করবে। তাতেই ভালো হয়ে যাবে। আল জাহিরি বলল।

মারিয়াকে নিয়ে আল জাহিরি বাড়ির বাইরে এল। মারিয়াকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল। সঙ্গের সৈন্যরাও গাড়িতে উঠল। আল জাহিরি গাড়িতে উঠে হুকুম দিল—জেলেপাড়ায় চল্—জল্দি।

গাড়ি চলল। দুপুর নাগাদ গাড়ি সমুদ্রতীরে জেলেপাড়ায় পৌঁছল। আল জাহিরি নিশ্চিন্ত হল যে পাহারাদার ভাইকিং দু'জন ফেরার আগেই রাজকুমারীকে নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

মারিয়াকে ধরে ধরে নৌকোয় তোলা হল। সবাই নৌকোয় উঠলে নৌকো বেয়ে চলল একজন সৈন্য। মারিয়া একবার ভাবল যে চ্যাঁচামেচি করে লোকজন জড়ো করে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হবে না। কেউ ওকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। বরং তাতে আল জাহিরি ক্রুদ্ধ হবে। এরা যা নৃশংস। হয়তো তাকে মেরেও ফেলতে পারে। মারিয়া চুপ করে নৌকোয় বসে রইল।

নৌকো গিয়ে জাহাজে লাগল। হালের দিকে ঝোলা দড়ি ধরে দড়ির মই বেয়ে সবাই জাহাজে উঠে গেল। একজন সৈন্য নৌকোয় রইল। জাহাজ থেকে দড়ির জাল ফেলা হল। সেই সৈন্যটি মারিয়াকে দড়ির জালে ধরে ধরে বসিয়ে দিল। জাহাজ থেকে দড়ির জাল টেনে তোলা হল। মারিয়া ডেক-এ নামতেই আল জাহিরি বলল—রাজকুমারীকে আমার পাশের কেবিনঘরে নিয়ে যা আর বৈদ্যকে বল রাজকুমারীকে চিকিৎসা করতে।

মারিয়াকে দু'জন সৈন্য ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামাল। নির্দিষ্ট কেবিনঘরে ঢুকিয়ে দিল। দুর্বল শরীর নিয়ে মারিয়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এলোমেলো বিছানাটায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে গোঁফ দাড়িওয়ালা জাহাজের বৈদ্য এল। মারিয়াকে পরীক্ষা করল। হেসে বলল—কিছ্ছু চিন্তা নেই ভালো হয়ে যাবেন। কথাটা গ্রীক ভাষায় বলল। মারিয়া কিছুই বুঝল না। বৈদ্যকে হাসতে দেখে বুঝল ও অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

যখন মারিয়াকে গাড়ি থেকে নৌকোয় তোলা হচ্ছিল তখন জেলেরা ভীড় করে দেখছিল। ওরা বুঝতে পারছিল না এই একেবারে অন্যরকম পোশাক পরা মেয়েটি কোন্ দেশের? মারিয়াকে নিয়ে নৌকোটা চলল জাহাজের দিকে। তখনও জেলেরা জটলা করে নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কথা বলছিল। তারপর ভীড় ভেঙে গেল। যে যার কাজে চলে গেল।

ওদিকে হ্যারি আর বিস্কো জাহাজে খাওয়া দাওয়া সেরে অ্যান্তিকোর বাড়িতে এল। দরজার কড়া ঠুকে শব্দ করতে অ্যান্তিকোর স্ত্রী দরজা খুললেন। হ্যারিদের দেখে বললেন—কী ব্যাপার বলো তো। একটা লোক কয়েকজন সৈন্য নিয়ে এসেছিল। বলল যে ওরা ভাইকিং। ওরা জোর করে রাজকুমারীকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে।

হ্যারি আর বিস্কো পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বলল, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে ওরা।

ততক্ষণে অ্যান্তিকোও এল। স্ত্রী যা বলেছেন উনিও তাই বললেন। হ্যারি তখনও ভাবছে এভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে গেল কারা?

হ্যারি বলল—আচ্ছা দলনেতা লোকটা দেখতে কেমন? অ্যান্তিকো বললেন—লোকটার গায়ের রং ফর্সা। মুখের চিবুকে অল্প দাড়ি। গোঁফ আছে। মাথায় কালো বিড়ের মত পাগড়ি। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এ আল জাহিরি।

—কিন্তু আল জাহিরিকে তো শাঙ্কো ওর জাহাজের কয়েদখানায় বন্দী করে রেখে এসেছিল। বিস্কো বলল।

—ওর পাহারাদার কিছু সৈন্য আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় পালিয়েছিল। তারাই একত্র হয়ে আল জাহিরিকে তাদের জাহাজের কয়েদঘর থেকে মুক্ত করেছে।

হ্যারি বলল।

—তাহলে তো আবার ওরা ওদের জাহাজে গিয়ে জড়ো হয়েছে। বিস্কো বলল।

—ঠিক তাই—হ্যারি বলল—এবার ঐ জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে।

—একটা কথা মনে হচ্ছে—বিস্কো বলল—রাজকুমারীকে যখন বন্দী করে নিয়ে গেছে তখন জাহাজটা ঘাটের কাছেই কোথাও আছে। বিস্কো বলল।

—আল জাহিরি রাজকুমারীকে বন্দী করেছে এইজন্যে যে ক্রীতদাস বিক্রির হাটে রাজকুমারীকে অনেক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবে। হ্যারি বলল।

—তাহলে তো এক্ষুণি সেই জাহাজটা কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ এক্ষুণি। নইলে আল জাহিরি রাজকুমারীকে নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে যাবে। হ্যারি বলল।

ওরা দু'জনে অ্যান্তিকো আর তাঁর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে জাহাজঘাটার দিকে চলল।

দু'জনে জাহাজে উঠতেই সব ভাইকিং বন্ধুরা এগিয়ে এল। ওরা জানতে চায় রাজকুমারী কেমন আছেন। এবার হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—রাজকুমারী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আল জাহিরি রাজকুমারীকে বন্দী করে তার জাহাজে নিয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এবার সমুদ্রতীরে ছড়িয়ে পড়তে হবে। আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা খুঁজে বের করতে হবে। তারপরে প্রয়োজনে লড়াই করে রাজকুমারীকে মুক্ত করতে হবে। হ্যারির কথা শেষ হতেই সবাই সমুদ্রতীরে নেমে এল। ছড়িয়ে পড়ে আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা খুঁজতে লাগল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে পেড্রোকে ডাকল। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে দড়ি ধরে নেমে এল। হ্যারি বলল—পেড্রো—আল জাহিরির ক্যারাভেলটা দেখেছো। পেড্রো মাথা নেড়ে বলল—না। তবে বাঁ দিকে দূরে সমুদ্রতীরটা বাঁক নিয়েছে। ঐ বাঁকে যদি কোন জাহাজ থাকে তবে আমি দেখতে পাবো না। হ্যারি বলল—আমরা সমুদ্রতীর ধরে অনেকটা যাবো। বিশেষ করে দূরে যে সমুদ্রের বাঁকটা আছে সেখানে যাবো। কারণ এখান থেকে বাঁকের জন্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হ্যারি আর বিস্কো সমুদ্রতীর ধরে চলল। যেতে যেতে জেলেপাড়া পার হয়ে এল। এখান থেকেই শুরু হয়েছে বাঁকটা। বাঁকটা ছাড়াতেই একটু দূরে দেখল আল জাহিরির ক্যারাভেল জাহাজটা নোঙর করা।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দু' তিনটে নারকোল গাছের আড়ালে দাঁড়াল। আড়াল থেকে ওরা দেখল আল জাহিরির চার পাঁচজন সৈন্য জাহাজের ডেক-এ শুয়ে বসে আছে। হ্যারি বলল—রাজকুমারীকে নিশ্চয়ই এই জাহাজে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

—আমারও তাই মনে হয়। বিস্কো বলল। তারপর বলল—এখন কী করবে? হ্যারি বলল—

—আল জাহিরির জাহাজে কত সৈন্য রয়েছে আমরা সেটা সঠিক জানি না। শুধু তুমি আর আমি তিন চারজন সৈন্যের সঙ্গে লড়তে পারি। তার বেশি হলে পারবো না। আমরা দু'জন যদি এখন আক্রমণ করি তাহলে আল জাহিরি জেনে যাবে যে আমরা ওর জাহাজ খুঁজে পেয়েছি। তখন আল জাহিরি সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীকে নিয়ে জাহাজ চালিয়ে পালিয়ে যাবে। কাজেই আজ রাতে সবাই মিলে আক্রমণ করতে হবে। হ্যারি বলল।

—যদি রাজকুমারীকে এই জাহাজে না পাওয়া যায়? বিস্কো বলল। হ্যারি বলল—তখন আল জাহিরিকে বন্দী করে রাজকুমারীকে কোথায় বন্দী করে রেখেছে সেটা জানতে হবে। এখন জাহাজে ফিরে চলো। জাহাজে ফিরে হ্যারি সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব, আল জাহিরির জাহাজ আমরা খুঁজে পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল জাহিরির ক্যারাভেলেই রাজকুমারীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আর দেরি করা চলবে না। আজ রাতেই আমরা আল জাহিরির জাহাজ আক্রমণ করবো। সবাই রাতের খাওয়া তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরি থাকবে।

রাতের খাওয়াটা সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

তিনচারজন মিলে নোঙর খুলে দিল। হ্যারির নির্দেশে জাহাজ চলল ঐ বাঁকের দিকে। চাঁদের আলো বেশ উজ্জ্বল। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সমুদ্র, সমুদ্রতীর দেখা যাচ্ছে।

বাঁকের কাছে এসে হ্যারিরা আল জাহিরির ক্যারাভেল দেখতে পেল না। হ্যারি আর বিস্কো যেখানে জাহাজটা দেখে গিয়েছিল সেখানে জাহাজটা নেই।

তখনই মাস্তুলের ওপর থেকে নজরদার পেড্রো চিৎকার করে বলল—হ্যারি—আল জাহিরি ক্যারাভেল জাহাজ চালিয়ে পালাচ্ছে। এখনও বেশিদূর যেতে পারে নি। পিছু ধাওয়া করো। হ্যারিরা মনোযোগ দিয়ে দেখল সত্যিই ক্যারাভেলটা দ্রুত চলেছে। একটু আগে কুয়াশার জন্যে ক্যারাভেলটা ওরা দেখতে পায় নি। কুয়াশা কেটে যেতেই ক্যারাভেলটা দেখল। এবার গতি চাই। ক্যারাভেলটা ধরতে হবে। হ্যারি চিৎকার করে বলল—ভাইসব—পশ্চিম দিকে দেখো ক্যারাভেলটা পালাচ্ছে। যে করেই হোক ঐ ক্যাবাভেলটাকে ধরতে হবে। একদল পাল খাটাতে উঠে যাও। সবগুলো পাল খুলে দাও। আর একদল চলে যাও দাঁড় টানতে। জাহাজের গতি বাড়াও। ঐ ক্যারাভেলটা ধরতেই হবে।

একদল দড়ি ধরে উঠলো পালগুলোর কাছে। সব পাল খুলে দিল। জোরে হাওয়া বইছে তখন। পালগুলো সব ফুলে উঠল। আর একদল দাঁড়ঘরে গেল। জলে দাঁড় পড়তে লাগল—ছপ্‌ছপ্‌। জাহাজের গতি অনেক বেড়ে গেল। কয়েকজন ভাইকিং এদিক ওদিক পাল ঘুরিয়ে পালে যাতে বেশি বাতাস লাগে তার ব্যবস্থা

করল। দাঁড়ঘরে দাঁড়িরাও প্রাণপাণে দাঁড় বাইতে লাগল। ক্যারাভেলের সঙ্গে হ্যারিদের জাহাজের দূরত্ব কমে আসতে লাগল। সমুদ্রের বুকে কোথাও কোথাও কুয়াশা জমেছে। মাঝে মাঝেই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ক্যারাভেলটা। হ্যারি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যারাভেল জাহাজটার দিকে। চাঁদের আলোয় দেখে বুঝল ক্যারাভেল থেকে ওদের জাহাজটা বেশি গতিতে চলছে।

ফ্রান্সিসদের জাহাজটা যেন জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ক্যারাভেলের কাছে চলে এল হ্যারিদের জাহাজটা। হ্যারি গলা চড়িয়ে জাহাজচালক ফ্রেজারকে বলল—ক্যারাভেল জাহাজের গায়ে গায়ে লাগাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যারিদের জাহাজটা ক্যারাভেল জাহাজের গায়ে লাগল। হ্যারি দেখল আল জাহিরির ক্যারাভেলের ডেক-এ পনেরোজন সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—তোমাদের চেয়ে আমরা সংখ্যায় বেশি। একবার লড়াইয়ে নামলে তোমরা কেউ বাঁচবে না। আল জাহিরির জন্যে তোমরা কেন মরতে যাবে। তোমরা অস্ত্র ত্যাগ করো। আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। সৈন্যরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ করল না।

তখনই ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে এল আল জাহিরি। সৈন্যদের ধমক দিয়ে বলল—এভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন—ওদের আক্রমণ কর্।

কিন্তু সৈন্যরা কেউ নড়ল না। হ্যারি বলে উঠল—আল জাহিরি তোমাদের জাহাজে আমাদের রাজকুমারীকে বন্দী করে রেখেছে।

—তোমাদের রাজকুমারীকে আমি বন্দী করে রাখিনি। আল জাহিরি গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। রাজকুমারীকে তোমাদের জাহাজেই বন্দী করে রেখেছো।

—বললাম তো রাজকুমারীকে আমরা বন্দী করে রাখিনি। আল জাহিরি বলল। হ্যারি বলল—আবার বলছি মিথ্যে কথা বলো না। রাজকুমারী তোমাদের জাহাজেই বন্দী আছেন। রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে আসতে দাও। রাজকুমারী মুক্ত হলে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। আমরা আমাদের জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো।

—রাজকুমারী কেরিনিয়ার কয়েদখানায় রয়েছে। আল জাহিরি বলল।

—মিথ্যে কথা। তোমাকে আর তোমার সৈন্যদের বেঁচে থাকার সুযোগ দিয়েছিলাম। সেই সুযোগ কাজে লাগালে না। এবার মরার জন্যে তৈরি হও। হ্যারি বলল। তারপর গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—সবাই অস্ত্র হাতে নাও। এবার লড়াই। ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। তারপর সবাই

সিঁড়ি দিয়ে নেমে অস্ত্রঘর থেকে অস্ত্র নিয়ে এল। প্রথমবারে আটদশ জন লাফিয়ে ক্যারাভেলের ডেক-এ উঠে এল। শুরু হল আল জাহিরির সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই। আবার একদল ভাইকিং লাফিয়ে ক্যারাভেল-এ উঠল। তারাও লড়াই শুরু করল। আবার একদল গিয়ে লাফিয়ে ক্যারাভেল-এ উঠল। আল জাহিরির সৈন্যরা হার স্বীকার করতে লাগল।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, কাউকে হত্যা করো না। আহত কর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আল জাহিরির সৈন্যরা আহত হয়ে ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল।

তখনই আল জাহিরি নিচের কেবিনঘর থেকে মারিয়াকে নিয়ে ডেক-এর ওপর উঠে এল। হাতের তরোয়ালটা মারিয়ার পিঠে ঠেকিয়ে বলল—তোমরা এক্ষুণি আমার জাহাজ ছেড়ে চলে যাও। যদি না যাও রাজকুমারীর পিঠে আমি তরোয়াল ঢুকিয়ে দেব।

হ্যারি বুঝল—এই নরপশুটা এখন রাজকুমারীকে যে কোন মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারে। হ্যারি চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব—সবাই আমাদের জাহাজে চলে এসো। আর লড়াই নয়।

ভাইকিংরা রাজকুমারীর বিপদ ভালো করেই বুঝল। সবাই লাফিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল।

হ্যারি ইশারায় শাঙ্কোকে কাছে ডাকল। মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল—আল জাহিরি—তীরের নিশানা। শাঙ্কো কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তারপর দ্রুত পায়ে অস্ত্রঘরে এল। তীর ধনুক নিল। নিজের কেবিনে এসে বিছানায় পাতা মোটা কাপড়টাকে গায়ে জড়াল। তীর ধনুক ঢাকা পড়ে গেল। শাঙ্কো সিঁড়ি বেয়ে উঠে ডেক-এ এল। তারপর আস্তে আস্তে মাস্তুলের পেছনে চলে এল। তারপর গা থেকে কাপড় খুলে ফেলল। ডেক-এ হাঁটু গেড়ে বসে মাস্তুলের আড়াল থেকে ধনুক তুলল। তীর পরিয়ে মাস্তুলের পাশে সরে এল। আল জাহিরিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আল জাহিরি তখন তরোয়ালের ডগাটা মারিয়ার গলায় চেপে ধরে বলে উঠল—একটু সময় দাও। আমরা এক্ষুণি জাহাজ চালিয়ে চলে যাবো। আল জাহিরি নিশ্চিন্ত হল।

শাঙ্কো তীর নিশানা করল। তারপর তীর ছুঁড়ল। নিখুঁত নিশানা। তীর গিয়ে লাগল আল জাহিরির ডান বাহুতে। ঐ হাতেই আল জাহিরি তরোয়াল ধরেছিল। আল জাহিরি আর্ত চিৎকার করে উঠল। তারপরই হাতের তরোয়াল ফেলে বাহু বাঁ হাতে চেপে ধরল। তারপর টেনে তীরটা খুলল। গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরিয়ে এল। আল জাহিরি ডেক-এ বসে পড়ল।

হ্যারি চিৎকার করে বলল—রাজকুমারী চলে আসুন। মারিয়া দ্রুত ছুটে এল হ্যারিদের জাহাজের দিকে। বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে গিয়ে মারিয়াকে

ধরে ওদের জাহাজে নিয়ে এল। মারিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ডেক-এর ওপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল। একে দুর্বল শরীর তারসঙ্গে মৃত্যুভীতি—মারিয়া এসব সহ্য করতে পারল না।

হ্যারি ডাকল—ভেন—রাজকুমারীকে দেখ। বৈদ্য ভেন এগিয়ে এল। বসে রাজকুমারীর নাড়ি দেখল। চোখ টেনে দেখল। বলল—ভয়ের কিছুই নেই। শুধু ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কেবিনঘরে নিয়ে চলো।

মারিয়াকে কেবিনঘরে ধরাধরি করে আনা হল। ভেনও নিজের কেবিনঘর থেকে ওষুধ নিয়ে এল।

হ্যারিদের জাহাজ ফিরে চলল কেরিনিয়া বন্দরের দিকে

ওদিকে ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে চড়ে এক সন্ধ্যায় নিকোশিয়ায় পৌঁছল। রাজধানী নিকোশিয়া বেশ বড় শহর। গরীব লোকজন আছে, তেমনি ঝলমলে পোশাক পরা অভিজাত ধনীশ্রেণীর মানুষরাও আছে। নতুন শহর। সাজানোগুছানো সুন্দর শহর। কত লোক। কিন্তু ফ্রান্সিসের সেসব দিকে চোখ নেই। পারিসি বলল, রাজধানী শহর—আপনি তো আগে দেখেননি। চলুন ঘুরে ঘুরে দেখবেন। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। বলল, বন্ধুরা, মারিয়া—সবাই ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হবে। আমার এখন এক চিন্তা কী করে সবাইকে মুক্ত করবো। অন্য কোনোদিকে তাকাবার অবকাশ নেই আমার। এবার পারিসি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝলো। কোনো কথা বলল না।

সেই রাতটা ওরা একটা সরাইখানায় কাটালো। সকালে ফ্রান্সিস বলল, গী দ্য লুসিগনানের বিচারসভা কখন বসে?

একটু বেলায়। পারিসি বলল।

তাহলে সকালের খাবার খেয়ে চলো বিচারসভায় যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলায় রাজার বিচারসভায় দু'জনে পৌঁছল। তখন বিচারের কাজ চলছিল। কাঠের জমকালো সিংহাসনের সবুজ কাপড়ে মোড়া আসনে গী দ্য লুসিগনান বসে ছিল। একটা বিচারের কী রায় দিল লুসিগনান। বাচ্চাকোলে এক মা হাসতে হাসতে চলে গেল। পেছনে পেছনে গেল তার স্বামীই বোধহয়।

সেনাপতি খুবই ধূর্ত। পারিসি তার নজরে পড়ল। সেনাপতি আসন থেকে উঠে লুসিগনানকে কী বলল। তারপর আঙুল তুলে পারিসিকে দেখিয়ে দ্বাররক্ষীদের হুকুম দিল পারিসিকে বন্দী করার জন্য। দ্বাররক্ষীরা ছুটে এসে পারিসিকে ধরতে গেল। ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে ওদের থামতে বলল। দ্বাররক্ষীরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল, তুমি লুসিগনানকে বুঝিয়ে বলো যে আমি ভাইকিং, বিদেশী, বিশেষ একটা প্রয়োজনে রাজার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে

যা বলার রাজা লুসিগনান যেন স্পেনীয় ভাষায় বলে। আমি গ্রীক জানি না। এবার পারিসি ফ্রান্সিসের শেখানো কথাগুলো পর পর বলে গেল। সব শুনে গী দ্য লুসিগনান ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। স্পেনীয় ভাষায় বলল, তুমি এই সাইপ্রাস দ্বীপে এসেছো কেন?

সে অনেক কথা। শুধু এইটুকু বলি আল্‌ জাহিরি আমাদের জাহাজ দখল করে এখানে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। আমাদের সকলকে সে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবে বলে এনেছে। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, কেরিনিয়া বন্দরের কাছে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসে। যারা কেনাবেচা করে সেই ব্যবসায়ীরা আমার অনুমতির জন্য আমাদের প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা দেয়। তুমি একা কী করে এলে? লুসিগনান বলল।

পালিয়ে এসেছি। আমার একটা আর্জি আপনাকে জানাতে এসেছি। ফ্রান্সিস বলল।

কী আর্জি? লুসিগনান বলল।

পারিসির কাছে দেবতুল্য একজন মানুষ নিওফিতসের কথা শুনেছি। নিওফিতস খ্রীস্টান সমাজ পরিচালনার রীতি পদ্ধতি যে গ্রন্থটিতে লিখে রেখেছিলেন, সেই গ্রন্থ পারিসি আপনাদের দিয়েছে।

হ্যাঁ দিয়েছে। কিন্তু সেই গ্রন্থে যীশুর একটি মূর্তি আঁকা আছে। লুসিগনান বলল।

ফ্রান্সিস বলল, আপনাদের বিশ্বাস নিওফিতস ঐ রকম একটি কাঠের মূর্তি নিজের হাতে কাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি করেছিলেন। পারিসি সেটা কোনোদিন দেখেনি।

লুসিগনান বলে উঠল—পারিসি মিথ্যেবাদী।

না, না, পারিসি জানে না কোথায় আছে সেই কাঠের মূর্তি। ফ্রান্সিস বলল, ভেবে দেখুন মান্যবর রাজা—পারিসি নিওফিতসের গ্রন্থটা নিয়েও পালাতে পারতো কিন্তু সে তা করেনি। আপনাকে দিয়েছে। মূর্তি পেলে নিশ্চয়ই দিয়ে দিতো। মূর্তি চুরি করে কী লাভ ওর? তাছাড়া মূর্তি বিক্রি করতে গেলেও ধরা পড়তো।

রাজা গী দ্য লুসিগনান মাথা নেড়ে বলল, না—না—ওকে আমি আবার জেরস পাহাড়ে পাঠাবো।

বেশ। এবার আমার আর্জিটা জানাই মান্যবর রাজা—পারিসির সঙ্গে আমিও জেরস পাহাড়ের চূড়ার কাছে সেই গুহায় মূর্তি খুঁজতে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

লুসিগনান বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলল—তুমি পারবে ঐ কাঠের মূর্তি উদ্ধার করতে?

সেটা আমি গুহা পাহাড় এসব দেখে-টেখে বলতে পারবো। এজন্যে আপনার অনুমতি চাইছি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ তো তুমিও যাও। লুসিগনান বলল।

মাননীয় রাজা, আমার বিনীত অনুরোধ—যদি আমি সেই মূর্তিটা উদ্ধার করতে পারি তাহলে আল জাহিরির হাতে বন্দী আমাদের দেশের রাজকন্যা ও বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে। পারিসিকেও কোনো শাস্তি দেবেন না।

ঠিক আছে—আগে তো মূর্তিটা উদ্ধার কারো। রাজা বলল।

সেক্ষেত্রে আমার শর্তটা কিন্তু মানতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

ঠিক আছে—দেরি না করে কাজে লেগে পড়ো। রাজা লুসিগনান বলল।

আমরা আজকেই জেরস পাহাড়ের দিকে যাত্রা শুরু করবো। ফ্রান্সিস বলল।

কিন্তু তোমাদের পাহারা দেবার জন্যে চারজন রক্ষী যাবে। যদি তোমরা কাঠের মূর্তি নিয়ে পালিয়ে যাও। রাজা বলল।

মান্যবর রাজা, আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা এখনও আল জাহিরির হাতে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে—ওদের ফেলে রেখে আমি পালাতে পারি? ফ্রান্সিস বলল।

হুঁ। রাজা গী দ্য লুসিগনান পাশের আসনে বসা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরামর্শ করল। তারপর বলল, ঠিক আছে—অনুমতি দিলাম। কিন্তু মূর্তি উদ্ধার করে মূর্তি নিয়ে পালালে তোমাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

সেরকম কিছু ঘটলে যে কোনো শাস্তি মেনে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় রাজা, সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটা একবার দেখতে পারি?

গ্রন্থটি আমার গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। যদি দেখতে চাও তবে গ্রন্থাগারে যেতে হবে। লুসিগনান বলল।

আপনি অনুমতি দিলে এখুনি যেতে পারি। ফ্রান্সিস বলল।

বেশ যাও। কথাটা বলে লুসিগনান একজন দ্বাররক্ষীকে ইঙ্গিতে ডাকল। মৃদুস্বরে রক্ষীকে কী নির্দেশ দিল। রক্ষীটি ফ্রান্সিসদের আসতে বলে রাজসভাঘরের বাইরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস আর পারিসিও চলল।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন একটা পাথরের ঘরের সামনে এসে রক্ষীটা দাঁড়াল। কাঠের বিরাট দরজা বন্ধ। রক্ষীটা পেতলের কড়া কাঠের দরজায় ঠুকে শব্দ করল। দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। এক টাকমাথা বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। পরনে দামী কাপড়ের আলখাল্লা মতো। বোঝা গেল ইনিই রাজার গ্রন্থাগারটির দেখাশুনো করেন। রক্ষীর সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি হেসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের ভেতরে আসতে বললেন।

ফ্রান্সিসরা দরজা পেরিয়ে ঢুকল। এই দিনের বেলায়ও ঘরটা বেশ অন্ধকার। কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। এবার গ্রন্থাগারিক গ্রীক ভাষায় কিছু বললেন। ফ্রান্সিস বুঝল না। তখন উনি পরিষ্কার স্পেনীয় ভাষায় বললেন, আপনি কি শুধু সাধু নিওফিতসের গ্রন্থটিই দেখবেন?

হ্যাঁ—ফ্রান্সিস বলল, গ্রীক ভাষায় লেখা। আমি কিছুই বুঝবো না। শুধু গ্রন্থটির প্রথম পাতায় যীশুখ্রিস্টের যে ছবিটা আছে সেটা দেখবো।

শুধু ছবিটা দেখবেন? এই কথা বলে গ্রন্থাগারিক একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে চললেন।

হ্যাঁ, রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিশ্বাস সাধু নিওফিতস ঐ ছবির মতো একটি কাঠের মূর্তিও তৈরি করেছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

অসম্ভব নয়—ছবিটা এত জীবন্ত যে অবাক হতে হয়, গ্রন্থাগারিক বললেন। কাঠের পাটাতনে রাখা আশেপাশের বড় বড় গ্রন্থগুলির পরে কোণার দিকের এক কাঠের পাটাতনের সামনে এসে গ্রন্থাগারিক বললেন, সাধু নিওফিতসের লেখা এই গ্রন্থটি।

ফ্রান্সিস মোটা চামড়া-বাঁধাই হাতে লেখা মোটা গ্রন্থটির মলাট ওল্টালো। দেখল—যীশুর ছবি আঁকা। সত্যিই ছবিটি জীবন্ত মনে হচ্ছে। পাতা উল্টে দেখল গ্রীক ভাষায় লেখা। ফান্সিস কিছুই বুঝল না। গ্রন্থাগারিক জিজ্ঞেস করল, গ্রন্থটি কী বিষয় নিয়ে লেখা?

খ্রীস্টিয় ধর্মমণ্ডলী কীভাবে পরিচালিত হবে তার নির্দেশ। সাধু নিওফিতস বেশ কয়েক বছর ধরে গুহার নির্জনতায় আশ্রয় নিয়ে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন গ্রন্থাগারিক বললেন।

কিন্তু লেখা শেষ করে যেতে পারেননি। পারিসি বলল।

হ্যাঁ, শেষ নেই। হয়তো আরো কিছু তাঁর লেখার ইচ্ছে ছিল গ্রন্থাগারিক বললেন।

ফ্রান্সিস গ্রন্থাগারিককে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় সাধু নিওফিতস ঠিক এই ছবির মতো একটি কাঠের যীশুমূর্তি বানিয়েছিলেন?

তা বলতে পারবো না। তবে রাজা গী দ্য লুসিগনান বিশ্বাস করেন সাধু নিওফিতস একটা এই ছবির মতো মূর্তি গড়েছিলেন। গ্রন্থাগারিক বললেন।

কোন ঘটনার জন্যে তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছে? ফান্সিস জানতে চাইল। গ্রন্থাগারিক তখন গ্রন্থের ছবিটা দেখিয়ে বললেন, যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথা দিয়েই পুস্তকটি শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো পুস্তকের আঁকা যীশুকে তো স্নান করানো সম্ভব নয়। তাই সাধু নিওফিতস এমনি একটা মূর্তি গড়েছিলেন, হয়তো সেই মূর্তিটিকেই স্নান করাতেন। সে জলটুকু নিশ্চয়ই পবিত্র জল। তাই আমরা বিশ্বাস করি এমনি একটি মূর্তি নিশ্চয়ই সাধু নিওফিতস তৈরি করেছিলেন এবং সেটা সেই গুহাতে বা তার আশেপাশে কোথাও আছে।

ফ্রান্সিস পারিসিকে দেখিয়ে বলল, এর নাম পারিসি। সাধু নিওফিতসের শেষ সময় পারিসি বেশ কিছুকাল তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছিল। কিন্তু পারিসিকেও তিনি কোনোদিন কোনো মূর্তির কথা বলেননি।

গ্রন্থাগারিক বললেন, এই পারিসির কথা আমরা জানি। পারিসিই এই গ্রন্থটি উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিল।

ফ্রান্সিস বলল, তাই আমরা মূর্তিটা খুঁজে বের করতে জেরস পাহাড়ে যাচ্ছি।

খুব ভালো কথা। সাধু নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি তো আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। যীশুর কাছে প্রার্থনা করি আপনারা সফল হোন।

ফ্রান্সিস আর পারিসি গ্রন্থাগার থেকে বেরিয়ে এল।

এবার কাজে নামা। বাইরে এসে যে চাষী গাড়ি চালিয়ে ওদের নিয়ে এসেছিল সেই গাড়ি চড়ে বাজারে এসে এক সরাইখানায় খেয়ে নিল। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনল। পশমী পোশাক বেশি কিনল। পারিসি বারবারই ঐ গুহার এলাকায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কথা বলছিল। খাবার-দাবারও কিনল—সব গুছিয়ে দু'জনে দুই বোঁচকামতো বাঁধল। গাড়িতে রাখল। গাড়োয়ান চাষীটিকে ফ্রান্সিস পুরো একটা স্বর্ণমুদ্রা দিল। বলল, জেরস পাহাড়ের নিচে আমাদের পৌঁছে দাও। চাষী স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খুব খুশি। ফ্রান্সিস আর পারিসি গাড়িতে উঠল। গাড়োয়ান চাষী গাড়ি চালাল জেরস পাহাড়ের উদ্দেশে।

জেরস পাহাড়ের নিচে যখন পৌঁছল তখন বিকেল। ফ্রান্সিস আর পারিসি মালপত্র নামিয়ে নিল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

দু'জনে বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত গেল। ওরা একটা পাহাড়ি মানুষদের বস্তিতে পৌঁছল। বস্তির মানুষেরা ওদের দেখে খুশিই হলো। পারিসিকে এর আগে অনেকেই দেখেছে। জানে যে নিওফিতসের জীবনের শেষ সময় পারিসি সেই মহাপুরুষকে সেবা-শুশ্রূষা করেছে।

সেই রাতটা ওরা বস্তিতেই কাটালো।

পরদিন সকালে আবার বোঁচকা কাঁধে পাহাড়ে উঠতে লাগল। দুপুরে একটা চেস্টনাট গাছের নিচে বসে দু'জনে বোঁচকা থেকে শুকনো খাবার বের করে খেয়ে নিল। তারপর আবার উঠতে লাগল।

গত দু'দিন একটু রাস্তামতো পেয়েছে। বিকেল নাগাদ দেখল রাস্তা বলে আর কিছু নেই। পাথরের চাঙ-এর ওপর পা রেখে রেখে ওঠা। শুরু হলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। দু'জনেই মাথাঢাকা পশমের পোশাক পরে নিল।

সন্ধ্যে নাগাদ একটা ছোট্ট পাহাড়ি মানুষদের বস্তি পেল।

সেই বস্তিতেই খেয়েদেয়ে রাত কাটাল।

পরদিন সকাল থেকেই যাত্রা শুরু করল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার বেগ বাড়লো। গা মাথা ভালো করে গরম কাপড়ে জড়িয়ে ওরা উঠতে লাগল।

দুপুর নাগাদ একটা গুহার সামনে এল। পারিসি বলল, মহাপুরুষ নিওফিতস এই গুহাটায় প্রথমে ছিলেন। পরে আরো উঁচুতে এক গুহায় চলে যান।

ওরা গুহাটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, আজকে বিশ্রাম নেব এখানে। রাতটা কাটিয়ে কাল আবার ওঠা শুরু করবো।

দু'জনে গুহাটার এবড়োখেবড়ো মেঝেয় কাপড় পেতে বসল। খাওয়া দাওয়া

সারল। ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। অনেক চিন্তা মাথায়। যীশুর মূর্তি আদৌ নিওফিতস তৈরি করেছিলেন কি না। করলে মূর্তিটা কোথায় রেখেছিলেন? আরো চিন্তা—হাতে সময় খুব কম। আল জাহিরি ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। ও তাড়াতাড়ি মারিয়াকে, বন্ধুদের বিক্রি করে দিতে চাইবে। তার আগেই মূর্তি উদ্ধার করতে হবে। এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে কিছু খেয়ে নিয়ে আবার শুরু হলো পাহাড়ে ওঠা। এখানে গাছ-গাছালি নেই বললেই হয়। শুধু বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই। সেসবে কখনো উঠে কখনো নেমে একফালি জায়গা দিয়ে ওঠা। ঠাণ্ডার তীব্রতা বাড়তে লাগল। কখনো কুয়াশা মেঘের মতো চারদিক ঢেকে ফেলছে। এক হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। পরক্ষণেই তীব্র হিমেল বাতাস ও কুয়াশা উড়িয়ে দিচ্ছে। রোদ দেখা যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কুয়াশা ঢেকে ফেলেছে চারদিক। কুয়াশা আর রোদের খেলা চলছে।

দুপুরে থামল একটা বিরাট পাথরের চাঁইয়ের নিচে। খাবার বের করে খেয়ে নিল।

আবার পাহাড়ে ওঠা। বিকেলের কিছু আগে একটা বেশ বড় সমতলভূমি দেখল। কয়েকঘর পাহাড়ি লোকের বাস এখানে। ঐ সমতলভূমিতে গম ভুট্টার চাষ করে।

সমতলটুকু পেরিয়ে আসতেই দেখল উঁচুতে একটা পাহাড়ি গুহা। এই গুহার মুখটা বড়। খাড়া চড়াইয়ের মাথায় সেই গুহা।

গুহাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এই গুহাটাতেই সাধু নিওফিতসের সঙ্গে আমি শেষ পর্যন্ত ছিলাম। ফ্রান্সিস গুহাটা দেখতে দেখতে বলল, কিন্তু গুহাটায় উঠলে কী করে?

সেই দড়ি-মইয়ের কথা বলেছিলাম। পারিসি বলল।

কিন্তু সেটা কি আছে এখনও? ফ্রান্সিস বলল।

দেখা যাক। পারিসি বলল।

এমন সময় সেই বস্তি থেকে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল। পারিসির কাছে এসে পারিসিকে দেখে হাসল। বোঝা গেল পারিসিকে চিনেছে। বৃদ্ধের মুখে বলিরেখা ফুটে উঠল। বৃদ্ধের সঙ্গে পারিসির কিছু কথা হলো। ফ্রান্সিস তার কিছুই বুঝল না। বৃদ্ধটি চলে গেল।

পারিসি ফ্রান্সিসকে নিয়ে খাড়া পাহাড়টার নিচে এল। দেখল দুটো দড়ি ঝুলছে। দড়ির মধ্যেকার কাঠের সিঁড়িগুলো খসে গেছে। দু'টো টানা দড়িই ভরসা।

দু'টো দড়ি ধরেই ওঠা যাবে। ফ্রান্সিস বলল।

আজকে উঠবেন? পারিসি জিজ্ঞেস করল।

না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কালকে সকালে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

রাত হলো। পাহাড়ি বস্তির সেই বৃদ্ধটি এল। পারিসিকে হেসে কী বলল। পারিসি বলল, ফ্রান্সিস, আজ রাতে এরা অতিথি হতে বলছে।

ভালোই তো, ফ্রান্সিস বলল, তুমি বৃদ্ধকে বলো আমরা আনন্দের সঙ্গে অতিথি হবো। তবে শুধু খাবো, থাকবো না। পারিসি কথাগুলো বৃদ্ধকে বলল। বৃদ্ধ খুব খুশি।

ফ্রান্সিস আর পারিসি বোঁচকা রেখে খেতে গেল। এক বৃদ্ধা ওদের সমাদরে একফালি ঘরে বসাল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ছেলে-মেয়েরাও ফ্রান্সিসদের পেয়ে খুব খুশি। পাহাড়ি জীবনে বাইরের মানুষের সঙ্গে তো ওদের খুব কমই সাক্ষাৎ হয়। ঐ একফালি ঘরেই ওদের বসিয়ে খাওয়াল—বাড়িতে তৈরি গোল রুটি আর পাখির মাংস। ফ্রান্সিস তো পেট পুরে খেল। এ ক'দিন তো ভালো খাবার কপালে জোটেনি। পারিসিও পেট ভরে খেল।

বৃদ্ধটি বারবার ঐ একফালি ঘরেই ওদের থাকতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঠাণ্ডায় বৃদ্ধের পরিবারের লোকদের কষ্ট হবে। ওরা পাহাড়ি পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল। বড় পাথরের চাঁইটার ওপর পশুলোমের কম্বলমতো পেতে গরম পোশাক গায়ে দিয়েই ওরা শুয়ে পড়ল। শেষরাতের দিকে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জায়গায় শীতার্ত হাওয়া যেন গায়ে কামড় বসাচ্ছে। ফ্রান্সিস আর ঘুমলো না। আকাশে চাঁদের আলো উজ্জ্বল। তবে মাঝে মাঝে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে উঁচু পাহাড়ের চুড়ো আর তিনদিকের শূন্যতায় কুয়াশার গায়ে চাঁদের আলো। সুন্দর দেখাচ্ছে। হঠাৎই ফ্রান্সিসের মনে পড়ে গেল মারিয়া আর বন্ধুদের কথা। কী কষ্টে ওদের দিন কাটছে। কুয়াশায় চাঁদের আলোর খেলা, পাহাড়ি সৌন্দর্য সবই ফ্রান্সিসের কাছে ম্লান হয়ে গেল। ও চোখ বুঁজে ঝিমোতে লাগল।

সকাল হতেই ফ্রান্সিসরা কাজে নামল। বোঁচকা পিঠে নিয়ে ফ্রান্সিসই প্রথম দড়ি দুটোর কাছে এল। ফ্রান্সিস দড়ি দুটো গায়ের জোরে টানল। যাক—দড়ি দুটো আলগা হয়নি। ওপরে কোনো পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে বাঁধা আছে বোধহয়।

প্রথমে ফ্রান্সিস একটা দড়ি ধরে দড়িটার দু'দিকে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে রেখে গুহার মুখের কাছে উঠে এল। এবার পারিসি উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস দড়ি টেনে টেনে পারিসিও গুহার মুখে উঠে এল। দু'জনেই হাঁপাচ্ছে তখন।

এবার দু'জনে গুহায় ঢুকল। বাইরের আলো থেকে এসে অন্ধকারই লাগল গুহার ভেতরটা। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল গুহাটা বেশ বড়। বাইরের তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া গুহার ভেতরে অল্পই ঢুকছে। সেইজন্যেই গুহার ভেতরটায় একটু গরমভাব।

পারিসি গুহাটার বেশ ভেতরে এল। দেখা গেল অনেকটা জায়গায় শুকনো পাতা বিছানো। জায়গাটা দেখিয়ে পারিসি বলল, এইখানে সাধু নিওফিতস শেষ

নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। ধর্মতত্ত্বের কথা সেসব। আমার কি সেসব বোঝার মতো বিদ্যেবুদ্ধি আছে নাকি। তবু শুনতাম। বুঝতাম তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাগুলো বলে আনন্দ পাচ্ছেন। পারিসি থামল। তারপর গুহার কোণার দিকে পোড়া হাঁড়ি-কুড়ি দেখিয়ে বলল, সেদিন সন্ধ্যের সময়ই সাধু নিওফিতস খেয়ে নিলেন। আমিই রান্নাবান্না করতাম। সব দিন নয়। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির সিঁড়ির কাছে রান্নাকরা খাবার রেখে যেত। যেদিন ওসব খাবার পেতাম না সেদিন রান্না করতাম। একটু থেমে পারিসি বলতে লাগল, একটু রাতে সাধু নিওফিতস মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন—পারিসি—পারিসি। আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম উনি বলছেন—পারিসি, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। এবার আমার যাবার সময় হয়েছে। দেখছো না স্বর্গের দেবদূতেরা এসেছে। আমি যাচ্ছি। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। দেখি—গুহাটা এক অপার্থিব আলোয় ভরে গেছে। আমি সেই আলোর বর্ণনা করতে পারবো না। আমি দ্রুত এসে সাধু নিওফিতসের পায়ে হাত দিলাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা। গায়ে হাত দিলাম—ঠাণ্ডা। মুখের কাছে কান পাতলাম। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ নেই। বুকে কান পাতলাম কোনো শব্দ নেই। আমি কেঁদে উঠলাম। সারারাত সাধু নিওফিতসের পা ধরে কাঁদলাম। একটু থেমে পারিসি বলল, সকাল হতে আমি গ্রন্থটা হাতে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে নিচে নামলাম। একটু বেলায় পাফোসের খ্রীস্টিয় মঠের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। গ্রন্থ দিলাম। সব বললাম। তাঁরাই সাধু নিওফিতসের শেষ কাজ করলেন। পারিসি থামল। তারপর কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে মেঝের পাতা-ছড়ানো জায়গাটায় চুম্বন করল। ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না।

এবার ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে গুহাটা দেখতে লাগল। গুহাটার একেবারে পেছনে একটা বড় ফাটল মতো আছে। তারপরেই একটা ঝর্ণার জল নিচে নেমে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস বুঝল এই ঝর্ণার জলই নিওফিতস খেতেন। এই ঝর্ণার জলেই স্নান করতেন।

ফ্রান্সিস ফিরে এসে বোঁচকা খুলল। শুকনো পাতা-ছাওয়া জায়গাটায় একটা মোটা কম্বলমতো পাতল। তারপর শুয়ে পড়ল। পারিসিও বোঁচকা খুলে মোটা কাপড় পেতে বসল। ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, এখানে মানে গুহাটার বাইরে সব জায়গাটাই তুমি দেখছো?

হ্যাঁ। পারিসি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

কী আছে বাইরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

পাহাড়-টাহাড় যেমন হয়। এখানে ছোট ছোট কয়েকটা সীডার, চেস্টনাট গাছ আছে। পারিসি বলল।

তাহলে সাধু নিওফিতস কাঠ পেয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যাঁ, শীতের সময় আগুন জ্বালাবার জন্যে জ্বালানি কাঠও এই গুহার কোণায় জড়ো করা থাকতো। পারিসি বলল।

হুঁ—খাওয়াদাওয়ার পর এই গুহা আর চারপাশ ভালো করে দেখতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

দুপুরবেলায় খোলা বোঁচকা থেকে আটা, আলু এসব বের করে পারিসি রান্না চাপিয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়া সেরে ফ্রান্সিস গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল, জ্বলন্ত মশাল হাতে। গুহাটার কঠিন পাথুরে গা। দেখবার কিছুই নেই।

একসময় ফ্রান্সিস কাঠ রাখবার জায়গাটায় এল। কাঠ, শুকনো ডালপালা সরিয়ে সরিয়ে দেখছে, তখনই হঠাৎ নজরে পড়ল একটা হাতুড়ি। ছোট হাতুড়ি। ঐ জায়গায় ডালপাতা সরাতেই দেখল দুটো বাটালি। একটা বড় একটা ছোট। ফ্রান্সিস্ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ডাকল, পারিসি। পারিসি ওর কাছে এল। ফ্রান্সিস ততক্ষণে হাতুড়ি আর বাটালি দুটো তুলে নিয়েছে। পারিসি কাছে এলে বলল, এসব কী বুঝতে পারছো। পারিসি মাথা নেড়ে বলল, নাঃ। ফ্রান্সিস বলল—সাধু নিওফিতস এই হাতুড়ি, বাটালি দিয়েই কাঠ কুঁদে কুঁদে প্রভু যীশুর মূর্তি গড়েছিলেন। কাজেই আমার অনুমান ঠিক। এখানেই কোথাও আছে সেই কাঠের মূর্তি।

হাতুড়ি বাটালি রেখে ফ্রান্সিস গুহার চারদিকটা মশালের আলোয় ভালো করে দেখতে লাগল। আর কিছু পেল না। তবে নিশ্চিত হলো যে কাঠের মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল।

ফ্রান্সিস মশালটা গুহায় রেখে গুহার শেষ ছোট মুখটা দিয়ে বাইরে এল। দেখল সেই ঝর্ণাটা। ফ্রান্সিসের মনে পড়ল নিওফিতসের লেখা সেই গ্রন্থ শুরু হয়েছে যীশুর স্নানের জল পবিত্র—এই কথাটা দিয়ে। তার মানে জলের কথা বলা হয়েছে। কাজেই এই ঝর্ণার জলের গুরুত্ব বেড়ে গেল।

ফ্রান্সিস আর পারিসির একঘেয়ে সময় কাটতে লাগল। খাওয়া দাওয়া আর গুহার মধ্যে বাইরে কাঠের মূর্তির সন্ধান। একটা ব্যাপারে ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে নিওফিতস তাঁর হাতে তৈরি যীশুর মূর্তির কথা কাউকে বলে যেতে পারেন নি অথবা এও হতে পারে তিনি ইচ্ছে করে কাউকে বলেন নি। যে গুহায় ছিলেন সেখানে অন্য কেউ আসেনি। পরে এই গুহায় থাকাকালীন একমাত্র পারিসিই এসেছিল। বলার ইচ্ছে থাকলে পারিসিকে বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেন নি। কোন সূত্রও রেখে যাননি। শুধুমাত্র সেই গ্রন্থের প্রথম কথাটি—যীশুর স্নানের জল পবিত্র। এই জল কথাটি নিয়েই ফ্রান্সিস বেশি ভাবছে।

সেদিন ফ্রান্সিসকে পারিসি বলল—এই ঠাণ্ডায় এই গুহায় পড়ে থেকে কী হবে। চলুন নেমে যাই।

— না—ফ্রান্সিস বলল—ইচ্ছে হলে তুমি নেমে যেতে পারো। আমি মূর্তি উদ্ধার করার জন্যে থাকবো। পারিসি বুঝল—ফ্রান্সিসকে সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে

না। ও আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিস সকাল দুপুর গুহার বাইরে মূর্তি খুঁজে বেড়াতে লাগল। গুহায় গুহার ধারে কাছে ফ্রান্সিস তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

সেদিন সকালের খাওয়া সেরেছে ওখানেই। গুহামুখে একজন সৈন্য এসে দাঁড়াল। শিরস্ত্রাণ বর্ম নেই। কিন্তু কোমরে তরোয়াল গোঁজা। ফ্রান্সিস পারিসি দু'জনেই বেশ আশ্চর্য হল।

সৈন্যটি সটান গুহার মধ্যে ঢুকে ফ্রান্সিসদের সামনে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—বলো তো লোকটা কি সৈনিক? এখানে এসেছে কেন? পারিসি তাই জিজ্ঞাসা করল। লোকটি গ্রীক ভাষায় কী বলে গেল। পারিসি ফ্রান্সিসকে বলল—ও বলছে—ও সৈনিক। নাম আন্তো। ও নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তির কথা শুনেছে। সেটা উদ্ধার করতে আমরা এসেছি তাও জানে। কৌতূহল হয়েছে ওর। তাই দেখতে এসেছে কীভাবে আমরা মূর্তিটা উদ্ধার করছি। ফ্রান্সিস এবার আন্তোকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি স্পেনীয় ভাষা জানো?

—শুনলে বুঝতে পারি—অল্পস্বল্প বলতেও পারি। আন্তো বলল।

—তাহলে শোনো। সাধু নিওফিতস যীশুর কাঠের মূর্তি গড়েছিলেন সেটা পুরোটাই রাজা গী দ্য লুসিগনান থেকে শুরু করে সকলেরই কল্পনা। এর কোন প্রমাণ এখনও কেউ পায়নি। আমরাও পাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—তবে এখানে এই ঠাণ্ডায় গুহার মধ্যে আছেন কেন? আন্তো বলল।

—আর কয়েকটা দিন খোঁজাখুঁজি করবো তারপর নেমে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—আমিও আপনাদের সঙ্গে নেমে যাবো। আন্তো বলল। ফ্রান্সিস বুঝল—এই লোকটা পিছু ছাড়বে না। তাই বলল—

—এখানে কিন্তু খাওয়া দাওয়ার খুব কষ্ট হবে।

—আপনারা যা খাবেন তাই খাবো। আপনারা না খেয়ে থাকলে আমিও না খেয়ে থাকবো। আন্তো বলল। তারপর হাতের বড় পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল—অবশ্য আমি কিছু শুকনো খাবার নিয়ে এসেছি। একসঙ্গেই খাবো। ফ্রান্সিস বুঝল আন্তো আটঘাট বেঁধেই এসেছে। ওকে এড়ানো মুস্কিল। থাকুক—ক্ষতি তো করবে না।

আন্তো ফ্রান্সিসদের সঙ্গে থেকে গেল।

সেদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—সাধু নিওফিতস আগে মানে প্রথমে যে গুহাটায় ছিলেন সেটা এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। আজকে চলো নেমে ঐ গুহাটা দেখে আসি।

ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল নামবার দড়িটার দিকে। আন্তোও পেছনে পেছনে চলল।

গুহামুখ থেকে ঝোলানো দড়ি ধরে ধরে ওরা নিচের একফালি সমতলভূমিতে এল। তারপর উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। পথ বলে কিছু নেই। ওঁচানো পাথর ধরে ধরে নামা। বেশ কিছুটা নামার পর অন্য গুহাটার মুখে এল। এই গুহাটা

ওপরের গুহাটার তুলনায় ছোট।

গুহাটায় ঢুকল তিনজনে। ফ্রান্সিস দেখল ওপরের গুহার মত এই গুহাতেও শুকনো ঘাসপাতা বিছিয়ে বিছানামত করা। ফ্রান্সিস বলল—পারিসি এই গুহাটায় তুমি কখনো এসেছিলে? পারিসি মাথা নেড়ে বলল—না।

ফ্রান্সিস সঙ্গে আনা মোটা কাপড়টা ঘাসপাতার ওপর বিছিয়ে দিল। পারিসি আর আন্তো বসল। ফ্রান্সিস বসল না। ঘুরে ঘুরে গুহাটা দেখতে লাগল। গুহাটার এক কোণে পোড়া হাঁড়িকুড়ি রাখা। সাধু নিওফিতস যখন এখানে থাকতেন তখন রান্নাটান্না করতেন। এখানেও একপাশে গাছের শুকনো ডাল কাণ্ড পাতা রাখা। সাধু নিওফিতস রান্না করতেন। আগুন জ্বালাতেন। কিন্তু কোথায় কাঠের যীশু মূর্তি?

ফ্রান্সিস গাছের কাণ্ড ডালপাতা সরাল যদি কিছু পাওয়া যায়। পেলও—একটা ছোট হাতুড়ি আর ছোট বাটালি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সাধু নিওফিতস এখানেও কাঠের কাজ করেছিলেন। যীশুর মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তাহলে কি সাধু নিওফিতস একটার বেশি যীশু মূর্তি কাঠকুঁদে বানিয়েছিলেন? ফ্রান্সিস ভাবল—হয়তো দু'তিনটে মূর্তি সাধু নিওফিতস গড়েছিলেন। কিন্তু একটি মূর্তিও তো পাওয়া গেল না। একটি মূর্তি পাওয়া গেলেও বোঝা যেত আরো মূর্তি তৈরি হয়েছিল কিনা।

ফ্রান্সিস গুহাটার শেষের দিকে এল। দেখল একটা বড় ফাটল। ফাটলটা দিয়ে ফ্রান্সিস বাইরে বেরিয়ে এল। চারদিকে গাছ পাথর। পাহাড়ি এলাকা যেমন হয়। এদিক ওদিক কিছুদূর ঘুরে এল ফ্রান্সিস। কিন্তু কোথাও ঝর্ণা বা জলজমা কুণ্ড দেখতে পেল না। তবে সাধু নিওফিতস কোথায় স্নান করতেন? খাবার জলই বা পেতেন কোথায়?

ফ্রান্সিস গুহায় ফিরে এসে পারিসিকে সেই প্রশ্ন করল—পারিসি এখানে কাছাকাছি কোথাও ঝর্ণা বা জমা জল দেখলাম না। তাহলে সাধু নিওফিতস খাবার জল কীভাবে পেতেন? স্নানই বা করতেন কোথায়? পারিসি বলল—তা তো বলতে পারবো না। আমি তো এই গুহায় কখনো থাকি নি। ফ্রান্সিস বলল—আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এখানে কোথাও ঝর্ণা বা অমনি কোনো জলের জায়গা আছে। পারিসি বলল—হতে পারে।

তিনটি পাথরে তৈরি উনুনটায় পারিসি আগুন জ্বালল। সঙ্গে যে খাবার এনেছিল তাই গরম করে সবাইকে খেতে দিল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস বলল—পারিসি আমরা এই গুহায় কয়েকদিন থাকবো। এখানে ঠাণ্ডাটাও অনেক কম। খেয়েদেয়ে যাও ওপরের গুহা থেকে খাবারদাবার কাপড়চোপড় নিয়ে এসো। সব এনে তুমি একবার নিচের পাহাড়ি গাঁয়ে যাবে। গাঁয়ের লোকদের অনুরোধ করবে তারা যেন দু'তিনদিন পর পর আমাদের জন্যে খাবারদাবার এই গুহার নিচের এক চিলতে সমভূমিতে রেখে যায়। এবার আন্তোকেও বলল—তুমিও যাও পারিসিকে সাহায্য করো। খাওয়া দাওয়া সেরে পারিসি আর আন্তো বেরিয়ে

গেল।

পারিসি বিকেলের মধ্যেই ওপরের গুহা থেকে সব এনে এই গুহায় জড়ো করল।

পারিসি আন্তোকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে এল। পাহাড়ি গাঁয়ের মানুষদের অনুরোধ করে এল দু'তিনদিন অন্তর অন্তর খাবারদাবার দিয়ে যেতে। কেন ও আর ফ্রান্সিস অনেক কষ্ট সহ্য করেও গুহায় পড়ে আছে তাও বলল। বলল—মহাপুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে গড়া কাঠের যীশুর মূর্তি উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। তার জন্যেই এত কষ্ট সহ্য করছি। সাধু নিওফিতসের নাম শুনেই সবাই মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল।

থাকা খাওয়ার মোটামুটি ব্যবস্থা হল। এবার মূর্তি খোঁজা।

গুহাটা ফ্রান্সিস তন্ন তন্ন করে খুঁজল। পাথরের কোন খাঁজই বাদ দিল না। কিন্তু মূর্তি নেই। কোথাও নেই। কোনো সূত্রই ফ্রান্সিসের হাতে নেই। শুধু সাধু নিঁওফিতসের গ্রন্থের সেই প্রথম কথাটা—যীশুর স্নানের জল পবিত্র। অথচ এখানে কোথাও জলই নেই। ওপরের গুহার পেছনে তবু একটা ছোট ঝর্ণা আছে। এখানে তাও নেই।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল গুহা থেকে। পাথরে পা রেখে এদিকওদিক ঘুরে বেড়াল। কিন্তু ঝর্ণা কোথাও নেই। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসল। তখনই নজরে পড়ল বাঁ দিকে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপাশটায় কুয়াশা জমছে। তারপর মনে হল ধোঁয়া। ফ্রান্সিস ভালো করে তাকিয়ে থেকে বুঝল ওটা বাষ্প। কিন্তু জল ছাড়া বাষ্প এটা ঠিক বুঝল না ফ্রান্সিস। সন্দেহ নিরসনের জন্যে ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে পাথরের চাঁইটা পেরোতেই চমকে উঠল। দেখল একটা জলের কুণ্ড। তাই থেকে বাষ্প উঠেছে। তার মানে উষ্ণ প্রস্রবণ। এই উষ্ণ প্রস্রবণেই নিওফিতস স্নান করতেন। ফ্রান্সিস আরো কয়েক পা এগোতেই দেখল উষ্ণ জলের কুণ্ডে ভাসছে একটা কাঠের মূর্তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। ঠিক যেমনটি ও দেখেছিল নিওফিতসের সেই পুস্তকে। ফ্রান্সিস তাড়াতাড়ি নেমে এল। উবু হয়ে বসে জলে হাত রাখল—বেশ গরম। এবার বুকে ক্রুশ আঁকলো। তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠের মূর্তিটা তুলে নিল। তারপর কোমরের ফেট্টিতে গুঁজল। আস্তে আস্তে চলল গুহার দিকে।

গুহায় ঢুকে ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলল—পারিসি—দেখ! এই মূর্তিটাই নিওফিতস নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। পারিসি মোটা কাপড়ের বিছানায় শুয়ে ছিল। এক লাফে উঠে পড়ল। ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস কোমর থেকে খুলে মূর্তিটা পারিসিকে দিল। তখন আন্তোও ছুটে এসেছে। পারিসি মূর্তিটা কপালে ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল—এই মূর্তির কথা নিওফিতস আমাকে কখনও বলেন নি। নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তি। কী অমূল্য সম্পদ।

পারিসি মূর্তিটা পাথরের খাঁজে বসাল। তারপর মাথা নিচু করে ক্রুশ আঁকলো। তারপর বিছানায় এসে বসল। তখন ওর ফুঁপিয়ে কান্না বন্ধ হয়েছে। ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মূর্তিটার দিকে। আন্তোও অবাক চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। পারিসি এবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—চলুন এবার নেমে যাই। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না—এখন নয়। আমার কেমন বিশ্বাস নিওফিতস দুটো মূর্তি তৈরি করেছিলেন। একটা তো পেলাম। আর একটা আছে ওপরের গুহার ধারেকাছে কোথাও। ভুলে যেও না—দুটো গুহাতেই আমরা হাতুড়ি বাটালি পেয়েছি।

—তাহলে আবার ওপরের গুহায় যাবেন? পারিসি বলল।

—হ্যাঁ আর একটা মূর্তির সন্ধান করতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস সব গুছিয়ে নিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। পারিসি কপালে একটা কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে তাতে মূর্তিটা গুঁজে রাখল। এতে দু'হাত খোলা রইল। পাহাড়ে ওঠার সুবিধে হল।

তিনজনে পাহাড়ের ওপরের গুহাটায় যাবার জন্যে রওনা হলো। কখনও পাথুরে চাঁই-এ উঠে কখনও খণ্ড পাথরে পা রেখে রেখে তিনজনে ওপরের গুহার নিচের সমতল অল্প জায়গাটায় এল। তারপর ঝোলানো দড়ি বেয়ে বেয়ে প্রথমে ফ্রান্সিস উঠে এল। তারপর পারিসি আর আন্তো উঠে এল। সবাই গুহাটায় ঢুকল।

গুহায় মোটা কাপড় পেতে বিছানামতো করা হলো।

ফ্রান্সিস আর পারিসি বসল। পারিসি কপালে বাঁধা মূর্তিটা বের করে মাথার কাছে রাখল। আন্তো বসল না। বলল—যাই ঝর্ণার জলে চানটা সেরে আসি। আন্তো গুহার পেছন দিকে দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার পারিসি বলল—ফ্রান্সিস আমি তো নিচের পাহাড়ি গ্রামগুলোয় আমাদের খাবার দেবার কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন শুনেছি সেনাপতি ফেলকো রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই কেরিনিয়ার দুর্গে সে আস্তানা গেড়েছে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে সেনাপতি ফেলকো আন্তোকে পাঠিয়েছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে।

—কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা নিওফিতসের হাতে-গড়া মূর্তি উদ্ধার করতে পারলাম কিনা তার খোঁজ নিতে। দেখছেন না আন্তো কেমন ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে থাকে। আমার একমাত্র চিন্তা আন্তো আমাদের কোনো বিপদে না ফেলে। পারিসি বলল।

—দেখা যাক। ফ্রান্সিস বলল।

—এই যে আন্তো হঠাৎ চান করতে চলে গেল তার কারণ কী। আন্তো এত সকালে কোনোদিন চান করে না। পারিসি বলল।

—তাহলে আন্তো কোথায় গেল? ফ্রান্সিস বলল।

—আন্তো এর মধ্যে নিচে নেমে লোক দিয়ে বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকোকে সংবাদ পাঠিয়েছে যে সাধু নিওফিতসের মূর্তি আমরা খুঁজে পেয়েছি। পারিসি বলল।

—তা'তে কী হল? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা নিচে নামলেই ফেলকোর সৈন্যরা আমাদের কাছ থেকে মূর্তিটা কেড়ে নেবে। পারিসি বলল।

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। তারপর বলল—আমরা অন্য দিক দিয়ে পাহাড় থেকে নামবো। সেনাপতি ফেলকোর সৈন্যদের নজর এড়িয়ে পালাবো।

—সে চেষ্টাই করতে হবে। পারিসি বলল।

বেশ দেরি করে আন্তো ফিরে এল। হাতে খাবার। বলল—নিচে পাহাড়ি লোকেরা এই খাবার দাবার রেখেছে। আমি তাও নিয়ে এলাম।

তিনজনে খেতে লাগল। ফ্রান্সিস আর পারিসি কোনো কথা বলল না।

খুব ভোরে। তখনও সূর্য ওঠেনি। পারিসির ধাক্কায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল—কী ব্যাপার।

—আন্তো যীশুর মূর্তিটা নিয়ে পালিয়েছে। পারিসি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—মূর্তিটা আমি মাথার কাছে রেখে ঘুমিয়েছিলাম। ফ্রান্সিস দেখল আন্তোর শয্যা শূন্য।

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস গুহার পেছনের ফাটলটা দিয়ে বাইরে এল। ঝর্ণাটার জল একনাগাড়ে শব্দ তুলে বয়ে চলেছে। ফ্রান্সিস ঝর্ণাটার পাশ দিয়ে ছোট ছোট ঝোপ, পাথরের বড় বড় টুকরোর ওপর পা রেখে রেখে উঠতে লাগল। কিছুদূরে খাড়াই ওঠার পর দেখল ঝর্ণাটা একটা ছোট্ট গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঝোপঝাড় ধরে ধরে ফ্রান্সিস গুহামুখটায় এল। তখনই দেখল ঝর্ণাটা দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা নেমে গেছে ওদের গুহাটার পেছন দিয়ে আর একটা ধারা নেমে গেছে ডানদিক দিয়ে। ফ্রান্সিস এই নতুন ধারাটার পাশ দিয়ে নামতে নামতে দেখল ঐ জলাধার একটা কুণ্ডের মতো জায়গায় জমেছে। কুণ্ডটার নিচে কোনে ফাটলের মধ্যে দিয়ে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এইজন্যেই কুণ্ডে বেশি জল জমছে না। কুণ্ডের চারপাশের লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপঝাড় কুণ্ডটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ঐ ফাঁকটুকু দিয়ে তাকিয়ে ফ্রান্সিসের মনে হলো কুণ্ডের জলে কী যেন ভাসছে। ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল। লম্বা লম্বা ঘাস ঝোপ সরিয়ে দেখল—একটা কাঠের মূর্তি ভাসছে। উল্টোমুখ তাই কিসের মূর্তি বুঝল না। ফ্রান্সিস নিচু হয়ে বেশ কষ্ট করে মূর্তিটা তুলে আনল। এ কী? যীশুর মূর্তি। আর একটি। নিওফিতসের গ্রন্থে আঁকা ছবির সঙ্গে হুবহু মিল। তাহলে এই কাঠের মূর্তিটাও নিওফিতস নিজের হাতে গড়েছিলেন। আনন্দে ফ্রান্সিস দু'হাত তুলে বলে উঠল, পারিসি আর একটি মূর্তি। ফ্রান্সিস ভক্তিভরে বুকে ক্রুশ আঁকল।

এবার ফ্রান্সিস মূর্তিটা জামার সামনের গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে নিল। দু'হাত তো খোলা রাখতে হবে। নইলে পাথরে ওঠা-নামা করতে পারবে না। ফ্রান্সিস কুণ্ডের এলাকা থেকে আস্তে আস্তে উঠে আগের ঝর্ণাটার মুখে এল। তারপর ঝর্ণার ধার দিয়ে পাথর ঝোপঝাড় ধরে ধরে নিজেদের গুহার পেছনে এল। ফাটল দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকল। দেখল, পারিসি বসে আছে। ফ্রান্সিস মূর্তিটা বের করে পারিসির চোখের সামনে ধরল। মূর্তি দেখে পারিসি অবাক হয়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রুশ আঁকল। জলে ভেজা মূর্তির পায়ে চুম্বন করল। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ওর বিছানায় রাখল। কয়েকদিনের পাহাড়ে ওঠার প্রচণ্ড পরিশ্রম, কষ্ট—খাওয়াও ভালো জোটেনি, নাওয়াও হয়নি—ক্লান্তিতে ফ্রান্সিস মূর্তির পায়ের কাছে মাথা রেখে শুয়ে রইল। এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যেও শুনল পারিসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ঘুম ভাঙতে ফ্রান্সিস দেখল বেশ বেলা হয়েছে। পারিসি ফ্রান্সিসকে ডাকল—খেয়ে যান। ফ্রান্সিস দেখল পারিসি খাবার নিয়ে বসে আছে। তার মানে ওকে আজ রাঁধতে হয়নি। পাহাড়ি বস্তির লোকেরা সেই দড়ির নিচের সমতল মাটিতে খাবার রেখে গেছে। পারিসি দড়ি বেয়ে নেমে সেই খাবার নিয়ে এসেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, পারিসি, আর এখানে থেকে লাভ নেই। চলো আজকেই নেমে যাবো।

দু'জনে আবার বিছানা কাপড় সব নিয়ে বোঁচকা বাঁধল। পারিসি কোমরের ফেট্টি খুলল। কপালের কাছে যীশুমূর্তি রেখে ফেট্টি দিয়ে বাঁধল। তারপর গুহা থেকে ফ্রান্সিসের পেছনে পেছনে বোঁচকা কাঁধে বেরিয়ে এল।

নামার সময় যে যে পাহাড়ি বস্তিতে ওরা আশ্রয় নিয়েছে সেখানকার সবাই যীশুর মূর্তির পা চুম্বন করেছে। পারিসি সেই মূর্তি কপালের ফেট্টির সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

পাহাড়ের যে পথ দিয়ে লোকজন ওঠা নামা করে আর ফ্রান্সিস ও পারিসি যে পথ দিয়ে উঠে এসেছিল সেই পথ দিয়ে ফ্রান্সিস ও পারিসি নামবে না স্থির করল। নামতে লাগল পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে।

এদিক দিয়ে তো লোক চলাচল করে না। কাজেই পথ বলে কিছু এদিকে নেই। বড় বড় পাথরের চাঁই, ঝোপ জঙ্গল পাথরের টুকরো ছড়ানো জায়গা। এসবের মধ্যে দিয়ে দু'জনে নেমে চলল। পাহাড়ের মাঝামাঝি নামতেই শুরু হল রোদের তেজ। ঐ রোদের মধ্য দিয়েই দু'জনে নামতে লাগল। একে রাস্তা বলে কিছু নেই পাথরের চাঁই গাছের গুঁড়ি এসব ধরে ধরে নামতে হচ্ছে। দু'জনেই বেশ কাহিল হয়ে পড়ল। এক সময় ফ্রান্সিস বলল—পারিসি—কপাল থেকে মূর্তিটা নামিয়ে পোশাকের ভেতরে রাখো। ঐ মূর্তিটা ওভাবে রাখলে সহজেই

লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কার মনে কী আছে কে জানে। পারিসি মূর্তিটা খুলে পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।

সামনে একটা গাছ। এটা পেরোলেই এবড়োখেবড়ো ঘাসে ঢাকা সমতলভূমি। পাহাড় শেষ। ফ্রান্সিস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—পারিসি থামো। দু'জনেই গাছটার আড়ালে দাঁড়াল। দেখল একটু নিচে সমতলভূমিতে আন্তো দাঁড়িয়ে আছে। এখন শিরস্ত্রাণ বর্ম পরা। সঙ্গে চারজন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য। পারিসি বলল—আন্তো এখানে সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

—ঠিক বুঝতে পারছি না—ফ্রান্সিস বলল—তবে কি ও জানতে পেরেছে যে আমরা আর একটি মূর্তি পেয়েছি?

—কী করবেন এখন? পারিসি বলল।

—চলো নামা যাক। দেখি আন্তোরা কী চায়। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর পারিসি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কয়েকটা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নিচে নেমে এল।

দু'জনে নামতেই আন্তো হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বলল—ফ্রান্সিস—তুমি খুব বুদ্ধিমান। আমি ভালো করেই জানতাম যে পথ দিয়ে সবাই পাহাড়টায় ওঠানামা করে সেই পথ দিয়ে তুমি নামবে না। পাহাড়ের উল্টো দিক দিয়ে নামবে। তাই আমি সৈন্যদের নিয়ে এই উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছি। ফ্রান্সিসও হেসে বলল—তোমাকে আমরা খাদ্য দিয়েছিলাম, থাকতে দিয়েছিলাম। বিনিময়ে তুমি মূর্তি চুরি করে পালালে। তুমি যে জন্যে আমাদের গুহায় গিয়েছিলে তা তো করেছো। তবে এখন আবার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছো কেন? আন্তো বলল—তুমি যা বুদ্ধিমান তাতে আর একটা মূর্তিও তুমি উদ্ধার করতে পেরেছো। আমরা সেটাই নিতে এসেছি।

—আর কোনো মূর্তি আমরা পাইনি। ফ্রান্সিস বলল।

—মিথ্যে কথা। আন্তো বলল। ফ্রান্সিস বলল—ঐ মূর্তিটা কী করেছো?

—সেনাপতি ফেলকোকে দিয়েছি। আন্তো বলল।

—তাহলে আর সেনাপতি অন্য মূর্তিটা চাইবেন কেন? ফ্রান্সিস বলল।

—দুটো মূর্তিই তার চাই। একটা থাকবে সেনাপতির শিয়রে। অন্যটা থাকবে এই দুর্গের গীর্জায়। এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলল—আন্তো—আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের আল জাহিরি কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে। এখন রাজা গী দ্য লুসিগনানকে আমি বলেছি যে মহামতি নিওফিতসের হাতে তৈরি যীশুর মূর্তি আমি উদ্ধার করে আনবো। শেষ পর্যন্ত একটা উদ্ধার করলাম। সেটা তুমি বেইমানি করে চুরি করে নিয়ে পালালে। মহামতি নিওফিতসের হাতে তৈরি আর একটি একইরকম দেখতে মূর্তি আমরা উদ্ধার করেছি। রাজার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছে যে মূর্তি উদ্ধার করে দিলে তিনি আল জাহিরির কয়েদঘর থেকে

আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। দুটো মূর্তি উদ্ধার করেছি। অন্তত একটা মূর্তিও তো রাজাকে দিতে হবে। তা নইলে আমার বন্ধুদের, স্ত্রীর মুক্তি হবে না। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি যে কথাগুলি আমি বললাম তা সেনাপতি ফেলকোকে গিয়ে বলো। একটা মূর্তি তো পেয়েছেন আর একটা মূর্তি আর চাইবেন না।

—না—সেনাপতি ফেলকো দুটো মূর্তিই নেবেন। আন্তো বলল।

—তাহলে তো লড়াইয়ে নামতে হয়। কথাটা বলেই ফ্রান্সিস এক লাফে এগিয়ে এসে আন্তোর কোমরে ঝোলানো তরোয়ালের খাপ থেকে তরোয়ালটা এক ঝট্‌কায় খুলে নিল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে সৈন্যদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে দাঁড়াল। আস্তে বলল—পারিসি তুমি এখান থেকে সরে যাও। পারিসি দ্রুতপায়ে সরে গেল। আন্তো চিৎকার করে বলল—সৈন্যরা খতম করো এই ভিনদেশিটাকে। ফ্রান্সিসের রুদ্রমূর্তি দেখে সকলেই একটু ঘাবড়ে গেল। আন্তো চিৎকার করে বলে উঠল—আক্রমণ করো। ওর কাছেই নিওফিতসের মূর্তিটা রয়েছে। সেই মূর্তি আমাদের চাই। এবার চারজন সৈন্যই ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস নানা কৌশলে ওদের তরোয়ালের মার ঠেকাতে লাগল। নিজে আক্রমণ করল না। সৈন্য চারজন অল্পক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে শুরু করল। ফ্রান্সিস তখনও সমান তেজে তরোয়াল চালিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের বুকে বর্ম নেই মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর এখনও ওর দেহ অক্ষত। সৈন্যরা বুঝল ফ্রান্সিসকে সহজে কাবু করা যাবে না।

ফ্রান্সিস বুঝল সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস এটাই চাইছিল। এবার ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। এক সৈন্যের বাহুতে তরোয়ালের কোপ বসাল। সেই সৈন্যটা তরোয়াল ফেলে বাহু চেপে ধরল অন্য হাতে। তবু রক্ত পড়তে লাগল। একজন সৈন্যের শিরস্ত্রাণ তরোয়ালের মারে উড়িয়ে দিল। শিরস্ত্রাণ মাটিতে পড়ে গেল। এবার ফ্রান্সিস ওর মাথায় আস্তে তরোয়ালের কোপ বসাল। মাথা কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। আর একজনের পায়ে তরোয়াল চালাল। সে বেচারা দু'হাতে পা চেপে ধরে বসে পড়ল।

তরোয়াল চালানোর ফাঁকে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল আন্তো প্রান্তর দিয়ে ছুটে চলেছে।

আহত সৈন্যরা তখন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। দু'জন সৈন্য শুধু আহত হয়নি। দু'জন দূরে সরে গেল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—পারিসি পালাও। একথা বলেই ফ্রান্সিস ঘাসে ঢাকা প্রান্তর দিয়ে ছুটল। পেছনে পারিসি। কিছুটা ছুটে গিয়ে দেখল প্রান্তরের ওপাশ থেকে একদল সৈন্য ছুটে আসছে। ফ্রান্সিস বুঝল আন্তো দুর্গে গিয়েছিল সৈন্যদের ডাকতে। দু'জনে ছুটছে তখনও। সৈন্যরা ছুটে এসে দু'জনকে



ঘিরে ফেলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। এখন এতজনের সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি।

আন্তো এগিয়ে এল। হাঁপতে হাঁপাতে বলল—এবার মূর্তিটা দাও। ফ্রান্সিস বলল—তোমাকে মূর্তি দেব না। আমাদের সেনাপতির কাছে নিয়ে চল। মূর্তি আমি তাকেই দেব।

—বেশ চলো। আন্তো বলল। আন্তোর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল।

প্রান্তরের শেষেই দুর্গ। পাথর দিয়ে তৈরি। দুর্গের সদর দেউড়ির কাছে এল সবাই। বিরাট বন্ধ দরজা ঘর্ ঘর্ শব্দে খুলে গেল। সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর পারিসি দু'জনেই ঢুকল।

দুর্গের একটা ঘরে ওদের নিয়ে এল আন্তো। মশালের আলোয় দেখা গেল একটা পাথরের আসনে সেনাপতি ফেলকো বসে আছে। সভাঘরে শুধু ঢুকল আন্তো। পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর পারিসি। আন্তো একবার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে গ্রীক ভাষায় সব জানাল। সেনাপতি ফেলকো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। ও বলল—আমি গ্রীক ভাষা জানি না। আপনি যা বলবার স্পেনীয় ভাষায় বলুন। এবার সেনাপতি স্পেনীয় ভাষায় বলল—দুটো যীশুর মূর্তি তুমি উদ্ধার করেছো। একটা মূর্তি আন্তো নিয়ে এসেছে। অন্যটা তোমার কাছে আছে সেটা দাও। আমি স্থির করেছি একটা মূর্তি এই দুর্গের গীর্জায় বসাবো। ফ্রান্সিস বলল—

—এ কথা সত্য যে আমি দুটো মূর্তিই উদ্ধার করেছি। এর মধ্যে একটা আমার খুবই প্রয়োজন। একটা মূর্তি রাজা লুসিগনানকে দিতে পারলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্ত করতে পারবো। কারণ ওরা সবাই আল জাহিরির কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে! সেনাপতি ফেলকো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—না রাজাকে দেওয়া চলবে না। বোধহয় তোমরা জানো যে আমি রাজা গী দ্য লুসিগনানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। রাজাকে দেওয়া চলবে না। দুটো মূর্তিই আমার চাই।

—তাহলে আপনিই তাদের বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করুন। ফ্রান্সিস বলল।

—না আমি তা পারবো না। আল জাহিরি প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়েছে। তাই তাকে ক্রীতদাস কেনা বেচার হাট এখানে খুলতে দিয়েছি। সেনাপতি বলল।

—তাহলে আল জাহিরিকে বলুন ও যেন আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তি দেয়। ফ্রান্সিস বলল।

—আমি তা পারবো না। এটা ওর ব্যবসা। সেনাপতি বলল। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল। সেনাপতি বলল—মূর্তি দাও। ফ্রান্সিস অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলার দিকে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মূর্তিটা বের করল। এগিয়ে ধরল মূর্তি। সেনাপতি উঠে এগিয়ে এল। বুকে ক্রশ এঁকে মূর্তিটা নিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে।

ফ্রান্সিস ফিরে দাঁড়াল। পারিসিকে বলল—চলো। দু'জনে সেই ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পারিসি বলল—মূর্তিটা এভাবে দিয়ে দিলেন?

—উপায় কি। আমাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ তো দূরের কথা একটা ঢালও নেই। এ অবস্থায় লড়াইয়ে নামলে মৃত্যু অবধারিত। বেঁচে থাকলে সবই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—এবার কী করবেন?

—একটা সরাইখানায় থাকবো। মূর্তিটা গীর্জায় প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। তারপর মূর্তিটা চুরি করবো।

—পারবেন চুরি করতে? পারিসি বলল।

—সব ব্যবস্থা দেখবো তবেই বলা যাবে পারবো কিনা। ফ্রান্সিস বলল।

কেরিনিয়া নগরের পথ দিয়ে ফ্রান্সিস আর পারিসি চলল। কিছুদূর যেতেই রাস্তার ধারে একটা বড় সরাইখানা পেল। দু'জনে ঢুকল। এখানে বিদেশী লোকের সংখ্যাই বেশি। ঐ সরাইখানার একটা ঘরে দু'জনে আশ্রয় নিল।

তখন বিকেল। ফ্রান্সিস পারিসিকে বলল—পারিসি দুর্গে যাও। তুমি এই সাইপ্রাসের মানুষ। তোমাকে সন্দেহ করবে না। গীর্জায় প্রার্থনা করতে যাচ্ছো বললে কেউ বাধা দেবে না। গীর্জায় গিয়ে দেখবে নিওফিতসের তৈরি মূর্তিটা বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখলেই কাজে নামতে হবে। এবার দুর্গের গীর্জায় যাও। লক্ষ্য করো গীর্জায় তালা লাগানো হয় কি না।

পারিসি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে দুর্গের গীর্জায় চলল। দুর্গের সেই সদর দেউড়ির সামনে বেশি পাহারাদার নেই। পারিসি দরজা পার হল। একজন পাহারাদার জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছো?

—গীর্জায় প্রার্থনা করতে। পারিসি বলল।

—হুঁ—যাও। পাহারাদার আর কিছু বলল না।

গীর্জার ভেতরে তখন কিছু লোকজনের ভীড় হয়েছে। ভেতরে ঢোকার আগে পারিসি ভালো করে দরজার মোটা কড়াটা দেখল। না কোন তালা ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। তার মানে গীর্জাটার দরজা সারারাত খোলাই থাকে। এই গীর্জায় পারিসি আগেও দু' তিনবার এসেছে। দূর থেকেই দেখল আগের মূর্তিটা বেদীতে নেই। সেখানে নিওফিতসের হাতে তৈরি মূর্তিটা বসান হয়েছে। পারিসি যা জানতে এসেছিল তা সবই জানা হয়ে গেল। পারিসি গীর্জার আরো ভেতরে না ঢুকে বাইরে বেরিয়ে এল। চলল সরাইখানার দিকে।

ফ্রান্সিসকে সব বলল। ফ্রান্সিস খুশিতে লাফিয়ে উঠল। মূর্তিটা বেদীতে স্থাপন করা হয়েছে আর গীর্জার দরজায় তালা দেওয়া হয় না ভেজিয়ে রাখা হয়। এই দুটো তথ্য পেয়ে ফ্রান্সিস খুশি হল। বলল—পারিসি—আজ রাতেই হানা দিতে হবে।

দু'জনে সরাইখানায় ফিরে এল। সারাদিন শুয়ে বসে সময় কাটাল। কখন রাত হবে। কখন রাত গভীর হবে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময় সন্ধ্যে হল। দু'জনে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নিল। এখন রাত গভীর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা।

রাত বাড়তে লাগল। ফ্রান্সিস একসময় বলল—এবার চলো পারিসি।

দু'জনে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল। পথঘাট অন্ধকারে ডুবে আছে। ফ্রান্সিস অন্ধকারই চাইছিল। চলল দু'জনে। দু' চারবার জোর হাওয়া বয়ে গেল। ফ্রান্সিস আকাশের দিকে তাকাল। একটা তারাও দেখা গেল না। ঘন মেঘে আকাশ অন্ধকার।

দুর্গের কাছাকাছি আসতে প্রথমে ছুটে এল প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। তারপরই শুরু হল বৃষ্টি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়তে লাগল। দু'জনেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলল। সদর দেউড়ির দিকে যাওয়া যাবে না। নিশ্চয়ই পাহারাদার রয়েছে।

ফ্রান্সিস দুর্গের পেছন দিকে চলল। তখন প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দুর্গের পেছনে বিস্তৃত বন জঙ্গল। ফ্রান্সিস দুর্গের প্রাচীর দেখতে দেখতে চলল। দুর্গপ্রাচীরে কোথাও ফাটল নেই। দেখতে দেখতে একটা জায়গা এল। বিদ্যুতের আলোয় দেখল প্রাচীরের একটা চৌকোনো পাথর দেয়াল থেকে বেরিয়ে আছে। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখল দেয়ালের মাথার কাছে দুটো পাথর আলগা। ফ্রান্সিস ঠিক করল দুর্গে ঢুকতে হলে এখান দিয়েই ঢুকতে হবে। প্রচণ্ড ঝড়জলের মধ্যে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল—পারিসি—এখান দিয়েই দেয়াল ডিঙোতে হবে। ফ্রান্সিস এরকম ঝড়জলই চাইছিল। ও মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাল।

ফ্রান্সিস খুলে ঝুলতে থাকা চৌকোনো পাথরের টুকরোটা সরিয়ে নিচে ফেলল। জায়গাটায় খোঁদলমত হল। সেটায় পা রেখে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বুকের কাছে একটা পাথরের পাটায় হাত দিয়ে বুঝল—নড়বড় করছে। ফ্রান্সিস দু'তিনবার টানতেই পাটাটা খুলে এল। ওটা নিচে ফেলে দিল। এবার সেই খোঁদলটায় পা রেখে প্রাচীরের মাথার কাছে একটা বেরিয়ে থাকা পাথরের পাটা টানাটানি করে বুঝল ওটা শক্ত আছে। ফ্রান্সিস ঐ পাটায় ঝুলে পড়ে এক ঝটকায় প্রাচীরের মাথায় উঠে বসল।

এতক্ষণে বৃষ্টি কমে এসেছে। হাওয়ার সেই তেজও আর নেই। ফ্রান্সিস প্রাচীরের গায়ে দুটো পাথরের পাটা আলগা দেখল। ও তারই একটা ঠেলে দিল। যে খোঁদলমত হল সেটাতে পা রেখে লাফ দিয়ে নেমে এল। প্রাচীরের ওপাশে তো ঘন জঙ্গল। তাই এপাশের প্রাচীরের ধারে কাছে সেনাপতি ফেলকোর কোন পাহারাদার সৈন্য নেই। অবশ্য এই ঝড়জলে কোন পাহারাদারও এদিকে থাকতে আসেনি।

এতক্ষণে বৃষ্টি আরো কমে এসেছে। হাওয়ার দাপটও কমেছে।

পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ দিয়ে মাথা নিচু করে ফ্রান্সিস ছুটে চলল গীর্জাটার

দিকে। গীর্জাটা ঘুরে আসতে হবে গীর্জাটার দরজার কাছে। ফ্রান্সিস এবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথাও মশাল জ্বলছে না। শুধু সৈন্যাবাসে মশাল জ্বলছে।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে পাথরের প্রাঙ্গণটা পার হয়ে গীর্জার সদর দরজার কাছে এল। দেখল দরজায় দুটো বড় কড়া লাগানো কিন্তু তালা দেওয়া নেই। ফ্রান্সিস আস্তে দরজার একটা পাট খুলল। ক্যাঁচ্ কোঁচ্। অল্প শব্দ হল। ও গীর্জার ভেতরে ঢুকল। ভেতরে দু'পাশের পাথুরে দেওয়ালে দুটো নয় একটা মশাল জ্বলছে। বেদীতে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোয় যীশুখ্রীস্টের মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস দ্রুত বেদীর কাছে ছুটে এল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন হয়তো পাহারাদাররা পাহারা দিতে বেরুবে। মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। তারপর আলগোছে মূর্তিটা তুলে নিয়ে বুকের কাছে পোশাকের নিচে ঢুকিয়ে রাখল।

এবার পালানো। গীর্জার দরজার কাছে এল ফ্রান্সিস। দেখল সদর দেউড়িতে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। ওখানে জনা কয়েক সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। ওদিক দিয়ে পালানো যাবে না।

ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে অন্ধকারে ছুটল যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেইদিকে। পাথরখসা খোঁদলে পা রেখে রেখে প্রচীরের মাথায় উঠে এল। তারপর নিচের ঝোপ জঙ্গলে ঝপ্ করে নেমে এল। পারিসি গলা নামিয়ে বলল—মূর্তি আনতে পেরেছেন? ফ্রান্সিস হেসে বলল—এ তো ছেলেখেলা। চলো এবার। এ তল্লাটে আর থাকবো না।

অন্ধকার পথ দিয়ে দু'জনে সরাইখানায় এল। খাওয়া-দাওয়ার পর দু'জনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—পারিসি—পাফোসের মঠটা কোথায় জানো?

—জানি। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে। পারিসি বলল।

—কালকে ঐ মঠে যাবো। অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন দু'জনে চলল পাফোসের মঠের অধ্যক্ষের উদ্দেশে। মঠেই দু'জনে দেখা করল অধ্যক্ষের সঙ্গে। মূর্তি দেখাল। অধ্যক্ষ তো আনন্দে দিশাহারা। বললেন, পারিসি কী পরম পবিত্র মূর্তি তোমরা এনেছো, তোমরা বোধহয় জানো না। মহান পুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি যে খ্রীস্টিয় সমাজে কী অপরিসীম মূল্যবান তা বলে বোঝাতে পারবো না।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে পারিসি বলল, এঁর নাম ফ্রান্সিস। জাতিতে ভাইকিং। ইনিই উদ্ধার করেছেন এই মূর্তি। অধ্যক্ষ তখন ফ্রাসিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, বলো তুমি কি পুরস্কার চাও।

ফ্রান্সিস বলল, আমি কোনো পুরস্কার চাই না। আপনি দয়া করে এই মঠের একজন ধর্মযাজককে আমার সঙ্গে যেতে আদেশ দিন।

তা দিচ্ছি, কিন্তু সে তোমার সঙ্গে কোথায় যাবে? অধ্যক্ষ জানতে চাইলেন।

রাজা গী দ্য লুসিগনানের রাজসভায়। রাজা লুসিগনানের সঙ্গে আমার একটা শর্ত ছিল। ধর্মযাজক যেন বলেন আমি মূর্তি উদ্ধার করেছি এবার রাজা তাঁর শর্ত রাখুন।

মঠাধ্যক্ষ বললেন—বেশ তোমাকে একজন ধর্মযাজক নিয়ে যাবেন। এই মূর্তি এখন আমরা গীর্জার পবিত্রস্থানে রাখবো। কালকে রাজধানী নিকোশিয়া যাবার আগে তোমাদের দেওয়া বে। সেই রাতটা দু'জনে অধ্যক্ষের অতিথি হয়ে মঠেই রইল।

পরদিন সকালে মঠাধ্যক্ষ একটা বড় গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন ধর্মযাজককে সঙ্গে দিলেন। সেই ধর্মযাজক মূর্তিটা দু'হাতে বুকের কাছে ধ'রে রইলেন। গাড়িতে ধর্মযাজকের পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস, পারিসি উঠল। গাড়ি চলল রাজধানী নিকোশিয়ার দিকে।

দ্রুতগতিতে গাড়ি চলল। দুপুরের আগেই গাড়িটা নিকোশিয়া পৌঁছল। রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনেই রাজসভায় ঢুকল। চারপাশের লোকজন প্রহরীরা সবাই মাথা নুইয়ে ধর্মযাজককে সম্মান জানাল। রাজার মন্ত্রী অমাত্যরা আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধর্মযাজককে সম্মান জানাল। রাজাও সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধর্মযাজক হাত নেড়ে তাঁদের বসতে বললেন। সবাই বসলেন।

ধর্মযাজককে একটা আসনে বসতে দেওয়া হলো। ফ্রান্সিস আর পারিসি দাঁড়িয়ে রইল। ধর্মযাজক তাঁর বুকে ধরা যীশুর মূর্তিটা রাজাকে দেখিয়ে বললেন —রাজা—এই মূর্তিটিই মহাপুরুষ নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি মূর্তি। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বললেন—এর নাম ফ্রান্সিস। এরা দুঃসাহসী ভাইকিং। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আর প্রায় উপবাসে থেকে এই মূর্তিটা উদ্ধার করেছে। মহাত্মা নিওফিতসের আর একটি হাতে তৈরি মূর্তিও ফ্রান্সিস উদ্ধার করেছিল। কিন্তু আপনার বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকো সেটা লোক দিয়ে চুরি করিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। রাজা বললেন—কয়েকদিনের মধ্যে ফেলকোকে পরাস্ত করে আমি ঐ মূর্তিটাও উদ্ধার করবো। ধর্মযাজক এবার ফ্রান্সিসকে বললেন—তুমি রাজাকে কী বলবে বলেছিলে সেটা বলো। ফ্রান্সিস মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানিয়ে রাজাকে বলল—মহামান্য রাজা—আপনি কথা দিয়েছিলেন যে মূর্তি উদ্ধার করতে পারলে আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের আল জাহিরির হাত থেকে মুক্ত করে দেবেন। রাজা বললেন—হ্যাঁ বলেছিলাম। সমস্ত সাইপ্রাসবাসীরা আজ তোমার জন্য এক অমূল্য সম্পদের অধিকারী হল। তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। একটু থেমে বললেন—কিন্তু মুস্কিল হয়েছে আমার ভূতপূর্ব সেনাপতি ফেলকো বিদ্রোহ করে এর মধ্যে কেরিনিয়ার দুর্গ দখল করে ওর রাজত্ব কায়েম করেছে। আমার লোকজন আর এখন কেরিনিয়ায় ঢুকতে পারবে না।

—তাহলে আমার বন্ধুরা কীভাবে মুক্তি পাবে। ফ্রান্সিস বলল।

—কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কেরিনিয়া আক্রমণ করে দখল করবো। তখন তোমার বন্ধুদের মুক্ত করবো। রাজা বললেন।

—ততদিনে ক্রীতদাসের হাটে হয়তো আমার স্ত্রী আর বন্ধুরা বিক্রি হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। রাজা বললেন—সেজন্যেই আমি স্থির করলাম আমার বর্তমান সেনাপতি তোমাকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে কেরিনিয়ার সীমান্তে রেখে আসবে। তুমি কেরিনিয়ায় ঢুকে বন্ধুদের খোঁজখবর করতে পারবে। তুমি বিদেশী। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

—কিন্তু আল জাহিরি আমাকে দেখলেই বন্দী করবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যতটা সম্ভব আত্মগোপন করে কাজ সারবে। রাজা বললেন।

—বেশ তাই হবে। ফ্রান্সিস বলল। এবার রাজা বললেন—

—এবার বলো তুমি যে মূর্তি উদ্ধার করেছো তার বিনিময়ে কি চাও?

—আমি দশটি স্বর্ণমুদ্রা চাই। প্রয়োজনে আমি আংটি বন্ধক রেখেছিলাম। সেটা ছাড়াতে হবে। আর কয়েকটা দিন আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হবে। কাজেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা আমার খুবই প্রয়োজন।

—বেশ। আর কিছু চাই? রাজা বললেন।

—না। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি একটা অমূল্য জিনিস উদ্ধার করেছো। তুমি যা খুশি চাইতে পারো। রাজা বললেন।

—না। মান্যবর রাজা আমার কিছুই চাই না। শুধু আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। রাজা একজন প্রহরীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। রাজা তাকে কিছু নির্দেশ দিলেন। একটু পরেই প্রহরীটি ফিরে এসে রাজাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। রাজা সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সিসকে দিলেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে ফ্রান্সিস ও পারিসি বেরিয়ে এল। পারিসি বলল—ফ্রান্সিস আমার কাজ তো শেষ। আমি এবার বাড়ি যাবো। আমার বুড়ি মা একা আছে।

—ঠিক আছে—তুমি যাও। আমার সঙ্গে থেকে অনেক কষ্ট সহ্য করেছো। এই কথা বলে ফ্রান্সিস পারিসির ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল। পারিসিও হাতে জোরে চাপ দিল। তারপর চলে গেল। পারিসি ওর মার কথা বলল। তাতেই ফ্রান্সিসের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। ওর চোখ দুটো ভিজে উঠল। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখল সামনেই রাজবাড়ির গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে সেনাপতি বসে আছে। সেনাপতি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসকে গাড়িতে উঠে আসতে বলল। ফ্রান্সিস গাড়িতে উঠে সেনাপতির সামনের আসনে বসল। ফ্রান্সিস বলল—কেরেনিয়া তো বেশ দূর। পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত গভীর হয়ে যাবে।

—আমিও সেটাই চাই। রাতের অন্ধকারেই তোমাকে রেখে আসবো। সেনাপতি বলল।

গাড়ি চলল কেরিনিয়া বন্দর-শহরের উদ্দেশে। কথা প্রসঙ্গে সেনাপতি বলল—এই মওকায় তুমি সোনাদানা চাইলে রাজা তাই দিতেন। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সোনাদানার ওপর কোনো লোভ নেই আমার। আমার এখন সবচেয়ে প্রয়োজন বন্ধুদের মুক্তি। আর কিছু না। কথাটা বলেই ফ্রান্সিসের মনে পড়ল ওদের বিয়ের সেই দামি আংটিটা এক স্বর্ণকারের কাছে বন্ধক আছে। ফ্রান্সিস বলল—সেনাপতি মশাই—একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

—বলো কী রকম সাহায্য? সেনাপতি বলল।

—একজন স্বর্ণকারের কাছে অভাবের সময় একটা আংটি বন্ধক রেখেছি। ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো—স্বর্ণকারের দোকানটা কোথায় দেখিয়ে দাও। সেনাপতি বলল।

—চলুন দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

দোকানটার সামনে এসে ফ্রান্সিস সেনাপতিকে দোকানটা দেখাল। সেনাপতি গাড়ি থামাতে বলল। গাড়ি থামল। সেনাপতি কোচওয়ানকে বলল—স্বর্ণকারকে ডেকে নিয়ে আয়। একটু পরেই কোচয়ানের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে স্বর্ণকার এল। সেনাপতি ডাকছেন। ভয় তো হবেই। সেনাপতি ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—এর একটা আংটি তোমার কাছে বন্ধক আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। স্বর্ণকার ভীতস্বরে বলল।

—ঐ আংটিটা নিয়ে এসো। সেনাপতি বলল।

—এক্ষুণি আনছি—স্বর্ণকার পড়িমরি করে ছুটল। আংটিটা নিয়ে ফিরে এল। সেনাপতি আংটিটা হাতে ফ্রান্সিসকে বলল—এটাই তোমার আংটি?

—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস বলল। সেনাপতি আংটিটা ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস আংটিটা আঙ্গুলে পরতে পরতে বলল—কিন্তু আমাকে কত দিতে হবে। সেনাপতি হাত তুলে ফ্রান্সিসকে থামাল। কোচোয়ানকে বলল—গাড়ি চালা। গাড়ি চলল।

গাড়িতে বসে ফ্রান্সিসের সঙ্গে সেনাপতির সামান্য কথাই হল।

তখন রাত গভীর। অন্ধকারে একটা বিরাট গাছের নিচে এসে সেনাপতি গাড়ি থামাতে বলল। কোচোয়ান গাড়ি থামাল। সেনাপতি বলল—এখান থেকে কেরিনিয়া শুরু হল। আমরা আর যাবো না। তুমি নেমে যাও।

ফ্রান্সিস গাড়ি থেকে নেমে এল। অন্ধকারে উত্তরমুখো কেরিনিয়া বন্দরের উদ্দেশে চলল।

কেরিনিয়া বন্দর শহরে যখন ঢুকল তখন পূব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল। ফ্রান্সিস আগেই জাহাজঘাটার দিকে গেল না। খুঁজে খুঁজে একটা সরাইখানায় উঠল। সকালের জলখাবার খেয়েই শুয়ে পড়ল। মাথায় চিন্তা—কীভাবে বন্ধুদের মুক্ত করবে। কে জানে এই ক'দিনের মধ্যেই মারিয়া আর বন্ধুদের আল জাহিরি ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে দিয়েছে কিনা। এইসব ভাবতে ভাবতে রাত জাগার ক্লান্তিতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে স্নান খাওয়া সারল। তারপর তৈরি হয়ে গেল। কেরিনিয়া দুর্গ জাহাজঘাটা থেকে দূরে। কাজেই বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকোর সৈন্যদের নজরে পড়ার সম্ভাবনা নেই। বাকি রইল আল জাহিরি আর তার সৈন্যরা। কয়েদঘরের আড়াল থেকে সব দেখতে হবে।

ফ্রান্সিস যখন জাহাজঘাটার কাছে পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়েছে। দূর থেকেই দেখল জাহাজঘাটায় ওদের জাহাজটা নোঙর করে আছে। আরো তিনটে জাহাজ আছে। কিন্তু আল জাহিরির জাহাজটা নেই। ফ্রান্সিসের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল। তাহলে কি ওর বন্ধুদের ও মারিয়াকে ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করে আল জাহিরি ওর সৈন্যদের নিয়ে জাহাজ চালিয়ে চলে গেছে? ফ্রান্সিস কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না। সত্যি সত্যি এখানে ঠিক কী ঘটেছে।

ফ্রান্সিস বাড়িঘরের আড়ালে আড়ালে লম্বাটে কয়েদঘরটার কাছে এল। কয়েদঘরের আড়াল থেকে নজর রাখল ওদের জাহাজের ওপর। জাহাজের ডেক-এ কয়েকজন ভাইকিং শুয়ে বসে আছে এটা দেখল। আবছা আন্দাজে চিনতেও পারল না। কিন্তু ওরা বন্দী না মুক্ত এটা ঠিক বুঝল না।

বেশ কিছুক্ষণ কয়েদঘরের আড়াল থেকে ফ্রান্সিস নজর রাখল। হঠাৎ বন্ধুদের সামনে যাওয়াটা উচিত হবে না। বন্ধুদের দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে যে ওরা বন্দী নয়। বন্দী হলে নিচে কয়েদঘরে থাকতো ওরা। ডেক-এ নয়।

ফ্রান্সিস এসব ভাবছে তখনই দেখল ধনুক-তীর কাঁধে শাঙ্কো জাহাজের পাটাতন দিয়ে নেমে আসছে। এবার ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে বন্ধুরা বন্দী হয়ে নেই।

শাঙ্কো শিকারের জন্যে কয়েদঘরের ওপাশে বড় জঙ্গলটার দিকে যাচ্ছে। শাঙ্কো কয়েদঘর ছাড়িয়ে আসতেই ফ্রান্সিস ছুটে ওর সামনে গেল। ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। কাঁধের ধনুক ফেলে ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কো কিছুতেই ফ্রান্সিসকে ছাড়ছে না। তখন ফ্রান্সিস ওর পিঠে আস্তে চাপড় মেরে বলল—এই শাঙ্কো—পাগলামি করো না। শাঙ্কো হাত আলগা করল। ফ্রান্সিস বলল—কী ব্যাপার বলো তো? আল জাহিরি তার জাহাজ পাহারাদার সৈন্যরা কোথায় সব?

—মাঝ সমুদ্রে নিজে একা আল জাহিরি তার জাহাজে ঘুরপাক খাচ্ছে। শাঙ্কো বলল।

—কিছুই বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বলল। বলো—

—জাহাজে চলো সব বলছি। তার আগে বলো তুমি কি যীশুর মূর্তি উদ্ধার করতে পেরেছো? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—একটা নয় দুটো মূর্তি। তার একটা বিদ্রোহী সেনাপতি ফেলকো চুরি করে নিয়েছে। অন্যটা আমি আর পারিসি রাজা গী দ্য লুসিগনানের হাতে দিয়েছি। শাঙ্কো চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো। ফ্রান্সিসও গলা মেলাল। তারপর দু'জনে ওদের জাহাজের দিকে চলল।

জাহাজের পাটাতনে ফ্রান্সিসরা পা রাখতেই ডেক-এ শুয়ে বসে থাকা ভাইকিং বন্ধুরা ওদের দেখল। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—ফ্রান্সিস এসেছে। নিচের কেবিনঘর থেকে সবাই ছুটে এসে ডেক-এ উঠতে লাগল। হ্যারি ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার শরীরটা বেশ রোগা হয়ে গেছে। ভাবল—মারিয়াকে এই অভিযানে আনা উচিত হয়নি। ছোটবেলা থেকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আদরে মানুষ হয়েছে মারিয়া। ওর পক্ষে এত ধকল পোহানো সম্ভব নয়। ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল এখন আর ওসব ভেবে কি লাভ। ওদিকে বন্ধুরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল —ও—হো—হো।

মারিয়া হাসতে হাসতে এসে ফ্রান্সিসের একটা হাত ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—এবারও আমার হাত খালি। তবে যদি আর এক সপ্তাহ্ এখানে অপেক্ষা করতে পারো তবে মহাত্মা নিওফিতসের নিজের হাতে তৈরি একটা যীশুর মূর্তি পেতে পারি।

—না—মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—আমরা এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরবো।

—বেশ—তোমরা যেমন চাও। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংরা চিৎকার করে উঠল—ও—হো—হো। তারপর একদল ছুটল নোঙর তুলতে অন্যদল পাল খুলে দিতে আর একদল দাঁড়ঘরে দাঁড় টানার জন্যে। এবার দেশে ফেরা। জাহাজ চালাতে হবে যত দ্রুত সম্ভব।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসকে বলল মারিয়ার অসুস্থতার কথা আল জাহিরির সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা সবই বলল। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—এখন তোমার শরীর কেমন? মারিয়া হেসে বলল—তুমি এসেছো—আমার দুশ্চিন্তা কমল—এবার আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হবো। তুমি কিছ্ছু ভেবো না।

ততক্ষণে জাহাজের সব পাল খুলে দেওয়া হয়েছে। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে দাঁড় টানছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ পূর্ণবেগে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে চলল।

এর পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি ঃ—

সোনার ঘণ্টা, হীরের পাহাড়, মুক্তোর সমুদ্র, তুষারে গুপ্তধন, রূপোর নদী, মনিমাণিক্যের জাহাজ, বিষাক্ত উপত্যকা, চিকামার দেবরক্ষী চুনীপান্নার রাজমুকুট, কাউন্ট রজাবের গুপ্তধন, যোদ্ধা মূর্তি রহস্য, রাণীর রত্নভাণ্ডার

মাজোরকা দ্বীপে ফ্রান্সিস

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি। ফ্রান্সিসরা জাহাজে করে ফিরছে সেই দ্বীপ থেকে। ফ্রান্সিসরা জাতিতে ভাইকিং। এই ভাইকিংরা বীরের জাতি। দুঃসাহসী নির্ভীক। জাহাজ চালাতে সুদক্ষ। সমুদ্রের ধারেই ওদের দেশ বলে সমুদ্রের সঙ্গে ওদের যেন নাড়ির যোগ। ভাইকিংদের রাজার যিনি মন্ত্রী—ফ্রান্সিস তাঁরই ছেলে। রাজার মেয়ে রাজকুমারী মারিয়া ফ্রান্সিসের স্ত্রী। হ্যারি ওর প্রাণের বন্ধু। বিস্কো, তীরন্দাজ শাঙ্কো, পেড্রো আর সব ভাইকিং বন্ধুদের নিয়ে ফ্রান্সিস মারিয়া ফিরে আসছিল নিজেদের দেশে।

ফ্রান্সিস আর ওর দুঃসাহসী বন্ধুরা কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অসীম ধৈর্য, অটল সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিয়ে এসেছে বিরাট সোনার ঘন্টা, হাঁসের ডিমের মতো বড় মুক্তো আরো মূল্যবান কত কিছু। চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে নক্শা, ছড়ার সূত্র ধরে উদ্ধার করেছে গুপ্তধন-ভাণ্ডার। ফ্রান্সিসদের এই বীরত্বের কাহিনী নিয়ে ঐ দেশের চারণকবিরা গান বেঁধেছে। সারা দেশে ওরা সেই গান গেয়ে বেড়ায়।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাস বেগবান। জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। দাঁড় বাইতে হচ্ছে না ভাইকিংদের। শান্ত সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে দ্রুত চলেছে ফ্রান্সিসদের জাহাজ। ওদের দেশের দিকে।

দিন তিনেক কাটল। সেদিন বিকেলবেলা। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। মাস্তুলের ওপর নিজের জায়গায় ছিল নজরদার পেড্রো।

হঠাৎ পেড্রো চেঁচিয়ে বলল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। জাহাজের ডেক-এ যে কয়েকজন ভাইকিং শুয়ে-বসে বিশ্রাম করছিল তাদের একজন ছুটল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। ফ্রান্সিসকে খবরটা দিতে হবে।

খবর পেয়ে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর হ্যারি জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়াল। তাকাল দূর দিগন্তের দিকে। দিগন্তে সূর্যাস্তের লালচে আলো। তার নিচে ছোট ছোট টিলার মতো দেখা গেল। সে সবের রং এখন বোঝার উপায় নেই। ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বলল—কী করবে এখন? হ্যারি বলল—জায়গাটা কোন দ্বীপ না দেশ তা তো বুঝতে পারছি না। এক্ষুণি অন্ধকার নামবে। এখান থেকে আর কিছুই দেখা যাবে না।

মারিয়া বলল—কিন্তু আমরা কোথায় এলাম সেটা জানতে হলে তো নেমে খোঁজ নিতে হবে।

—হুঁ। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর বলল—রাত হয়ে ভালোই হল। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে নৌকো নিয়ে ডাঙায় নামবো। মানুষজন কাউকে তো পাওয়া যাবে। তা হলেই জানা যাবে আমরা কোথায় এলাম। আমাদের দেশই বা কতদূরে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিস পোশাক পরে তৈরি হল। ঢোলা হাতা হাঁটুঝুল পোশাক। কোমরে চামড়ার ফেট্টি। তরোয়াল গুঁজল কোমরের ফেট্টিতে। এবার

মারিয়া বলল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস বলে উঠল—পাগল হয়েছো। কীরকম জায়গা কীরকম লোকজন থাকে কিছুই জানি না। এ অবস্থায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায়? মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—দেখ, এটা ভূমধ্যসাগর এলাকা। যতদূর জানি—এই এলাকায় কোনো বন্য জাতি বাস করে না।

ফ্রান্সিস বলল—বন্য জাতির মানুষ অনেক ভালো। তারা সভ্যজাতির মতো হিংস্র হয় না।

—তা হোক। তোমাদের ভাগ্যে যা ঘটবে আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বুঝল মারিয়াকে না নিয়ে গেলে দুঃখ পাবে। ভাবল—আমরা তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছি না। শুধু জায়গাটার নাম জানতে যাচ্ছি। বলল—বেশ চলো।

মারিয়া খুশিতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল।

জাহাজ থেকে দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা একে একে জাহাজের গায়ে বাঁধা একটা নৌকোয় নেমে এল। মারিয়া আর হ্যারি নৌকোটার মাঝখানে বসল। দাঁড় হাতে একদিকে বসল ফ্রান্সিস অন্যদিকে শাঙ্কো। শাঙ্কো তীর-ধনুক খুলে রাখল। দাঁড়টা হালের মতো ধরল। নৌকোর গতি ঠিক রাখতে হবে। জাহাজে বাঁধা দড়ি খুলে দিল ফ্রান্সিস। জাহাজের গায়ে দাঁড় দিয়ে ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা সরিয়ে আনল। দাঁড় বাইতে লাগল। নৌকো চলল তীরভূমির দিকে।

নৌকো চলেছে। আকাশে সাদাটে মেঘের মন্থর চলাফেরা। চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। সেই স্বল্প আলোয় কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। ছোট ছোট ঢেউয়ের দোল খেতে খেতে নৌকো তীরের কাছাকাছি এল। দেখা গেল তীরের কাছে একটা জাহাজ নোঙর করা। জাহাজটার সিঁড়ির মুখে কাচঢাকা আলো জ্বলছে। তবে ডেক জনশূন্য। তীরভূমির বালিয়াড়ি টানা গিয়ে উঁচু হয়ে গেছে। কয়েকটা খুঁটিতে জাল টাঙানো। শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকটা মাছ ধরার নৌকোও আছে। ফ্রান্সিস দাঁড় টানা বন্ধ করল। বলল, হ্যারি, মনে হচ্ছে জাহাজটায় কেউ নেই। তবু এদিক দিয়ে তীরে উঠবো না।

—জাহাজটায় কোনো পতাকা উড়ছে না। কোন্ দেশের কাদের জাহাজ বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি জাহাজটা দেখতে দেখতে বলল।

—বাঁ দিকে ছোট টিলাটা ঘেঁষে আমরা তীরে উঠবো। ফ্রান্সিস বলল।

নৌকো বাঁ দিকে ঘোরানো হল। টিলাটার কাছে এসে দেখা গেল এবড়ো-খেবড়ো পাথরের মধ্যে দিয়ে ছোট্ট একটা খাঁড়িমত। ফান্সিস খাঁড়ির মধ্যে নৌকো ঢোকাল। একটু এগোতেই দেখা গেল সামনে বিস্তৃত বেলাভূমি। বেশ দূরে খুব অস্পষ্ট কিছু বাড়িঘর দেখা গেল। বোঝা গেল ওটা জেলেপাড়া। ফ্রান্সিস বলল, চলো, ঐ জেলেপাড়ায় গিয়ে খোঁজখবর করি। হ্যারি মাথা নেড়ে বলল, না ফ্রান্সিস। খোলা বালিয়াড়ি দিয়ে আমরা যেতে গেলে জাহাজের লোকদের নজরে পড়ে যাবো।

—কিন্তু জাহাজে তো কোন মানুষজনই দেখা গেল না। মারিয়া বলল।



—উঁহু, তবু সাবধান হতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো বলল, এক কাজ করি। তীর-ধনুক নিয়ে আমি একা যাই। বালির ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে যাবো। জাহাজে কেউ থাকলেও দেখতে পাবে না।

—ঠিক আছে। শাঙ্কোই যাক। হ্যারি বলল। শাঙ্কো নৌকোয় উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তীর-ধনুক নিচ্ছে তখনই মারিয়া একটু গলা চড়িয়ে উঠলো—দ্যাখো তো, কয়েকজন লোক বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ছুটে এদিকে আসছে। ফ্রান্সিসরা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল—একজন লোক বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। ওর পেছনেও ছুটে আসছে কয়েকজন। একটু এগিয়ে আসতেই দেখা গেল সামনের লোকটা প্রাণপণে ছুটে আসছে। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। ওর পেছনে তিনজন লোক খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। এবার ওদের চিৎকার শোনা গেল। দেখা গেল ওদের গায়ে বর্ম। সৈনিকের পোশাক পরণে। ওরা কৃষ্ণকায়। মাথার চুল কোঁকড়া। বলিষ্ঠদেহী। হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এরা বোধহয় মূর সৈনিক। যে লোকটাকে ওরা আক্রমণ করেছে সে বোধহয় এ দেশীয় নিরীহ জেলে। পরণে এখানকার জেলেদের ঢোলা পোশাক। মূর সৈন্যরা জেলেটাকে হয় মেরে ফেলবে নয়তো মারাত্মকভাবে আহত করবে। জেলেটাকে বাঁচাও। ফ্রান্সিস ডাকলো—শাঙ্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক তুলে নিল। ধনুকে তীর পরিয়ে ছিলা টানলো। কিন্তু নৌকোটা বেশ দুলছে। নিশানা ঠিক রাখা মুশকিল। ফ্রান্সিস বলল—মেরো না। আহত কর। শাঙ্কো তীর ছুঁড়ল। তীরটা জেলের পেছনেই প্রথম সৈন্যটির ডান কাঁধে বিঁধে গেল। সৈন্যটি তরোয়াল ফেলে দিল। বাঁ হাতে কাঁধ চেপে বালির ওপর বসে পড়ল। শাঙ্কো আর একটা তীর ছুঁড়ল। কিন্তু নিশানা ফস্‌কে গেল। আবার ছুঁড়ল। তীর বিঁধল পরের সৈন্যটির ডান পায়ের উরুতে। সেও বসে পড়ল। পরের সৈন্যটি দাঁড়িয়ে পড়ল। চারদিকে তাকাতে লাগল। বুঝে উঠতে পারল না, কোন্ দিক থেকে কে তীর ছুঁড়ছে। তবু ভয় পেল। দাঁড়িয়ে রইল। আর এগিয়ে এল না। দ্বিতীয় সৈন্যটি উরু থেকে তীরটা টেনে খুলে ফেলল। তারপর বালিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। প্রথমটিও তীর টেনে খুলে বালিতে শুয়ে পড়ল।

জেলেটি ছুটতে ছুটতে একবার পেছন ফিরে দেখল। তারপর ছুটতে ছুটতে ফ্রান্সিসদের দিকে আসতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ছোট্ট খাঁড়িটায় নৌকো ঢুকিয়েছিল—সেই খাঁড়িটায় ঢুকল জেলেটা। ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরাতে সাঁতরাতে কিছুটা এসেই ফ্রান্সিসদের নৌকোটা দেখে হাত বাড়িয়ে নৌকোটা ধরতে গেল। ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে ওর বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। লোকটা ভেবেছিল নৌকোটা খালি। ও চমকে উঠে হাত ছাড়াতে গেল। ফ্রান্সিস হাতটা জোরে চেপে ধরে স্পেনীয় ভাষায় বলল—ভয় নেই—আমরা তোমার বন্ধু। লোকটা বুঝল। আর হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল না। হ্যারি বলল—তুমি কে? লোকটা তখনও ভীষণ হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে স্পেনীয় ভাষায় বলল—আমি সালভা। আমাকে

বাঁচান।

—কোন ভয় নেই—নৌকোয় উঠে এসো। ফ্রান্সিস বলল। তারপর টেনে সালভাকে নৌকোয় তুলে নিল। অল্প চাঁদের আলোয় দেখা গেল সালভার গায়ে এখানকার জেলেদেরই পোশাক তবে বুকের সামনেটা কাটা। খোলা বুকে তরোয়ালে কাটার দাগ। হাঁফাতে হাঁফাতে সালভা বলে উঠল—শিগগির নৌকো ছেড়ে দিন। ঐ সৈন্যরা এখুনি এসে পড়বে।

—ভয় নেই। দু'জন সৈন্যকে আমরা তীর ছুঁড়ে আহত করেছি।

—ওরা এক্ষুণি আসতে পারবে না। হ্যারি বলল।

—কিন্তু ওদের দুর্গ কাছেই। ওরা নিশ্চয়ই খবর দেবে। তখন আরো সৈন্য আসবে। সালভা বলল।

—হুঁ, ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল। তারপর হাতের দাঁড়ে পাশের এবড়ো-খেবড়ো পাথর ঠেলে নৌকো ছোট্ট খাঁড়িটা থেকে বের করে আনল।

নৌকো চলল ফ্রান্সিসদের জাহাজের দিকে। হ্যারি বলল—ওরা মূর সৈন্য তাই না?

—হ্যাঁ, সালভা বলল। তারপর বলল—আপনারা আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আপনাদের পরিচয়—

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস নৌকো চালাতে চালাতে বলল।

—ও—আপনারা তো বীরের জাতি। এবার জানলাম—আপনাদের মনও উদার। সালভা বলল। তারপর বেশ চিন্তিত স্বরে বলল—আমি তো এখন তীরে যেতে পারবো না।

—একটু দূরেই আমাদের জাহাজ নোঙর করা আছে। তুমি ঐ জাহাজেই থাকবে। ফ্রান্সিস নৌকো চালাতে চালাতে বলল।

হ্যারি বলল—আচ্ছা সালভা—এটা কি একটা দ্বীপ না কোন দেশ?

—এটা মাজোরকা দ্বীপ—বালেরিক দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ। এই তীরভূমির নাম পালমা নোভা। এখানে জেলেদের বস্তীতে থাকি। সালভা বলল।

নৌকো চলেছে। রাত শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে জোর ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। ভেজা পোশাকে সালভা দু'হাত বুকে জড়িয়ে ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল। মারিয়া লক্ষ্য করল সেটা।

যে কম্বলমত মোটা কাপড়টায় মারিয়া বসেছিল সেটা তুলে নিয়ে ও সালভার গায়ে জড়িয়ে দিল। সালভা মুখ তুলে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। তখনই শাঙ্কো বলে উঠল—ফ্রান্সিস—আগুন। দূরে তীরভূমি ছাড়িয়ে আগুনের হল্‌কা উঠছে দেখা গেল। সালভা ফুঁপিয়ে উঠল, বলল—হা মেরী—মূর সৈন্যরা আমাকে ধরতে না পেরে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কাঠ আর পাথরে তৈরি আমাদের বস্তীটাই পুড়িয়ে দেবে ওরা। সালভা মাথা নিচু করে ফোঁপাতে লাগল। ওদিকে দ্বীপের ধোঁয়াটে আকাশ আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে নৌকো জাহাজের কাছে এল। রেলিঙ ধরে বিস্কোওরা ফ্রান্সিসদের একে একে জাহাজে তুলে নিল। ফ্রান্সিস বলল—বিস্কো, এর নাম সালভা। একে তোমাদের কেবিন-ঘরে নিয়ে যাও। শুকনো পোশাক দাও। গরম কিছু খেতে দাও। বিস্কো সালভাকে ডেকে নিল। চলল ওদের কেবিন-ঘরের দিকে। পূব দিকের আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল।

একটু বেলায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। মারিয়া জেগেই ছিল তখন। খাবার নিয়ে এল। দু'জনে খাচ্ছে তখন হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল— সালভা কেমন আছে?

—ভালো। খেয়েদেয়ে, জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। হ্যারি বলল।

—সালভাকে একবার ডাকো তো হ্যারি। মূর সৈন্যরা ওকে আক্রমণ করেছিল কেন—সেটা জানতে হয়। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি চলে গেল। একটু পরেই সালভাকে নিয়ে এল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—বসো সালভা। সালভা বিছানাতেই বসল। মারিয়া হেসে বলল—এখন কেমন আছো? সালভাও হাসল। বলল—আপনাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ রইলাম। ফ্রান্সিস বলল—ওসব কথা থাক। তোমাকে মূর সৈন্যরা আক্রমণ করেছিল কেন? তোমার বুকই বা তরোয়ালে কাটা কেন? সালভা একটু চুপ করে থেকে বলল—ঐ মূর সৈন্যদের রাজাই বলুন—অথবা দলপতিই বলুন—তার নাম আল আমিরি। সে কিন্তু জাতিতে মূর নয়—আরবী। দিন পনেরো আগে আল আমিরি জাহাজে চড়ে ঐ মূর সৈন্যদের নিয়ে এই পালমা মোভার দুর্গটা দখল করে নেয়।

—আগে দুর্গটা কার অধিকারে ছিল? হ্যারি বলল।

—মাজোরকার বর্তমান রাজা তৃতীয় জেমসের। আল আমিরি এমনভাবে সৈন্য দিয়ে পালমা নোভা ঘিরে রেখেছে যে রাজা জেমস এখনও জানেন না যে এই দুর্গটা আল আমিরি দখল করে নিয়েছে। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—আমি রামন লালের শিষ্য ছিলাম। রামন লাল আমাদের ঘরে মারা যান। তাঁর মৃতদেহ কবরের ব্যবস্থার জন্যে আমি গাড়িতে নিয়ে রাজধানী পালমায় যাচ্ছিলাম। দুর্গের কাছেই ধরা পড়লাম আল আমিরির সৈন্যদের হাতে। আল আমিরি খবর পেয়ে এল। মৃত রামন লালের জোব্বার পকেটে রামন লালের পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় খণ্ডটা পেল। সন্দেহ করল আমি প্রথম খণ্ডটা লুকিয়ে রেখেছি। চাইল প্রথম খণ্ডটা। প্রাণ বাঁচাতে বললাম বাড়িতে আছে। তিনজন সৈন্যের পাহারায় বাড়িতে এলাম। তারপর ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালালাম। ছুটলাম সমুদ্রের দিকে। ঠিক করেছিলাম নৌকোয় চড়ে পালাবো। এই বেলাভূমিতেই আমরা মানুষ। বালির ওপর দিয়ে আমাদের মত দ্রুত কেউ ছুটতে পারে না। কিন্তু সৈন্য তিনজনের নজরে পড়ে গেলাম। ওরা তরোয়াল খুলে চিৎকার করতে করতে আমাকে ধাওয়া করলো। তার পরের ঘটনা তো জানেনই। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—রামন লাল কে? তাঁর পাণ্ডুলিপি—মানে—সমস্ত ব্যাপারটা বলো তো। সালভা বলল—সে অনেক কথা। প্রথমে বলি আমি কি করে রামন লালের শিষ্য হলাম। একটু থেমে

বলতে লাগল—জেলের ছেলে আমি। কিন্তু জেলেবস্তীর অন্য ছেলেদের মত আমি ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনোর প্রতি ভীষণ আগ্রহ বোধ করতাম। এখানকার দুর্গ ছাড়িয়ে বেশ দূরে একটা ভাঙাচোরা ঘরে একজন মৌলভী থাকতেন। তাঁর কাছেই আমি আরবী ভাষা শিখতে শুরু করি। একদিন মৌলভী বললেন—আমি যা জানি সবই তোমাকে শিখিয়েছি। যদি সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে রাজধানী পালমা যাও। যদি রামন লালের শিষ্যত্ব লাভ করতে পার তাহলে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী সমস্ত শাস্ত্রেই তুমি জ্ঞানী হবে। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—রাজধানী পালমা গেলাম। কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে শিক্ষাগুরু রামন লালের নজরে পড়লাম—সে এক কাহিনী। যা হোক—শিক্ষাগুরু রামন লাল আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদের একটি অংশে তাঁর শিষ্যদের পড়াতেন। একটু থেমে সালভা বলতে লাগল—এই রামন লালের জীবন বড় বিচিত্র। সামান্য ফাইফরমাস খাটার চাকর ছিলেন বালকবয়সে। পরে তিনি নিজের যোগ্যতায় রাজা দ্বিতীয় জেমসের রাজসভার সম্মানিত অমাত্য হয়েছিলেন। গ্রীক শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। মহাপণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজা দ্বিতীয় জেমস আরো জ্ঞানলাভের জন্যে তাঁকে সিরিয়া মিশর পূর্ব দেশেও পাঠিয়েছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে ফিরে এলেন। পালমায় রইলেন বছর কয়েক। তারপর হঠাৎ একদিন দেশত্যাগ করলেন সব সম্মান যশ অর্থ পেছনে ফেলে। সালভা থামল।

—তারপর? হ্যারি বলল। সালভা বলল—

—রামন লাল নানা শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালকেমি অর্থাৎ অপ-রসায়নেরও চর্চা করতেন।

মারিয়া বলল—হ্যাঁ, আমাদের দেশেও কেউ কেউ এই অপ-রসায়নের চর্চা করেন। সীসা, তামা, পারদ সোনায় রূপান্তরিত করা যায় কীভাবে—এই অ্যালকেমির গবেষকরা তারই গবেষণা করেন।

—আপনি ঠিক বলেছেন। সালভা বলল—প্রথমবার রামন লাল অনেক কিছু লিখে আনেন। এটাকেই বলা হয় রামন লালের পাণ্ডুলিপির প্রথম খণ্ড। কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি কোথায় গোপনে রেখে তিনি দেশত্যাগ করেন এটা তিনি কাউকে জানিয়ে যাননি। সালভা থামল। ফ্রান্সিস এতক্ষণে বেশ আগ্রহ বোধ করল। বলল—এই প্রথম পাণ্ডুলিপিটা কি অনুসন্ধান করা হয়েছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজা দ্বিতীয় জেমস তো বটেই এখনকার রাজা তৃতীয় জেমসও পণ্ডিতদের দিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। কারণ, রামন লাল নাকি পণ্ডিতমহলে বলেছিলেন যে ঐ প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি অ্যালকেমির বেশ কিছু সূত্র লিখে রেখেছেন।

—হুঁ, তাহলে তো ওটা বেশ মূল্যবান। হ্যারি বলল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—রামন লাল চলে গেলেন। আমি এখানে ফিরে এলাম। নিজে নিজেই পড়াশুনো

চললাম। বাবার বয়েস হয়েছে। আমি মাছ ধরার কাজে বাবাকে সাহায্য করতে লাগলাম। সালভা থামল।

—রামন লালের আর কোন খবর পেলেন না? মারিয়া বলল?

—না। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। কয়েকদিন আগের কথা। সেদিন বিকেলে নৌকো থেকে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরবো। হঠাৎ দেখি একটা নৌকো সমুদ্রে দোল খাচ্ছে।

নৌকোটা ঠিক জেলে নৌকো না। কৌতূহল হল। নৌকো চালিয়ে ঐ নৌকোটার কাছে গেলাম। দেখি একটা কাপড় ঢাকা মাথা অল্প দেখা যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি কাদা-ধুলো-বালিতে নোংরা কালো জোব্বা গায়ে একটি লোক শুয়ে আছে। মাথা মুখ কাপড়ে ঢাকা। নৌকোটায় উঠলাম। মুখের কাপড়ের ঢাকনা সরিয়েই ভীষণভাবে চমকে উঠলাম—এ যে আমার শিক্ষাগুরু রামন লাল। মুখের কাঁচাপাকা দাড়িতে মাথার লম্বা লম্বা চুলে রক্তের ছোপ কালো হয়ে গেছে। নাকে কপালে মুখে ক্ষত। জোব্বার হাতার বাইরে হাত দুটোয় কালশিটে দাগ। রক্তের ছোপ। তাড়াতাড়ি বুকের ওপর কান চেপে ধরলাম। নাঃ—বেঁচে আছেন। নাকের নিচে হাত রাখলাম। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। একটা কালো রঙের দাঁড় পড়ে আছে নৌকোটায়। নৌকোটা আমার নৌকোর সঙ্গে বেঁধে তীরে নিয়ে এলাম। ছুটে এলাম বস্তীতে। কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে ছুটলাম সমুদ্রের ধারে। রামন লালকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। মা গরম জলে মুখের গায়ের ক্ষত মুছে দিল। জল খাওয়াল। তখনও উনি চোখ বন্ধ করে আছেন। একটু থামল সালভা। তারপর বলতে লাগল—বৈদ্যির চিকিৎসায় কয়েকদিনের মধ্যে রামন লাল একটু সুস্থ হলেন। আস্তে আস্তে বললেন যে অনেক দেশ ঘুরে তিউনেসিয়ার সমুদ্র উপকূলে এসেছিলেন। ওখানকার আরবীয়রা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল। কোনরকমে একটা নৌকোয় উঠে পালিয়ে আসেন। খাদ্য নেই, জল নেই। একা একা দাঁড় বেয়েছেন। দূরত্ব খুব বেশি না হলেও আহত শরীর নিয়ে মাঝে মাঝেই কষ্টে যন্ত্রণায় দাঁড় টানার পরিশ্রমে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অজ্ঞান হয়ে গেছেন। আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। কথাগুলো বলতে বলতে সালভার গলা ভারি হয়ে এল। চোখ ছলছল করতে লাগল। একটু থেমে বলতে লাগল—কিন্তু উনি আর সুস্থ হলেন না। শরীরের ক্ষতগুলো বিষিয়ে উঠল। ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে আল আমিরির সৈন্যদের চোখ এড়িয়ে রামন লালকে যে রাজধানী পালমায় নিয়ে যাবো তারও উপায় নেই।

একদিন সন্ধ্যে থেকেই শ্বাসকষ্ট শুরু হল। ঐ শ্বাসকষ্টের মধ্যে ইঙ্গিতে কাগজ কলম চাইলেন। আমি তাড়াতাড়ি পার্চমেন্ট কাগজ আর উটপাখির পালকের কলমে কালি লাগিয়ে দিলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে অনেক কষ্টে একটা নক্শামত কী আঁকলেন। অনেক কষ্টে ফ্যাসফেসে গলায় শুধু বললেন—আল-মু-দা-ই-না-য়। কাঁপা কাঁপা আঙুলে নক্শাটা দেখালেন। শ্বাসকষ্টে পাগলের মত মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে করতে স্থির হয়ে গেলেন। বৈদ্যি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল।



আমি শিশুর মত কাঁদতে লাগলাম। সালভা থামল। ফ্রান্সিসরা কেউ কোন কথা বলল না। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—আলমুদাইলা কী? সালভা বলল—রাজধানী পালমার রাজপ্রাসাদের নাম।

হ্যারি বলল—ওঁর পোশাকে কিছু পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, জোব্বার পকেটে এক গোছা পাণ্ডুলিপি। গ্রীক ভাষায় লেখা। মন শান্ত হলে পড়লাম পাণ্ডুলিপিটা। লিখেছেন কোথায় কোথায় গেছেন—বন্দী হয়েছেন—কয়েদ খেটেছেন—মানে ভ্রমণ কাহিনীর মত। সবশেষের পাতায় যেটা লিখেছিলেন—সেটা বেশ কৌতূহল জাগায়। লিখেছিলেন—আমার প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বেশ কিছু অ্যালকেমির সূত্র আছে। সেই সূত্রগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত অভিজ্ঞ রসায়নবিদ্‌দের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বুঝলাম আমার সূত্রগুলো নির্ভুল। ভাবছি—ফিরে গিয়ে এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। একটু থেমে সালভা বলল—সেটা আর পারলেন না।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—দুর্বল হাতে যে নক্‌শাটা উনি এঁকেছিলেন সেটা ভালো করে দেখে আমি বুঝেছিলাম যে প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তিনি কোথায় গোপনে রেখে গেছেন তার নির্দেশ আছে নক্‌শাটায়। কিন্তু সেই নির্দেশ আমি কিছুই বুঝলাম না। ফ্রান্সিস বেশ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল—সেই নক্‌শাটা কোথায়?

—ওটা আমি ঘরে বালির মধ্যে পাথরের পাটাতন দিয়ে চাপা দিয়ে রেখেছি। ঘর তো পুড়ে গেছে। জানি না নক্‌শাটাও পুড়ে গেছে কিনা। সালভা বলল।

—না—পোড়ে নি—মারিয়া বলল—আগুনে বালি পোড়ে না বরং বালি আগুন নেভায়। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামল। ধীর পায়ে মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল। ওর মাথায় ঘুরছে—নক্‌শা—রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি। হ্যারি বলল—সালভার পরে কি ঘটলো বলো। সালভা বলতে লাগল—আমি কী করবো বুঝে উঠতে পারলাম না। রামন লালের মত একজন শ্রদ্ধেয় দেশবরেণ্য মানুষকে সমাধিস্থ করবো এরকম একটা অখ্যাত জায়গায়? কিছুতেই মন মানল না। পরদিন ভোরেই বন্ধুদের সাহায্যে মৃতদেহ দুটো খচ্চরে টানা শস্যবওয়া গাড়িতে তুললাম। নিজেই চালিয়ে নিয়ে চললাম রাজধানী পালমার দিকে। দুর্গের পাশ দিয়ে রাস্তা। যাচ্ছি। কয়েকজন মূর সৈন্য ঘিরে ধরলো। ওরা কাউকে পালমা যেতে দিচ্ছে না। পাছে দুর্গ দখলের খবরটা রাজার কানে ওঠে। ওরা মৃতদেহ দেখল। ওদের মধ্যে একটি সৈন্য রামন লালকে চিনে ফেলল। ওরকম একজন খ্যাতিমান মানুষকে না চেনাই আশ্চর্য। খবর গেল দুর্গে। আল আমিরি ঘোড়ায় চড়ে এল। মৃতদেহ দেখেই চিনল। সেনাপতিও এসেছে পেছনে পেছনে। সেনাপতিকে বলল মৃতদেহের পোশাক খুঁজে দেখতে। দামী কিছু আছে কিনা। সেনাপতি খুলে নিল গলায় ঝোলানো সোনার ক্রুশটা, আঙ্গুলের হীরের আংটি। এক পকেট থেকে পূর্বদেশীয় কিছু মোহর। এবার ঝোলা পকেট থেকে বার করল পাণ্ডুলিপিটা। আল আমিরি পাণ্ডুলিপিটা

হাতে নিল। এক পাতা পড়ে আমাকে বলল—এটা পড়েছিস্ তুই? বললাম—হ্যাঁ।

—অ্যালকেমির সূত্র আছে এতে? আল আমিরি বলল। বুঝলাম আল আমিরিকে যতটা অশিক্ষিত ভেবেছিলাম সে ততটা অশিক্ষিত নয়। রামন লালের পাণ্ডুলিপিতে অ্যালকেমির সূত্র আছে এটা সে জানে। বললাম—

—জানি না। আল আমিরি তরোয়ালের হাতির দাঁতে বাঁধানো হাতলে হাত দিল। চিৎকার করে বলল—

—সত্যি কথা বল্। বললাম—শেষ পাতায় শুধু লেখা আছে যে প্রথম পাণ্ডুলিপিতে সূত্রগুলো লেখা আছে। আল আমিরি দ্রুত হাতে পাতা উলটিয়ে শেষ পাতাটা পড়ে ফেলল। বলল—প্রথম পাণ্ডুলিপি কোথায়?

—সে আমি জানি না। আমি বললাম।

—রামন লাল তোকে কোন হদিশ দিয়ে যায় নি? আল আমিরি বলল।

—না। আমি বললাম। আল আমিরি বিশ্বাস করল না।

ঝনাৎ করে তরোয়াল কোষমুক্ত করল। আমার মাথার ওপর তরোয়াল উঁচিয়ে ধরে বলল—মিথ্যে কথা। বল্—কোথায় সেই পাণ্ডুলিপি?

—আমি সত্যি জানি না। কথাটা বলতেই তরোয়ালটা রোদে ঝলসে উঠে দ্রুত আমার বুক ছুঁয়ে গেল। পোশাক কেটে গেল। বুক লম্বালম্বি কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল।

—বল্—আবার তরোয়াল তুলল আল আমিরি। বুঝলাম বাঁচতে হলে অন্য পথ নিতে হবে। বললাম—হ্যাঁ, মৃত্যুর সময় রামন লাল আমাকে একটা নক্শামত এঁকে দিয়ে গেছেন। আল আমিরি বলল—কোথায় সেটা? বললাম—আমার ঘরে রেখে এসেছি। আল আমিরি তরোয়ালের ইঙ্গিতে তিনজন সৈন্যকে বলল—তোরা ওর সঙ্গে যা। ও যা দেবে নিয়ে আসবি। ওকেও সঙ্গে নিয়ে আসবি। খবরদার—পালায় না যেন। সালভা থামল। ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল—শোন সালভা—আজ রাতে তোমার পোড়া ঘরে যাবো। নক্শাটা পেলে রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করবো। মারিয়া বলে উঠল—কিন্তু আমরা তো দেশে ফিরবো এখন। ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়িয়ে মারিয়ার মুখের দিকে তাকাল। আস্তে বলল— ঠিক আছে। তোমরা জাহাজ নিয়ে চলে যাও। আমি, হ্যারি আর শাঙ্কো এই মাজোরকা দ্বীপে থাকবো। পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। মারিয়া বুঝল—ফ্রান্সিস যা করবে স্থির করে তা করবেই। মৃদুস্বরে মারিয়া বলল—আমাকে মাফ করো ফ্রান্সিস। অনেকদিন দেশ ছাড়া তাই—আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো।

হ্যারি আর সালভা নিজেদের কেবিনে চলে গেল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কেবিন-ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

দুপুরের দিকেই হ্যারি বুঝতে পারল—জ্বর আসছে। গতকাল থেকেই শরীরটা ভালো লাগছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্বর বাড়লো। কপালে দপ্‌দপানি শুরু হল। শরীরের গাঁটে গাঁটে মোচড়ানো ব্যথা। বিস্কো বা অন্য ভাইকিং বন্ধুরা তখনও

জানে না—ফ্রান্সিসের নতুন সংকল্পের কথা। বিস্কো হ্যারির কাছে জানতে এল এবার দেশের দিকে জাহাজ চালাবে কিনা। দেখল হ্যারি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। ভাবলো—ঘুমুচ্ছে বোধহয়। বিস্কো বিছানায় বসে ডাকলো—হ্যারি? হ্যারির কোন সাড়া শব্দ নেই। বিস্কো হ্যারির কাঁধে হাত রেখে ডাকতে গেল। চম্‌কে উঠল। হ্যারির গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে যেন। বিস্কো বিছানা থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। হ্যারির কপালে গলায় হাত রাখল। ভীষণ জ্বর। একে শরীরের দিক থেকে হ্যারি বরাবরই দুর্বল। বিস্কো বেশ ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি হ্যারিকে আস্তে ধাক্কা দিল। ডাকল—হ্যারি? হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। দু'চোখ বেশ লাল। বিস্কো আর দাঁড়াল না। ওদের বৈদ্যি বন্ধুকে ডাকতে ছুটল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বৈদ্যি ওষুধের পুঁটুলি, একটা বোয়াম নিয়ে এল। হ্যারিকে পরীক্ষা করল। তারপর পুঁটুলি থেকে এক চিমটে লাল গুঁড়ো বের করে হ্যারিকে খাইয়ে দিল। বোয়াম থেকে কিছু কালো চট্‌চটে ওষুধ বের করে দু' হাতের তালুতে ঘষে বড়ির মত বানাল। বিস্কোর হাতে দিয়ে বলল—রেখে দাও—সন্ধ্যে রাতে একটা করে খাইয়ে দিও। বৈদ্যি পুঁটুলি বোয়াম নিয়ে চলে গেল।

একটু পরে হ্যারি চোখমুখ কুঁচকে বিস্কোর দিকে পাশ ফিরল। বলল—বিস্কো—ফ্রান্সিস এখন দেশে ফিরতে রাজি নয়। বিস্কো বেশ আশ্চর্য হল। বলল, কেন?

—সে অনেক কথা। ফ্রান্সিস বলবে সব। হ্যারি বলল। হ্যারির অসুখের কথা শুনে কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু হ্যারির কেবিনঘরে এল। একজন ছুটলো ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস আর মারিয়া এল। ফ্রান্সিস হ্যারির কপালে হাত দিল। বুঝল বেশ জ্বর। মারিয়াকে বলল সে কথা। মারিয়া ঘরের চারদিকে তাকাল। ছেঁড়া কাপড়-টাপড় কিছু দেখল না। তখন নিজের পোশাক থেকে কিছুটা ছিঁড়ে নিল। কাঠের গ্লাসে জল ভরে নিয়ে এল। কাপড়ের টুক্‌রো জলে ভিজিয়ে হ্যারির পাশে বসল। হ্যারির জ্বরতপ্ত কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। বিস্কোকে বলল—দরজা সবটা খুলে দাও। আধ ভেজানো দরজা সবটা খুলে দিতেই সমুদ্রের জোর হাওয়া ঢুকল। ঘরের গুমোট ভাবটা কাটল।

দুপুরে স্নান খাওয়া সেরে ফ্রান্সিসরা আবার এল। মারিয়া জলপট্টি দিতে লাগল।

বিকেল হল। মারিয়া মাঝে মাঝে হ্যারির মাথায় গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হ্যারি চোখ খুলে তাকাল। চোখের লালাভাব অনেকটা কম। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে হ্যারি শুকনো ঠোঁটে হাসল।

—এখন কেমন বোধ করছো? হ্যারির মুখের কাছে ঝুঁকে ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—জ্বর কমেছে। ভালো লাগছে—হ্যারি আস্তে আস্তে বলল—তুমি এখন কী করবে বন্ধুদের বলো।

—ও-হ্যাঁ। ফ্রান্সিস সোজা হয়ে বসল। বিস্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—

—সব বন্ধুদের সন্ধ্যেবেলা ডেক্‌-এ আসতে বল। আমার কিছু বলার আছে।

—বেশ—খবর দিচ্ছি। বিস্কো বলল।

সন্ধ্যে হল। ভাইকিং বন্ধুরা ডেক্-এ এসে জমায়েত হল। ফ্রান্সিস এখন কী করবে তাই নিয়ে ওরা পরস্পর কথা বলতে লাগল। একটু পরে ফ্রান্সিস মারিয়াকে নিয়ে ডেক্-এ এল। বন্ধুদের গুঞ্জন থেমে গেল। আকাশে চাঁদ একটু উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না পড়েছে শান্ত সমুদ্রের জলে জাহাজে। হাওয়ার তেমন জোর নেই। ফ্রান্সিস একটু গলা চড়িয়ে বলতে লাগল—ভাইসব—সামনে যে ডাঙা দেখা যাচ্ছে—এটা একটা ছোট বন্দর—নাম পালমা নোভা। মাজরোকা দ্বীপের বন্দর। রাজধানীর নাম পালমা। সেটা দূরে। এবার ফ্রান্সিস সালভার কথা, আল আমিরির কথা, রামন লালের পাণ্ডুলিপির কথা, নক্শার কথা বলল। তারপর বলল—আমার আপন ভাইয়ের মত হ্যারি অসুস্থ। আমার মন ভালো নেই। তবু আমাকে যেতেই হবে। তোমরা হ্যারিকে দেখবে। স্থির করেছি—আমি, মারিয়া আর শাঙ্কো ঐ দ্বীপে যাবো। রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস থামল। সবাই তখন ভাবছে ফ্রান্সিসের কথাগুলো। বিস্কো বলল—কী আছে ঐ পাণ্ডুলিপিতে?

—সাধারণ সীসে দস্তা পারদকে সোনায় রূপান্তরিত করার সূত্র লেখা আছে ঐ পাণ্ডুলিপিতে। ফ্রান্সিস বলল। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল—

—ফ্রান্সিস এটা কি সম্ভব?

—এই বিষয়টিকে বলে অ্যালকেমি অর্থাৎ অপ-রসায়ন। পাণ্ডুলিপির সূত্রগুলো পেলে প্রক্রিয়া বের করে হয়তো কোন রসায়নবিদ্ কিছু করতেও পারেন। আমার লক্ষ্য ঐ প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করা। তারপর ঐ দ্বীপের রাজা তৃতীয় জেমসকে দিয়ে দেওয়া। অ্যালকেমি নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই।

—কিন্তু একটা কাগজের পাণ্ডুলিপি তো সোনা মুক্তোর মত মূল্যবান কিছু নয়। একজন ভাইকিং বন্ধু বলল।

—ঠিক। কিন্তু তোমরা তো জানো—গুপ্ত সম্পদ বা গুপ্ত পাণ্ডুলিপির ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমি ভালোবাসি দুর্জয় সংকল্পকে বীরত্বকে সাহসকে এবং বুদ্ধির খেলাকে। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমরা তিনজন কি পারবে? বিস্কো বলল।

—দেখা যাক। আমরা চলে গেলে তোমরা দিনকয়েক অপেক্ষা করো। যদি আমরা না ফিরি তাহলে আমাদের খুঁজতে দ্বীপে নামবে। ফ্রান্সিস বলল।

ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল। ফ্রান্সিসরা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। দেশের দিকে জাহাজ চালানো যাবে না। আবার এটাও ওরা ভালো করেই জানে ফ্রান্সিসকে কোনভাবেই সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে না। আস্তে আস্তে গুঞ্জন থামল। বিস্কো গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস আমরা তোমাদের ছেড়ে দেশে ফিরবো না। সব ভাইকিংরা সমর্থনের ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো-। ফ্রান্সিস হাসল। সভা শেষ হল। সবাই চলে যেতে লাগল। ফ্রান্সিসও মারিয়াকে নিয়ে নিজেদের কেবিন-ঘরে ফিরে এল। ফান্সিসের মনে সংশয় ছিল হয়তো মূল্যহীন একটা পাণ্ডুলিপির জন্যে

বন্ধুরা অপেক্ষা করবে কিনা। ওরা তো অনেকদিন দেশ ছাড়া। কিন্তু বন্ধুরা অপেক্ষা করতে রাজি হওয়ায় ফ্রান্সিসের সংশয় দূর হল। ও খুশি হল।

রাতের খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস ওদের কেবিন-ঘরে আস্তে আস্তে পায়চারি করছে। ভাবছে—কেমন সেই রামন লালের নক্‌শা। কে জানে—মুমূর্ষু রামন লাল ঐ নক্‌শায় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির হদিশ কিছু দিয়েছে কিনা। তখনি দেখল মারিয়া বিছানায় বসে ওর একটা গাউন কাঁচি দিয়ে কাটছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ আশ্চর্য হয়ে বলল—পোশাকটা কাটছ কেন? মারিয়া কাঁচি চালাতে চালাতে মুখে একটু গম্ভীরভাব এনে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা একটা অভিযানে যাচ্ছি, নাচের আসরে যাচ্ছি না। কাজেই গাউনের ঝুলটা কেটে ছোট করছি যাতে দরকার পড়লে সহজে ছুটোছুটি করতে পারি।

—কিন্তু অমন সুন্দর দামী পোশাকটা—

—জীবন এই পোশাকের চেয়ে অনেক বেশি দামি আর অনেক সুন্দর বেঁচে থাকা। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিসও হাসল। কিছু বলল না। একটু পরে দু'জনে অসুস্থ হ্যারিকে দেখতে গেল। হ্যারি এখন অনেকটা সুস্থ। জ্বর কমেছে। তবু অভিযানে যাবার মত সুস্থ হয়নি শরীর।

রাত একটু বাড়তে ফ্রান্সিস তৈরি হল। পোশাক পরে কোমরে চামড়ার ফেট্টিতে তরোয়াল গুঁজল। মারিয়া কাটা গাউনটা পরল। পোশাকটা না হল গাউন না হল ফ্রক। ধনুক তূনীর ঝুলিয়ে শাঙ্কো এল। ওর কোমরে একটা ধারালো ছোরা। ছোরাটা ও সবসময়ে কোমরে গুঁজে রাখে। সালভাও এল। বৈদ্যির ওষুধ লাগিয়ে ওর বুকের ক্ষতটা শুকিয়ে এসেছে।

জাহাজ থেকে ঝোলানো দড়ি ধরে ধরে নৌকোয় নামল ওরা। ফ্রান্সিস দাঁড় বাইতে লাগল। শাঙ্কো একটা দাঁড় হালের মত ধরে বসে রইল। নৌকোর ভেতরে বসল মারিয়া আর সালভা। চাঁদের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল জাহাজের রেলিঙ্‌ ধরে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে বিস্কো আর কয়েকজন বন্ধু। আবার বন্ধুদের সঙ্গে কবে দেখা হবে। ফ্রান্সিসের মনটা একটু উদাস হল। পরক্ষণেই এসব ভাবনা মন থেকে সরাল। জোরে দাঁড় বাইতে লাগল।

একসময় তীরে পৌঁছল ওরা। আগের সেই ছোট্ট খাঁড়ির মধ্যেই নৌকোটা ঢোকাল ফ্রান্সিস। একটু গিয়ে ওরা একে একে নৌকো থেকে তীরের বালিয়াড়িতে নামল। কালকে দেখা সেই জাহাজটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা ঐ জাহাজটা কাদের?

—আল আর্মিরি এই জাহাজেই সৈন্য আর একদল বন্দী নিয়ে এসেছিল। সালভা একটু থেমে বলল—গভীর রাত্রে দুর্গের রাজার সৈন্যরা কিছু বোঝবার আগেই প্রচণ্ড আক্রমণ করল। রাজা জেমসের সৈন্যরা বাধা দিল। কিন্তু আল আর্মিরির মুর সৈন্যদের কাছে ওরা দাঁড়াতেই পারল না। মুরদের কাছে ছিল চামড়ার ফিতের গুলতির মত স্প্রিং। ঐ স্প্রিং দিয়ে পাথরের বড় বড় টুকরো ছুঁড়ে ওরা সহজেই

দুর্গের সৈন্যদের কাবু করে ফেলল। হেরে গেল রাজা জেমসের সৈন্যরা। সালভা থামল।

—জাহাজটা কালকেও দেখেছি জনশূন্য। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ, জাহাজটায় কেউ থাকে না। সবাই দুর্গে থাকে। সালভা বলল। জাহাজটা বেশ দূরে। চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সামনে সালভা। পেছনে ফ্রান্সিসরা। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু বাতাসের শব্দ আর সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার মৃদু শব্দ।

ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে জাহাজটার দিকে ভালো করে নজর বুলোল। বলল—সালভা জাহাজটায় গতরাতে দু-একটা আলো দেখেছিলাম। আজকে দেখছি সব অন্ধকার। মারিয়া বলল—গতরাতে জাহাজটা থেকে কিন্তু কোন পাটাতন তীরের বালিতে ফেলা ছিল না। আজকে একটা কাঠের পাটাতন ফেলা রয়েছে।

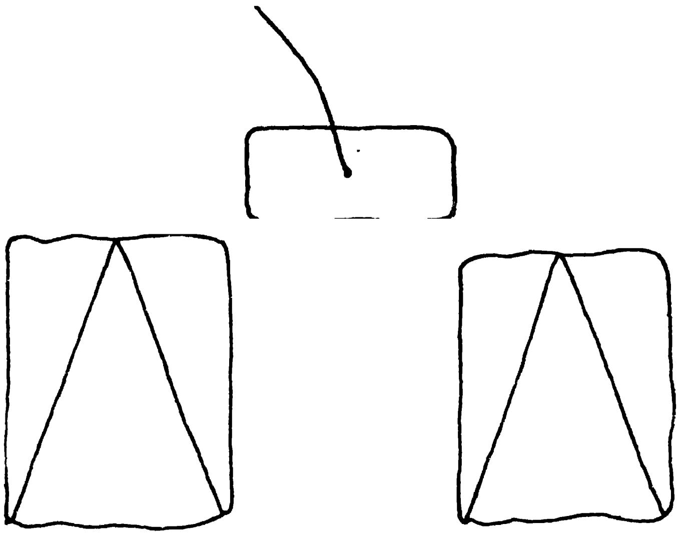
—হুঁ, দেখছি তাই। ফ্রান্সিস একটু চিন্তিতস্বরে বলল। তারপর চারদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। নাঃ, কোথাও কোন জনপ্রাণীর দেখা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখা গেল কিছু ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। বাতাসে গাছের পাতায় শব্দ হচ্ছে। তার নিচে পরপর কিছু পাথরের বাড়িঘর। কাছে এসে দেখা গেল সব বাড়িঘর আগুনে পোড়া। পাথর বসানো থামগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ছাত বলে কিছু নেই। সব পুড়ে গেছে। সালভা দাঁড়িয়ে পড়ল। বস্তীর পোড়া ঘরবাড়ি দেখল। তারপর এগিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। কয়েকটা পোড়া বাড়িঘর পার হয়ে একটা পোড়া ঘরে ঢুকল সালভা। ফ্রান্সিসরাও ঘরটায় ঢুকল। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে দেয়াল পুড়ে কালো হয়ে গেছে। সালভা মেঝে থেকে পোড়া কাঠের ডাল সরিয়ে উবু হয়ে বসল। বালি সরাতে লাগল। একটা পাথরের ছোট পাটাতন। তুলে ফেলল ওটা। একটা একটু ছাই-রঙা গোটানো কাগজ বের করল। হেসে বলল—যাক্ নক্শাটা পুড়ে যায়নি। নক্শাটা খুলে দেখে নিঃশব্দে ফ্রান্সিসকে দিল। ফ্রান্সিস হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। মাথার ওপরে ছাদ তো নেই। চাঁদের আলো পড়েছে। ফ্রান্সিস কাগজটার সবটা ছড়িয়ে দেখতে লাগল। কালিতে মোটা টানে রামন লালের নিজের হাতে আঁকা নক্শা। নক্শাটা দেখতে এরকম—

ফ্রান্সিস খুব মনোযোগ দিয়ে নক্শাটা দেখতে লাগল। মারিয়াও মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল। শাঙ্কোও এক নজর দেখে নিল। সালভা একটু হতাশ স্বরে বলল—মুমূর্ষু অবস্থায় আঁকা এই নক্শাটা দেখে রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি বের করতে পারবেন? শাঙ্কো বলল—ভাই এর নাম ফ্রান্সিস। কত নক্শা, ছড়া ছবির অর্থ বের করেছে ফ্রান্সিস। দেখো—এটারও রহস্য ভেদ করবে। সালভা আর কিছু বলল না।

হঠাৎ রাতের নৈঃশব্দ ভেঙে দিল একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। ভীষণ চমকে উঠে সালভা বলল—মূরসৈন্যরা আক্রমণ করার আগে মুখে এরকম শব্দ করে। হঠাৎ ধুপ্ ধাপ্ শব্দ শোনা গেল। একদল লোকের ছুটে আসার শব্দ। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে নক্শাটা

ঢোলা জামার মধ্যে গলার কাছ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। শাঙ্কোও কোমর থেকে ছোরাটা বের করে জামার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরাল। ফ্রান্সিস এক ঝট্‌কায় তরোয়াল খুলল।



চাঁদের আলোয় দেখা গেল পোড়া বাড়িটার চারপাশ ঘিরে মূর সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। শাঙ্কো ধনুকে তীর পরিয়ে ছিলা টানল। লক্ষ্য সামনের মূর সৈন্যটা। ফ্রান্সিস বলল—ধনুক নামাও। ফ্রান্সিস পোড়া ঘরটা থেকে বাইরে এল। পেছনে মারিয়া শাঙ্কো আর সালভা। সালভার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস হাতের তরোয়াল বালির ওপর ফেলে দিল। কোন শব্দ হল না। শাঙ্কো ধনুক বালিতে নামিয়ে রাখল।

সৈন্যদের দল থেকে একজন লম্বামত সৈন্য খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ওর চিবুকে কোঁকড়া দাড়ি। সালভাকে দেখে হলদেটে দাঁত বের করে হাসল। কালো ঘামে ভেজা শরীরে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে। চক্‌ চক্‌ করছে যেন। বুকে বর্ম। লোকটা আরবী ভাষায় কী বলল। সালভা মাথা নিচু করল। কোন কথা বলল না। এতক্ষণে মারিয়াকে দেখে লোকটা বেশ আশ্চর্য হল। আরো আশ্চর্য হল মারিয়ার হাঁটুর নিচে পর্যন্ত কাটা গাউন দেখে। সালভাকে কী জিজ্ঞেস করল। সালভা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—জিজ্ঞেস করছে আপনারা কে? ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা ভাইকিং। আমরা লড়াই চাই না। সালভা বলল সে কথা। লোকটা সালভাকে কী বলল। তারপর তরোয়াল ঘুরিয়ে সবাইকে হাঁটবার ইঙ্গিত করল। সালভা ঐ লোকটার দিকে যেতে যেতে বলল—চলুন আমাদের দুর্গে যেতে হবে।

আগে পিছে মুর সৈন্যরা চলল। মাঝখানে ফ্রান্সিসরা। দু'পাশে ছাড়া ছাড়া গাছগাছালি। মাঝখানে ধুলোবালির পথ। হেঁটে চলল সবাই।

যেতে যেতে ফ্রান্সিসরা দেখল এখানে ওখানে কিছু পাথরের ঘরবাড়ি। মাথায় বড় বড় বুনো ঘাসের ছাউনি। চাঁদের আলোয় একটু দূরেই দেখা গেল পাথরের দুর্গের কালো মাথা। একটা ছোট টিলার ওপরে ঐ দুর্গটা। দুর্গটা ঘিরে পাথর গাঁথা প্রাচীর। বেশ উঁচু।

ডানহাতি একটা পাথর গাঁথা পথ দুর্গের সদর দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ফ্রান্সিসরা গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। দুর্গের বিরাট কাঠের দরজার একটা বড় পাল্লা ঘর্ ঘর্ শব্দ তুলে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল সবাই।

একটা চওড়া পাথর বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে টানা বারান্দামত। দু'পাশে পাথুরে দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। বারান্দা দিয়ে একটু যেতেই ডানদিকে একটা লোহার গরাদ বসানো ছোট লম্বাটে দরজা। বোঝা গেল কয়েদঘর। কয়েদঘরের পাহারাদার এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস দেখল পাহারাদারটি মুর নয়। গায়ের রং, চেহারা দেখে মনে হল এদেশীয়। একটু বয়েস হয়েছে লোকটার। সেই লম্বাটে লোকটার নির্দেশে পাহারাদার কোমর থেকে লোহার বড় গোল রিং-এর চাবির গোছা খুলল। ঘরটার বড় তালাটা খুলে লোহার দরজাটা খুলে দিল। লম্বা সৈন্যটি মারিয়ার দিকে তাকিয়ে চড়া গলায় কী বলল। মারিয়া বুঝল না। সালভা বলল—এই কয়েদ ঘরে আপনাকে থাকতে হবে। মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর ঘরটায় ঢুকল। ফ্রান্সিস ভাবল আপত্তি করবে। মারিয়াকে ওদের সঙ্গেই রাখতে বলবে। কিন্তু লম্বা সৈন্যটির কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল—এ লোকটি কোন ওজর আপত্তিতে কান দেবে না। তারপরের ঘরটির তালা খুলল পাহারাদারটি। শাঙ্কোর তীর-ধনুক একজন সৈন্য খুলে নিল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালটাও সেই রেখেছে হাতে। ওদের ঘরটায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—ঐ সৈন্যটিকে বলো আমাদের কয়েদ করা হল কেন? সালভা লম্বা সৈন্যটিকে বলল সে কথা। লম্বা সৈন্যটি ফ্রান্সিসের দিকে কড়া চোখে তাকাল। তারপর কী বলে উঠল। সালভা বলল—কালকে আল আমিরির দরবারে হাজির করাবে আমাদের। তারপর উনি যা করেন। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। শুধু মারিয়া যাতে শুনতে পায় সেভাবে চেঁচিয়ে বলল—মারিয়া কোন ভয় নেই। আমরা পাশের ঘরেই আছি।

এই ঘরটা বেশ বড়। মেঝেয় শুক্‌নো ঘাস পুরু করে বিছানো। দু'পাশের পাথরের দেয়ালে পোঁতা দুটো লোহার আঙটা থেকে লোহার শেকল ঝুলছে। শেকলের সঙ্গে বাঁধা লম্বা লম্বা দড়ি। আগে ছোট দড়ি দিয়ে ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা হল। তারপর শেকলের লম্বা দড়িগুলোর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল আলাদা আলাদা ভাবে। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শাঙ্কো সালভা ঘাসের বিছানায় বসে পড়ল। সৈন্যরা চলে গেল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। তারপর চোখ খুলল। পাথুরে দেয়ালের

আংটায় বসানো মশালের আলোয় ওপরের দিকে তাকাল। বেশ উঁচুতে পাথরের ছাদ। দু'পাশে দুটো চৌকোনো মত এবড়ো-খেবড়ো পাথরের ফোকর। অনেক উঁচুতে সেই গরাদহীন ফোকর। ওটার কাছে পৌঁছোনো অসম্ভব। চারপাশে তাকিয়ে দেখল—আরো শেকলবাঁধা আংটা রয়েছে। তাতে লম্বা লম্বা দড়ি বাঁধা। বুঝল—এখানে অনেক বন্দী রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। শাঙ্কো আস্তে ডাকল—ফ্রান্সিস? ফ্রান্সিস ওর দিকে তাকাল। শাঙ্কো বলল—এখান থেকে পালানো যাবে? শুধু তো আমরা নই। রাজকুমারীও রয়েছেন।

—দেখি—আগে। ক'জন পাহারাদার সৈন্য থাকে কতক্ষণ, পরপর পাহারাদার পালটায়—কী ভাবে খেতে দেয় তারপর ভাববো। সালভাকে বলল—সালভা এখানে অনেক বন্দী রাখা হয় তাই না?

—রাজা জেমসের আমলে শত্রুপক্ষের বন্দী সৈন্যদের রাখা হত। এখন তো আল আমিরির দখলে। আল আমিরি অন্তত জনা পঁচিশেক বন্দীকে এখানে এনে রেখেছিল। দিন চার-পাঁচ আগে এক আরবী ব্যবসায়ী জাহাজ নিয়ে এসেছিল। ক্রীতদাস কেনাবেচা ওর ব্যবসা। আল আমিরি সব বন্দীকে বিক্রি করে দিয়েছিল। সালভা বলল।

—বন্দীরা কেউ এখান থেকে পালাতে পেরেছিল? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, শুনেছি তিনজন বন্দী নাকি কীভাবে দুর্গের পেছনের মরণজলা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। শোনা যায় ওরা নাকি মরণজলাতেই মারা গেছে। সালভা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। বলল—মরণজলাটা কী? সালভা বলল—কে জানে কেন এই দুর্গের পেছনেই আছে একটা জলাভূমি।

—খুব বড়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—না না, তবে কী করে যে এই জলায় জল আসে—কাদা থাকে মা মেরীই জানেন। বলল সালভা।

—আমি জানি। এটা পাহাড়ি এলাকা। পাথরের কোন গোপন ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল এসে জমা হয়। মাটির ভাগে মিশে কাদা তৈরি করে। ঠিক আছে বলো—ফ্রান্সিস বলল।

—জলাভূমিটা লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা। ঘাসগুলো কোনদিন সবুজ হয় না। শুকনো হলুদ রঙের। কেউ এই জলার ধারে কাছে আসে না। ঘোড়া খচ্চরও এই ঘাস খেতে আসে না। দিনের আলোতেও জলাটার অন্ধকার ভাবটা কাটতে চায় না। কেমন ধোঁয়াটে সারা জলাভূমিটা। লোকে তাই এটাকে মরণজলা বলে। সালভা বলল।

—হুঁ, মরণজলা। ফ্রান্সিস চিন্তা করতে করতে বলল। তারপর শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—রাত শেষ হয়ে এসেছে। ঘুমিয়ে নাও। বিশ্রাম চাই। শরীর ঠিক রাখো। শাঙ্কো আর সালভা শুয়ে পড়ল।

ঠঠাং—ঠং দরজা খোলার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। দেখল—পাহারাদার খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে। হাতে একটা কাঠের বড় থালামত! তাতে গোল কাটা রুটির টুকরো। অন্য ছোট কানা উঁচু থালাটায় টুকরো আলু-ডুমুরের ঝোলমত। পাহারাদার দুটো থালা ফ্রান্সিসদের সামনে শুকনো ঘাসের ওপর রাখল। ফ্রান্সিস উঠে বসল। বাঁধা হাত উঁচু করে দেখাল। পাহারাদার মাথা নাড়ল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—হাত খোলার হুকুম নেই। বাঁধা হাত দিয়েই খেতে হবে। শাঙ্কো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল—পেয়েছো কী? আমরা কি কুকুর বেড়াল? পাহারাদার শাঙ্কোর দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না। শাঙ্কোর চিৎকার করে কথা বলা শুনে দু'জন মূর সৈন্য দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস আস্তে বলল—শাঙ্কো মাথা গরম করো না। খেয়ে নাও। পেটপুরে খাও। শরীর ঠিক রাখো। শাঙ্কো বসল। তিনজনে খেতে লাগল রুটি ভেঙে ভেঙে। ঝোলটা ভালোই লাগল। খেতে খেতে ফ্রান্সিস পাহারাদারটিকে বলল—ভাই, তুমি তো মূর নও। পাহারাদারটি মাথা নাড়ল।

—নাম কী তোমার? ফ্রান্সিস বলল।

—কালমা। পাহারাদারটি বলল। খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরের কোণায় রাখা পীপে থেকে কাঠের বাটিতে জল এনে ফ্রান্সিসদের কালমা জল খাওয়াল। কালমা এঁটো থালা নিয়ে চলে গেল। ঠঙ্ ঠঙাং—দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

একটু বেলা হল। আবার দরজা খুলল কালমা। ঢুকল সেই লম্বামত লোকটা। সালভাকে কী বলল। সালভা বলল—ফ্রান্সিস, আল আমিরির কাছে আমাদের হাজির করা হবে। সবাই উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের চিন্তা—আল আমিরি কেমন লোক। সালভার ওপর রাগ আছে। কিন্তু আমাদের কী করবে? আটকে রাখবে না ছেড়ে দেবে?

লম্বা দড়িগুলো থেকে খুলে হাত বাঁধা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসদের সামনে পেছনে খোলা তরোয়াল হাতে চারজন সৈন্য। একটু এগোতেই মারিয়ার কয়েদঘর। লোহার দরজার ফাঁক দিয়ে ফ্রান্সিস দেখল ঘাসের বিছানায় মারিয়া চুপ করে বসে আছে। ফ্রান্সিসদের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। সালভাকে বলল—সালভা লোকটিকে বললো—মারিয়াও যাক আমাদের সঙ্গে। সালভা লোকটিকে বলল সে কথা। লোকটি মারিয়ার দিকে তাকাল। কী ভাবল। কালমাকে দরজা খুলে দিতে ইঙ্গিত করল। দরজা খোলা হল। মারিয়া বেরিয়ে এল। বাইরের আলোয় ফ্রান্সিস দেখল মারিয়ার মুখ শুকিয়ে গেছে। হয়তো রাতে ঘুম হয়নি। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে এগোল। ভাবল মারিয়াকে না আনলেই ভালো হত। অন্ধকার থেকে হঠাৎ বাইরের উজ্জ্বল রোদে এসে ফ্রান্সিসদের তাকাতে অসুবিধে হচ্ছিল। চোখ কুঁচকে তাকাতে হচ্ছিল।

বাইরের চত্বরে নামল সবাই। চলল সামনের একটা কাঠের দরজার দিকে। দরজা দিয়ে একটা বিস্তৃত ঘরে ওরা ঢুকল। দিনের বেলায়ও ঘরটা কেমন

অন্ধকার। দেয়ালে মশাল জ্বলছে। একটা পাথরের লম্বাটে আসনে রঙচঙে কাপড় পাতা। দু'পা ছড়িয়ে একটু আয়েসী ভঙ্গীতে বসে আছে আল আমিরি। বেশ ফর্সা রঙ। চিবুকে সামান্য দাড়ি। লম্বা শক্তসমর্থ চেহারা। পরণে সাধারণ সাদাকালো রঙের জোব্বামত। আল আমিরির চোখের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বুঝল—লোকটা ধূর্ত আর ক্ষমতালোভী। তার দু'পাশের ছোট আসনে দু'জন আরবীয় বৃদ্ধ বসে আছে। বোধহয় আল আমিরির পরামর্শদাতা।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে রইল। লম্বা লোকটি আদাবের ভঙ্গীতে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। আল আমিরি ভরাট গলায় ডাকল—সালভা? সালভা একটু মাথা নিচু করল। আল আমিরি স্পেনীয় ভাষায় বলল—তুমি খুব বেঁচে গিয়েছিলে। এবার আর তোমার বাঁচার আশা নেই। একটু থেমে বলল—

—বল্ কোথায় আছে রামনের পাণ্ডুলিপি?

—আমি সত্যি জানি না সিনির (মহাশয়)। সালভা ভীতকণ্ঠে বলল। আল আমিরি ডান দিকে তাকিয়ে আঙ্গুল নেড়ে কী ইঙ্গিত করল। একটি খালি গা বলশালী মূর কালো লম্বা চামড়ার চাবুক শপাং-শপাং—প্রচণ্ড জোরে চাবুক চালাতে লাগল সালভার গায়ে। সালভা চিৎকার করে উঠল। চোখে জল এল ওর। আল আমিরি হাত তুলল। বন্ধ হল চাবুক মারা।

—এবার বল—নইলে—আল আমিরি গলা চড়াল। সালভা যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলল। বলল—সেই পাণ্ডুলিপি কোথায় আমি জানি না। বিশ্বাস করুন—আমি সত্যি কিছু জানি না।

—তুই রামনের মৃতদেহ নিয়ে গোর দিতে যাচ্ছিলি। তুই সব জানিস্। বল্—। আল আমিরি বলে উঠল।

—না-না। সালভা জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—আমি কিছু জানি না। আবার আঙ্গুলের ইঙ্গিত। আবার চাবুকের মার। সালভার পিঠের দিকে পোশাক ছিঁড়ে গেল। রক্ত ফুটে উঠল পোশাকে। ও যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল। ফ্রান্সিসের আর সহ্য হল না। ও বাঁধা দু'হাত ওপরে তুলল। বলল—আমার অনুরোধ—সালভাকে চাবুক মারা বন্ধ করুন। আল আমিরি একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকাল। বলল—তাহলে সালভার হয়ে তুই চাবুকের মার খাবি?

—আমার কথাটা আগে শুনুন। তারপর আমাকে চাবুক মারতে চান মারবেন। ফ্রান্সিস বেশ দৃঢ়স্বরে বলল।

আল আমিরি আঙ্গুল তুলল। চাবুক মারা বন্ধ হল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে রইল। দেখল—সালভা পাথরের মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে গোঙাচ্ছে। ফ্রান্সিস বলল—রামন লাল অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় সালভাদের ঘরে স্থান পেয়েছিলেন। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি সালভাকে একটা নক্শা এঁকে দিয়েছিলেন। তারপরই বাকরোধ অবস্থায় তিনি মারা যান। ফ্রান্সিস থামল। শাঙ্কোকে বলল—জামার নিচ থেকে নক্শাটা বের কর। শাঙ্কো বাঁধা হাত ফ্রান্সিসের গলার কাছে জামার ফাঁক দিয়ে

ঢুকিয়ে নক্‌শাটা বের করে আনল। ফ্রান্সিস নক্‌শাটা বাঁধা হাতে ধরে বলল—এই সেই নক্‌শা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রামন লাল এই নক্‌শার মধ্যে সালভাকে হদিশ দিয়ে গেছেন—প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তিনি কোথায় গোপনে রেখে দেশত্যাগ করেছিলেন। কারণ সালভা তাঁর স্নেহাস্পদ শিষ্য ছিল। আল আমিরি একজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সৈন্যটি এসে ফ্রান্সিসের হাত থেকে নক্‌শাটা নিয়ে আল আমিরিকে দিল। আল আমিরি খুব মনোযোগ দিয়ে নক্‌শাটা দেখতে লাগল। তারপর কিছুই বুঝতে না পেরে বলল—এই নক্‌শার তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তুই কী করে বুঝলি যে এটাতে গোপন পাণ্ডুলিপির হদিশ আছে? ফ্রান্সিস বলল—

—দেখুন রামন লাল বুঝেছিলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তখন তাঁর বাকরোধ হয়েছে। সালভাকে যে মুখে কিছু হদিশ বলবেন তার উপায় ছিল না। প্রায় অসাড় হয়ে আসা হাতে বেশি আঁকাও সম্ভব ছিল না। তাই খুব ছোট টানে নক্‌শাটা এঁকে দিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও টান অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আল আমিরি নক্‌শাটা আবার দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—লক্ষ্য করুন নিচে একটা ছোট চৌকোনোর মধ্যে হয়তো একটা বিন্দু বসাতে গিয়েছিলেন বা কিছু লিখতে চেয়েছিলেন। অসাড় হয়ে আসা হাতের কলমের টান বেঁকে নেমে এসেছে। আর আঁকতে পারেননি। আল আমিরি ভালো করে নক্‌শাটা দেখতে দেখতে বলল—তোর বুদ্ধি আছে দেখছি। ফ্রান্সিস বলল—আর একটা কথা। নক্‌শাটার মধ্যে যে জায়গাটার ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই সালভার পরিচিত জায়গা। কারণ সালভাকেই তিনি হদিশটা দিয়ে গেছেন। আল আমিরি এবার একটু উঠে পাথরের আসনে ভালো করে বসল। বলল—তুই তো ভিনদেশী—পারবি এই নক্‌শার নির্দেশ বের করতে?

—এখনই সেটা বলতে পারবো না। পালমার রাজপ্রাসাদে সালভা রামন লালের কাছে বেশ কয়েক বছর পড়াশুনো করেছে। এই পড়াশুনোর জায়গাটা রামন লাল যেখানে থাকতেন—মানে সেইসব জায়গাগুলো ভালো করে দেখতে হবে। এর জন্যে সালভাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। ওর সাহায্য ছাড়া কিছুই করা যাবে না। ওকে নিয়েই আমাকে পালমার রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। কারণ মৃত্যুকালে রামন লাল অনেক কষ্টে আলমুদাইনা মানে পালমার রাজপ্রাসাদের নাম বলেছিলেন।

—হুঁ। আল আমিরি একটু ভাবল। তারপর বলল—ঠিক আছে সালভা যাবে তোর সঙ্গে। তোরা পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করে গোপনে এখানে নিয়ে আসবি।

—আমি চেষ্টা করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু একটা শর্ত আছে। আল আমিরি আবার পা ছড়িয়ে বসতে বসতে বলল। ফ্রান্সিস বুঝল—আল আমিরি অত সহজে ওদের ছেড়ে দেবে না। আল আমিরি মারিয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল—

—এ কে? ফ্রান্সিস বলল—আমাদের দেশের মাননীয়া রাজকুমারী।

—তা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এখানে এসেছে কেন? আল আমিরি বলল।

—আমি ওঁর স্বামী। তাই আমার সঙ্গে এসেছেন। ফ্রান্সিস বলল।

আল আমিরি এবার একটু ভদ্র হবার চেষ্টা করল। মুখে শব্দ করল—হুঁ। তারপর দেঁতো হাসি হেসে বলল—তোমরা যতদিন না পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে নিয়ে আসছো ততদিন তোমার স্ত্রী এখানে কয়েদঘরে বন্দী থাকবে। কী? রাজি?

ফ্রান্সিস এ ধরনের একটা কিছু আগে থেকেই আঁচ করেছিল।

ও বলল—বেশ, আমি আপনার শর্তে রাজি আছি।

মারিয়া চমকে উঠে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। বলল—

—কী বলছো তুমি? শাঙ্কোও বলে উঠল—ফ্রান্সিস—এরকম একটা সাংঘাতিক শর্তে তুমি রাজি হলে? তোমার কি মাথা খারাপ হল? ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না।

আল আমিরি বলল—তোমরা কালকে পালমা রওনা হবে।

এবার আর একটা শর্ত—তোমরা কাউকে বলতে পারবে না যে আমি এই পালমা নোভার দুর্গ অধিকার করে এখানেই আছি। যদি বলো—

—ঠিক আছে। আমরা বলবো না—ফ্রান্সিস বলল—এবার আমাদের বাঁধা হাত খুলে দিতে বলুন।

—না এখন নয়—কালকে যখন রওনা হবে তখন। আল আমিরি বলল। ফ্রান্সিস বলল—বেশ—কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বলো। আল আমিরি বলল। মারিয়াকে দেখিয়ে ফ্রান্সিস বলল—

—রাজকুমারী মারিয়া কয়েদঘরের জীবনে অভ্যস্ত নন। মারিয়াকে দুর্গের অন্দরমহলে নজরবন্দী করে রাখুন—আপত্তি নেই।

—ভেবে দেখি—আল আমিরি বলল।

—সালভার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন—আমার অনুরোধ—ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। আল আমিরি মুখে শব্দ করল। ফ্রান্সিস বলল—এবার তাহলে নক্‌শাটা দিন। ওটা নিয়ে তো আমাকে ভাবতে হবে। আল আমিরি নক্‌শাটা একজন সৈন্যকে ইশারায় ডেকে দিল। ফ্রান্সিস নক্‌শাটা নিয়ে ফিরে দাঁড়াল। শাঙ্কো গিয়ে আহত সালভাকে বাঁধা হাতে কোনরকমে উঠে দাঁড় করাল। নিজে নিচু হয়ে বসল। দু'হাত বাঁধা সালভাকে নিজের পিঠের ওপর ভর রাখতে বলল। সেইভাবে সালভাকে প্রায় পিঠে করে নিয়ে চলল।

মূর সৈন্যদের পাহারায় ওরা ঘরের বাইরে এল। পাথুরে চত্বর দিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে। ফ্রান্সিস মারিয়ার থমথমে মুখের দিকে তাকাল। বুঝল—মারিয়া রাগ করেছে। হাঁটতে হাঁটতে আস্তে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া বেশ বিরক্ত গলায় বলল—তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—সঠিক মুহূর্তে বুঝতে পারবে শর্তে রাজি হয়ে আমি ভুল করেছি না ঠিক করেছি। মাথা ঠাণ্ডা রাখো। এখন রাগারাগির সময় নয়। মারিয়া কিছু বলল না। হাঁটতে লাগল।

মারিয়া নিজের কয়েদঘরে ঢুকে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও নিজেদের ঘরে ঢুকল। শাঙ্কো প্রায় পিঠে করে সালভাকে নিয়ে ঢুকল। সালভা দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। শুয়ে

পড়ল। কালমা দরজা বন্ধ করে দিল। ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত মাথার নিচে রাখল। অনেক চিন্তা মাথায়।

ঠং—ঠঠাং শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল। একজন পাকা দাড়ি গোঁফঅলা বৃদ্ধ ঢুকল। মাথায় হলদে কাপড়ের ফেট্টি। গলায় নীলরঙের পাথরের মালা। কাঁধে একটা ছোট কাপড়ের বোঁচকামত ঝোলানো। কালমা বলে উঠল—বৈদ্যি। বৈদ্যি বোঁচকা নামিয়ে বসল সালভার কাছে। সালভা উঠে বসল। বৈদ্যি ওর পিঠের দিকের পোশাকটা তুলল। দেখা গেল পিঠে চাবুকের কালশিটে দাগ। কয়েকটা জায়গা বেশ কেটে গেছে। চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্যি বোঁচকা থেকে একটা কাঠের ছোট বাটি বের করে রাখল। শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে জল আনতে ইঙ্গিত করল। শাঙ্কো উঠে কোণা থেকে জল নিয়ে এল। বৈদ্যি বোঁচকা থেকে একটা লাল কাপড়ের টুকরো বের করল। একটা কাঠের ছোট লম্বা কৌটো বের করল। কৌটো থেকে কীসের গুঁড়ো নিয়ে জলে ফেলল। জলটা কালো হয়ে গেল। কাপড়ের টুকরোটা সেই জলে ভিজিয়ে সালভার ক্ষতস্থানে বুলিয়ে দিতে লাগল। সালভা প্রথমে একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ ওষুধটা লাগাল বৈদ্যি। তারপর কী বলে চলে গেল। কালমা দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে বলল—বৈদ্যি আবার সন্ধ্যেবেলা আসবে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস নক্‌শাটা নিয়ে বসল। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে বুঝল যে জায়গাটা খুব কম টানে কাগজে আঁকা হয়েছে। সেই জায়গাটা রামন লাল আর সালভা দু'জনেরই খুব পরিচিত। জায়গাটা পালমার রাজপ্রাসাদেরই কোন জায়গা। ফ্রান্সিস ডাকল—সালভা। সালভা শোয়া অবস্থায়ই ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমরা কোথায় থকতে? পড়াশুনো করতে?

—আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদের দক্ষিণকোণে। সালভা বলল।

—রামন লালও কি ওখানেই থাকতেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ—আরো কয়েকজন পণ্ডিতও থাকতেন। সালভা বলল।

—তাঁরাও কি রামন লালের মতই পণ্ডিত ছিলেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না-না। রামন লাল ছিলেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী। দেশের লোক তাঁর নাম দিয়েছিল—ডক্টর ইলিউমিনাডো।

—তাহলে তো এ দেশের খুব সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

—নিশ্চয়ই। সালভা বলল।

সন্ধ্যে হ'ল। বৈদ্যি আবার এল। ওষুধ দিয়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—এখন কেমন লাগছে? সালভা দুপুর থেকেই উঠে বসে ছিল। হেসে বলল—অনেকটা ভালো।

রাত হতেই ফ্রান্সিস বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘাসের বিছানায় পায়চারি করতে লাগল। শাঙ্কো বুঝল ফ্রান্সিস পালাবার ফন্দী আঁটছে। ফ্রান্সিস লোহার দরজার

কাছে গেল। দেখল কালমা খোলা তরোয়াল হাতে বারান্দায় পাহারা দিচ্ছে। মারিয়ার ঘরের সামনেও একজন মূর পাহারাদার। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—

কালমা? কালমা এগিয়ে এল।

—খেতে টেতে দাও। ফ্রান্সিস বলল।

—এখনও সময় হয়নি। কালমা বলল।

—কী মুস্কিল। ভীষণ খিদে পেয়েছে যে। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। কালমা মারিয়ার ঘরের দিকে গেল। ওখানকার মূর পাহারাদারটিকে কী বলল। চলে গেল। এবার ঐ পাহারাদারটি দুটো ঘরের সামনেই খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস দেখল—মুস্কিল। এই মূরটাকে তো সরাতে হয়। ফ্রান্সিস দরজার কাছে মুখ নিয়ে নিজেদের দেশীয় ভাষায় চিৎকার করে বলল—মারিয়া শুনতে পাচ্ছো? মারিয়ার কানে ডাক পৌঁছল। ও চম্‌কে চেঁচিয়ে বলল—

—হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ফ্রান্সিস আবার চেঁচিয়ে বলল—

—চিৎকার কান্নাকাটি জুড়ে দাও। তাড়াতাড়ি। মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো তারপরই গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। মূর পাহারাদারটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ও কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। ও জাতিতে মূর। ফ্রান্সিসদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। ও একবার ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে আর একবার মারিয়ার ঘরের সামনে ছুটোছুটি করতে লাগল। এবার ফ্রান্সিসের শেখানোমত সালভা আরবীতে বলল—শিগগির দেখ ঐ রাজকুমারীর কী হয়েছে? যদি রাজকুমারীর কিছু হয় আল আমিরি তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে। পাহারাদারটি ছুটে গেল মারিয়ার ঘরের দিকে। এত জোরে মারিয়া জীবনেও চ্যাচায়নি। ওর গলা ভেঙে গেল। তবু চ্যাচাতে লাগল। কাঁদতে লাগল।

ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। চাপাস্বরে বলল শাঙ্কো—ছোরাটা। শাঙ্কো ছুটে এল ফ্রান্সিসের কাছে। মাথাটা নিচু করল। ফ্রান্সিস ওর পোশাকের মধ্যে দিয়ে বাঁধা হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে ছোরাটা বের করে আনল। শাঙ্কো ওর বাঁধা হাতদুটো এগিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস বাঁধা হাতে দ্রুত শাঙ্কোর হাতবাঁধা দড়িতে ছোরাটা ঘষতে লাগল। তাড়াহুড়োয় ছোরার মুখটা এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল। ছোরার খোঁচা লেগে শাঙ্কোর হাত কেটে ছড়ে গেল। রক্ত বেরোলো। শাঙ্কো চুপ করে রইল। দড়ি বেশ কিছুটা কেটে যেতেই শাঙ্কো এক ঝটকা টানে দড়িটা ছিঁড়ে ফেলল। খোলা হাতে ফ্রান্সিসের হাতবাঁধা দড়ি কাটতে লাগল। এবার দড়ি তাড়াতাড়ি কেটে গেল। শাঙ্কো যখন সালভার হাতের দড়ি কাটছে তখন ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে বলে উঠল—মারিয়া চুপ। মারিয়া কান্না চ্যাচামেচি থামাল। ওদিকে দু'তিন জন সৈন্য ছুটে এসেছে মারিয়ার ঘরের সামনে। ওখানকার পাহারাদারটি হড়বড় ক'রে সৈন্যদেব কী বলল। ফ্রান্সিসরা লম্বা দড়ি হাতে পেঁচিয়ে চুপ করে ঘাসের বিছানায় বসে রইল। ও ঘরের পাহারাদারকে নিয়ে সৈন্য কজন ফ্রান্সিসদের ঘরের সামনে এল।

দেখল—কয়েদীরা শান্তভাবে বসে আছে। হাতে দড়ি বাঁধা। সৈন্য ক'জন চলে গেল। মূর পাহারাদারটি আবার খোলা তরোয়াল নিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

কালমা ছোট বড় কাঠের থালায় খাবার নিয়ে এল। মারিয়ার ঘরের দরজা খুলে দিল। মূর পাহারাদারটি খাবার দিল মারিয়াকে। কালমা ফ্রান্সিসদের ঘরের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। কালমার কোমরের খাপে তরোয়াল গোঁজা। নিচু হয়ে কালমা থালা নামাচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—শাঙ্কো। কালমা সরে উঠে দাঁড়িয়েছে। শাঙ্কো এক লাফে ছুটে গিয়ে কালমার গলায় ছোরাটা চেপে ধরল। কালমা তো অবাক। ফ্রান্সিসও লাফিয়ে উঠে কালমার তরোয়ালটা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে নিল। তরোয়ালের ডগাটা কালমার গলায় চেপে ধরল। দাঁতচাপাস্বরে বলল—টুঁ শব্দটি করেছো কি মরেছো। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে কালমার বর্মের চামড়ার ফিতে কেটে দিল। খোলা ভারি বর্মটা আস্তে আস্তে ঘাসের বিছানায় নামিয়ে রাখল যাতে কোন শব্দ না হয়। খোলা পাথরের মেঝেয় পড়লেই শব্দ হত। পাশের ঘরের মূর পাহারাদারটির কানে শব্দ পৌঁছতো।

ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—শাঙ্কো—কালমাকে সামলাও। ফ্রান্সিস তরোয়াল নামাল। শাঙ্কো কালমার বুকে ছোরা চেপে ধরল।

ফ্রান্সিস কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে এল। পাথরের দেয়ালে গা ঘেঁষে মারিয়ার কয়েদঘরের দিকে চলল। আসতে আসতে দেখল সামনের চত্বরে কোন সৈন্য নেই। চত্বরের পরে কাঠের সদর দরজার কাছে মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখল কয়েকজন মূর সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

মারিয়ার ঘরের দরজার কাছে উঁকি দিয়ে দেখল মূর পাহারাদারটি জল ঢেলে দিচ্ছে । মারিয়া আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে। পাহারাদারটি বেশ তাগড়াই জোয়ান। ওর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াই চালানো যাবে না। শব্দ হবেই। লড়াই করতে করতে মূর পাহারাদারটিও দরজার কাছে দাঁড়ালো। মূর সৈন্যদের চেঁচিয়ে ডাকতে পারে। না—অন্যভাবে ওকে ঘায়েল করতে হবে যাতে টুঁ শব্দটিও গলা দিয়ে না বেরোয়। দেয়ালের আংটায় আটকানো দুটো মশাল জ্বলছে। মশালের আগুন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহারাদারটি ঘর থেকে বেরোলেই ওকে দেখে ফেলবে। ফ্রান্সিস পাথরের দেয়ালে যেন সেঁটে রইল। পাহারাদারটি মারিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছে তখনই ফ্রান্সিস এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহারাদারটির ওপর। আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কায় পাহারাদারটি লোহার দরজায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার পেছনে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে জোরে ঘা মারল। পাহারাদারটি লোহার দরজায় ঘাড় গুঁজে পড়ল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে বারান্দায় গড়িয়ে পড়ল। আর উঠল না। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে ডাকল—মারিয়া। মারিয়া অবাক চোখে এই কাণ্ড দেখছিল। ডাক কানে যেতেই ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দু'জনে ছুটে এল শাঙ্কোদের ঘরে। ফ্রান্সিস হাতের ইশারায় শাঙ্কো আর সালভাকে ডাকল। কালমার

পিঠে ছোরা চেপে ধরল শাঙ্কো। বলল, চলো। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ফ্রান্সিস আংটায় রাখা জ্বলন্ত মশালটা তুলে ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের বিছানায়। শুকনো ঘাসে আগুন লেগে গেল।

বারান্দা দিয়ে নিঃশব্দে চলল ওরা। ফ্রান্সিস বারান্দার একটা জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে ফেলল মারিয়ার কয়েদ ঘরটায়। ও ঘরেও আগুন লেগে গেল। অজ্ঞান মূর পাহারাদারটি তখনও বারান্দায় পড়ে আছে। ওকে ডিঙিয়ে পার হ'ল সবাই। এবার ফ্রান্সিস কালমার পিঠে তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে বলল—কালমা—মরণজলা দিয়ে পালাবো আমরা। মরণজলায় নিয়ে চলো। কালমা চমকে উঠল। ভয়ার্তস্বরে বলে উঠল—না-না-মরণজলা পার হতে পারবে না। মারা পড়বে।

—এখানে থাকলেও মরবো। ফ্রান্সিস বলল।

—কিন্তু—কালমা কী বলতে গেল।

—কোন কিন্তু না। —তিনজন বন্দী ঐ পথে পালিয়েছিল। ফ্রান্সিস বলল।

—পরে ওদের কেউ দেখেনি। কালমা বলল।

—পলাতকরা কি পালানোর গপ্‌পো বলে বেড়ায়। নিশ্চয়ই ওরা পালাতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি চলো। ফ্রান্সিস তাড়া লাগাল।

ওদিকে কয়েদঘরে ধোঁয়া আগুন ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। মূর সৈন্যরা হৈ হৈ করে উঠল। বারান্দার পরেই বাঁ দিকে অন্ধকার ঢালু পাথুরে জমি। ফ্রান্সিসরা সেই পাথুরে জমিতে ততক্ষণে নেমে পড়েছে। অল্প চাঁদের আলোয় ওরা দ্রুত চলেছে।

বেশ কিছুটা নেমে শুরু হল এবড়ো-খেবড়ো পাথর জংলা গাছ ঘাস ঢাকা জায়গা। কালমা সবার আগে নামতে লাগল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদিকে মূর সৈন্যদের হৈ হল্লা চলছে তখন। আগুন নেভানো চলছে। ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—কালমা জল্‌দি।

একটু পরেই সামনে বিরাট দেয়াল। কালো রঙের পাথরের। কালমা দেয়ালের নিচে একটা ছোট কাঠের দরজার সামনে এসে হাঁপাতে লাগল। দরজায় একটা তালা ঝুলছে। এখন হাঁপাচ্ছে সকলেই। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় কালমা চাবির গোল রিং-এ চাবি খুঁজতে লাগল। মারিয়ার দু'হাত তখনও বাঁধা। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা দাড়ি কেটে দিল। মারিয়া মরণজলা কথাটা শুনে পর্যন্ত ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। ও আর থাকতে না পেরে ফ্রান্সিসকে বলল—মরণজলা পার হতে পারবে?

—পারতেই হবে। নইলে এই দুর্গে পচে মরতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। কালমার দুটো চাবি লাগল না। তারপরেরটা ঢুকিয়ে চাপ দিতেই কড়াৎ—তালা খুলে গেল। শাঙ্কো ছোট দরজাটা খুলে দিল। প্রথমে শাঙ্কো ঢুকে গেল। তারপর সালভা মারিয়া। ফ্রান্সিস যখন ঢুকছে তখন শুনল কালমা বিড় বিড় করে বলছে—যীশু তোমায় রক্ষা করুন। ফ্রান্সিস একবার কামলার দিকে তাকিয়ে দরজা পার হল।

হুপ্ হুপ্ হাঁটুর নিচ অব্দি কাদাজলে ডুবে গেল সকলের। চারদিকে চাঁদের অনুজ্জ্বল আলো। এখানে অন্ধকার কাটে নি তা'তে।

ফ্রান্সিস সামনে তাকিয়ে দেখল—লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের জঙ্গল। আশ্চর্য। ঘাসগুলো সবুজ নয়। মরা ঘাসের মত হলুদ ঘাসের বনের এখানে ওখানে ঘন কুয়াশা জমে আছে। বুনো ঘাসের জঙ্গলের উপরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাদাটে কুয়াশা ঢাকা। বোঝাও যাচ্ছে না—এই বন কতদূর বিস্তৃত। ওদিকে দুর্গের মধ্যে মূর সৈন্যদের চিৎকার চ্যাঁচামেচি কমে এসেছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—মূর সৈন্যরা কি আমাদের ধাওয়া করতে পারে?

—পাগল হয়েছেন। এই মরণজলার কথা ওরা এরমধ্যেই ভালো ক'রে জেনে গেছে। সালভা বলল।

—জলাটা কতদূর ছড়িয়ে আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—বড় রাস্তা থেকে তো বহুদিন দেখে আসছি। জলাটা ডাইনে বাঁয়ে লম্বাটে। কিন্তু পাশে কম। উত্তরমুখো গেলে পার হতে কম সময় লাগবে। সালভা বলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল হাতে ঘাসের বনের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে গলা চড়িয়ে বলল—উত্তরমুখো চলো। আমার পেছনে পেছনে এসো। সবাই ঘাসের বনে ঢুকল।

জলকাদা ভেঙে চলল। উঁচু উঁচু ঘাসের জঙ্গলে ওরা ঢাকা পড়ে গেল। শুধু মাথার ওপরে সাদাটে মেঘের আকাশ আর অনুজ্জ্বল চাঁদ। দিক ঠিক রেখে ফ্রান্সিস এগিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া, শাঙ্কো, সালভা। কাদাজলের নিচে পাথরকুচি রয়েছে। ওরা এগিয়ে চলল। ফ্রান্সিস তরোয়াল চালিয়ে ঘাস কাটতে কাটতে এগিয়ে যেতে লাগল। তরোয়ালের কোপে হলুদ ঘাসগুলো বেশি কাটছে না। যতখানি কাটা পড়ছে তার মধ্যে দিয়েই ওরা চলল। শুধু জলকাদা ভাঙার হুপ্‌হুপাৎ শব্দ। চারদিকে আর কোন শব্দ নেই। চারপাশের ঘাসগুলো ওদের গায়ে মুখে হাতে ঘষে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাতে জ্বালা অনুভব করল। চাঁদের অল্প আলোয় দেখল—ধারালো ঘাসের ঘষায় হাত আঁচড়ে গেছে। সেই জায়গাগুলোয় জ্বালা শুরু হ'ল। মারিয়া বলে উঠল—ফ্রান্সিস হাতে-মুখে ভীষণ জ্বালা করছে। শাঙ্কো সালভাও বলে উঠল—হাতমুখ জ্বালা করছে। ফ্রান্সিস অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় দেখল—মারিয়ার সারা মুখে ঘাসের আঁচড়ের দাগ। অল্প রক্তেরও দাগ এখানে ওখানে। হাতে-মুখে জ্বালা সহ্য করতে করতে ফ্রান্সিস বুঝল—কেন এটাকে মরণজলা বলে।

জলকাদা ঠেলে চলতে চলতে তখন ভীষণ হাঁপাচ্ছে সবাই। একদিকে পা সাবধানে ফেলতে হচ্ছে। দু'হাতে সরাতে হচ্ছে ঘাসের বাধা। তারপর প্রায় অন্ধকারে হাঁটতে হচ্ছে। তার ওপর আঁচড়কাটা হাতে-মুখে জ্বলুনি।

কতদূর এল। আরো কতদূর যেতে হবে—কিছুই বুঝতে পারছে না ওরা। মারিয়া আর সহ্য করতে পারল না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—ফ্রান্সিস—সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। ফ্রান্সিস হাঁটতে হাঁটতে বলল—ভাবো যে, দেশের রাজধানীর পাথরবাঁধানো পরিষ্কার পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছো, দেখবে পারছো। মারিয়া মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে

নিতে এলোমেলো পা ফেলে চলল। আর পারল না। ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল—ফ্রান্সিস আমি পড়ে যাচ্ছি। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। তরোয়ালটা কোমরে গুঁজল। দু'হাত নিচু করে এক হ্যাঁচকা টানে মারিয়াকে তুলে কাঁধে শুইয়ে দিল। তারপর বাঁ হাতে মারিয়াক চেপে ধরে হাঁটতে লাগল। আস্তে আস্তে সকলেরই সারা গায়ে জ্বলুনি শুরু হল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে সহ্য করতে লাগল। একে সালভা চাবুকের মার খেয়ে আহত। বৈদ্যির ওষুধে একটু সুস্থ হ'য়েছিল। এখন এই পরিশ্রম, সারা শরীরে জ্বলুনি। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ শোনা গেল। ফ্রান্সিস ডান হাত বাড়িয়ে সালভাকে চেপে ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়। সালভা এলোমেলো পা ফেলে চলল।

হঠাৎ ঘাসের জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পায়ের নিচে শক্ত পাথুরে জমি ঠেকল। সালভা অনেক কষ্টে সামনের দিকে তাকাল। ঘাসের বন শেষ। আবছা দেখল একটা ঘাসে ঢাকা টিলা। সালভা সমস্ত গায়ের শক্তি একত্র করে চিৎকার করে উঠল—ফ্রান্সিস—আমরা এসে গেছি। সামনে—টিলা।

আস্তে আস্তে হেঁটে ওরা পাথুরে জমিতে উঠল। প্রায় ভেঙে-পড়া শরীর নিয়ে টলতে টলতে গিয়ে সালভা পাথুরে জমিতে শুয়ে পড়ল। শাঙ্কোও বসল। তারপর শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে মারিয়াকে নামিয়ে দিল। মারিয়া শুয়ে পড়ল। চোখ বোঁজা ফ্রান্সিস মারিয়ার এই অসাড় অবস্থা দেখে চমকে উঠল। ডাকল—মারিয়া? মারিয়া চোখ মেলে তাকাল। একটু হাসল। ফ্রান্সিস হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে পাথুরে জমিতে বসে পড়ল। তাকিয়ে রইল মরণজলার দিকে। তারপর শুয়ে পড়ল।

পূব আকাশ লাল হয়ে উঠল। একটু পরেই সূর্য উঠল। আস্তে আস্তে রোদের তেজ বাড়তে লাগল। এতক্ষণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে থাকা ফ্রান্সিসরা যেন শরীরে একটু সাড় পেল। প্রথমে ফ্রান্সিসই উঠে বসল। দেখল রোদ পড়েছে টিলার গায়ে মরণজলায় দূরের দুর্গের মাথায়। হাতে মুখের জ্বালাভাবটা এখনও আছে। এ যে বাড়ে নি। ও তাকাল পায়ের দিকে। প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলকাদায় মাখামাখি। গায়ের পোশাকেও জলকাদার ছিটে। পায়ের কালো কাদা এখনও শুকোয় নি। শাঙ্কোদের দিকে তাকাল। ওদেরও এক অবস্থা। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো, সালভা—ওঠো। ডাক শুনে মারিয়া উঠে বসল। এবার শাঙ্কো আর সালভা উঠল। ফ্রান্সিস নিজের ঢোলা পোশাকটার মধ্যে ঢোলা গলা দিয়ে হাত ঢোকাল। নক্শাটা বের করে আনল। যাক—নক্শাটা ঠিকই আছে। জল কাদা লেগে আঁকা মুছে যায়নি।

সালভা বলল—ফ্রান্সিস—টিলাটার ওপাশে চাষীদের বসতি আছে। ফ্রান্সিস বলল—ওখানে বৈদ্যিটদ্যি পাওয়া যাবে। সবারই হাত মুখ ঘাসের ঘষায় যেভাবে আঁচড়ে গেছে। জ্বালা জ্বালাভাব। ওষুধ চাই। —খোঁজ নিয়ে দেখি। চলুন। সালভা উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসও উঠে দাঁড়াল। বলল—শাঙ্কো—মারিয়া চলো।



ওরা আস্তে আস্তে হেঁটে চলল টিলাটার পেছন দিকে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখল কিছু গাছপালা। তারই পরে দেখা যাচ্ছে পাথরের কিছু বাড়িঘর।

ওরা বাড়িগুলোর কাছে আসতেই বাড়ির বাইরে স্ত্রীপুরুষ যারা ছিল তারা ওদের দেখল। জলকাদামাখা মানুষগুলো কোত্থেকে এল? সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কে চেঁচিয়ে বলল—কারা আসছে গো? বাড়িঘর থেকে আরো মেয়েপুরুষ বেরিয়ে এল। হঠাৎ সালভা ওদিকে ছুটতে ছুটতে ডাকল—বাবা-আ। দেখা গেল জেলেদের পোশাক পরা একজন মধ্যবয়স্ক লোক দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। সালভা ছুটে গিয়ে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরল। একটি ছোট ছেলে আর একটি অল্পবয়সী মেয়েও ছুটে এসে সালভাদের ঘিরে দাঁড়াল। দুটি ছেলেমেয়েই খুশির হাসি হাসছে। বোঝা গেল সালভার ভাই বোন। সালভা ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা এসে ওখানে দাঁড়াল। সালভা বলল—ফ্রান্সিস—আমার বাবা ভাইবোন বেঁচে আছে। মুর সৈন্যরা আমাদের বস্তীতে আগুন লাগিয়েছিল। অনেকেই পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে।

—তোমার মা? মারিয়া বলল।

—কয়েক বছর আগে মাকে হারিয়েছি। সালভা বলল।

—বাবা—এখানে কোন বৈদ্যি আছে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তোরা স্নানটান করে আয়—আমি বৈদ্যিবুড়োকে ডেকে আনছি। সালভার বাবা চলে গেল।

সালভার বোনটি তখনও মারিয়ার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মারিয়ার হাতে সারা মুখে আঁচড়ের মত দাগ। জলকাদা মাখা পোশাক। মারিয়া বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। চলল বাড়িগুলোর পেছন দিকে। সালভা বলল—ফ্রান্সিস চলো স্নান সেরে নি। শরীরের যা অবস্থা। সালভা চলল—ঢালু উপত্যকার দিকে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোও চলল। ওর পেছনে পেছনে নেমে আসতেই দেখল—দু'তিনটে পাথরের গা বেয়ে ছোট ঝর্ণার জল নেমে আসছে। ঝিরঝির্ ঝর্ণার জল পাথর-ঘেরা একটা জায়গায় হাঁটু অব্দি জমে আছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো স্নান করতে লাগল। সালভার পিঠের চাবুকের ঘা তখনও তো সারে নি। সালভা হাঁটু পর্যন্ত ভালো করে ধুল। মাথায় বুকে জল দিল। ঐ যা! স্নান হল ওর।

স্নান সেরে ওরা ফিরে এল। দেখল একটা ঘরের সামনে একটা পাথরের ওপর মারিয়া স্নান সেরে চাষী মেয়েদের পোশাক পরে বসে আছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ো। হাতের একটা পুঁটুলি খুলছে। বোঝা গেল—বৈদ্যিবুড়ো। একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বৈদ্যি একটা কাঠের বাটি ভর্তি জল তুলে নিল। পুঁটুলিটা জলে নাড়তে লাগল। আস্তে আস্তে জলের রঙ হলুদ হয়ে গেল। এবার বৈদ্যিবুড়ো ঐ পুঁটুলিটা মারিয়ার আঁচড় কাটা হাতে মুখে গলায় বুলোতে লাগল। কয়েকবার বুলোতেই মারিয়া হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। —বলল—আঁচড়গুলোর জ্বালা অনেক কমে গেছে। মারিয়ার পর ফ্রান্সিসদেরও বদ্যিবুড়ো ওষুধ লাগিয়ে দিল। সবাইয়ের জ্বালা

কমে গেল। সালভা পিঠের ঘা-এর কথা বলল। পোশাক খুলে দেখাল। বৈদ্যিবুড়ো ওষুধ তৈরি করতে বসল। ওদিকে বাড়ির মেয়েরা ফ্রান্সিসদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল।

সালভাকে ওষুধ দিয়ে বৈদ্যিবুড়ো ওষুধের ঝোলা গোছাতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—সত্যি আপনার ওষুধে অনেক উপকার হল। জ্বালাভাবটা প্রায় নেই বললেই হয়। বৈদ্যিবুড়ো ফোকলামুখে হাসল। বলল—মরণজলার মত লম্বা লম্বা ঘাস এখানে অনেক জায়গায় আছে। এই ঘাস শুকিয়ে ঘরের ছাউনিতে লাগে। ঘাস কাটতে গিয়ে ধারালো ধারগুলোয় লেগে হাতমুখ নখের আঁচড়ের মত কেটে যায়। জ্বালা করে। এই ওষুধেই সেরে যায় সে সব।

—তবে মরণজলার ঐ নাম হয়েছে কেন? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। বৈদ্যিবুড়োর মুখ গম্ভীর হল। বলল—তোমরা ভিনদেশী জানো না। মরণজলার ঘাসের আঁচড় সেরে যায়। কিন্তু মরণজলার মারাত্মক জলেকাদায় তুমি যদি একবার পড়ে যাও—ঐ আঁচড়কাটা জায়গা বিঁধিয়ে উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমি জ্ঞান হারাবে—তারপর—। বৈদ্যিবুড়ো চুপ করে গেল। তারপর আপনমনে হেঁটে চলে গেল। সে কি! মারিয়া ভীতমুখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ভয়ার্ত স্বরে বলল—ফ্রান্সিস—আমরা—মানে—আমরা—। ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল। বলল—হ্যাঁ—আমরা বেঁচে আছি। শাঙ্কো দু'হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়ল। কী সাংঘাতিক! মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে ওরা।

ফ্রান্সিসরা সেই রাতটা ঐ চাষীদের বসতিতেই কাটাল। ওদের একটা ঘর চাষীরা ছেড়ে দিয়েছিল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে বলল সালভাকে ডেকে আনতে। সালভা এল। দেখা গেল সালভা ওর তরোয়াল কাটা চাবুকে ছেঁড়া পোশাকটা পাল্টে নতুন পোশাক পরেছে। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমার শরীর এখন কেমন? সালভা বলল—এমনিতে ভালোই। তবে বৈদ্যিবুড়ো বলল—পিঠের ঘা এখনো সম্পূর্ণ সারে নি। আর দু'দিন ওষুধ পড়লেই সেরে যাবে।

—কিন্তু আমরা তো বেশি দেরি করতে পারবো না। তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে আমাদের। বন্ধুরা চিন্তায় পড়বে নইলে। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। আপনারা এখন কী করবেন? জাহাজে ফিরে যাবেন? সালভা বলল।

—না না। এখন রাজধানী পালমায় যাবো।

আলিমুদাইনা রাজপ্রাসাদে রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করবো। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ চলুন। সালভা বলল।

—কিন্তু তুমি তো এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নও। মারিয়া বলল।

—ওষুধ নিয়ে যাবো—লাগাবো। আমি যেতে পারবো। সালভা বলল। ফ্রান্সিস

বলল—এবার বলো তো—রাজধানী পালমাতে আমরা কোন পথ দিয়ে যাবো?

—একটা তো রাস্তা, মানে বড় রাস্তা। পালমা নোভার ঐ দুর্গের পাশ দিয়েই রাস্তাটা এসে এখান থেকে একটু দূর দিয়ে সোজা রাজধানী পালমাতে চলে গেছে। সালভা বলল। ফ্রান্সিস একটু চুপ করে থেকে বলল—

—কিন্তু আল আমিরির মূর সৈন্যরা নিশ্চয়ই রাস্তাটা পাহারা দিচ্ছে যাতে কেউ রাজধানীতে যেতে না পারে।

—হ্যাঁ তা বটে। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি গোপনে খোঁজ-খবর করে আসছি। সালভা ·বলল। তারপর চলে গেল।

দুপুরের আগেই সালভা ফিরে এল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। বলল—দুর্গের পর থেকেই অনেকদূর রাস্তার ধারে ধারে আল আমিরির মূর সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়েছে। ফ্রান্সিস বলল—পালমার দিকে শেষ ঘাঁটিটা কোথায়?

—কিছু দূরে—একটা কাঁঠের সাঁকোর পাশে। সালভা বলল।

—তাহলে ঐ একটা ঘাঁটি পার হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। ফ্রান্সিস বলল। সালভা চলে গেল। মারিয়া বলল—কী করে সাঁকোটা পার হবে?

—তাই ভাবছি। ফ্রান্সিস ছোট ঘরটার মেঝেয় পায়চারি করতে করতে বলল। ফ্রান্সিস ভেবে চলেছে। হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল। শাঙ্কো বলে উঠল—কী হল? ফ্রান্সিস বলল—সব ছক কষা হয়ে গেছে।

—শিগগির সালভাকে ডাকো। সালভাকে ডাকতে হল না? ও তখনই ডুমুরের ঝোল আর ক'টা গোল রুটি নিয়ে এল কাঠের থালায় করে। সবাই খেতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল—

—সালভা—এখানে তো চাষবাস হয়?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ কিছু ক্ষেতখামার আছে এখানে। সালভা বলল!

—কী কী বেশি চাষ হয়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—ডুমুর বাদাম খুবানি এসব। সালভা বলল।

—ঐসব চাষীরা কোথায় বিক্রি করে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এখান থেকে পালমা যাওয়ার রাস্তার ধারে কোস্তা বন্দর থেকেই এসব মেনোরকা আর্মিনিয়া চালান যায়। সালভা বলল।

—এসব ফসলটসল কী করে কোস্তায় নিয়ে যাওয়া হয়? ফ্রান্সিস বলল।

—খচ্চরের টানা গাড়িতে করে। সালভা বলল।

—বেশ বর্ধিষ্ণু চাষী—খচ্চর টানা গাড়িটাড়ি আছে।—

মালপত্র চালান দেয়—তোমার চেনা এমন কেউ আছে এখানে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সালভা বলল।

—চলো—তার সঙ্গে আমি কথা বলবো। ফ্রান্সিস বলল।

খাওয়া সেরে চলল দু'জনে। একটা বাড়ির সামনে সালভা ফ্রান্সিসকে নিয়ে

এল। বাড়িটার পাশেই বেশ লম্বা একটা ঘর। সালভা বলল—এটা গুদোম ঘর, মালিক চাষী পাঁচছ'টা খচ্চরকে দানাপানি খাওয়াচ্ছিল। ওদের দিকে এগিয়ে এল। সালভা ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু। একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইছে। চাষীটি ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—আপনার মালভর্তি গাড়ি নিয়ে যাবো আমরা। (কোস্তার আড়তে সব পৌঁছে দেব। চাষীটি দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে হেসে বলল—এতো ভালো কথা। মূর সৈন্যদের জ্বালায় কোন মালই পাঠাতে পারছি না। গুদোমে সব ডাঁই হয়ে জমে আছে।

—ঠিক আছে। আমরা খেয়ে দেয়ে আসছি। আপনি চারটে বস্তায় মাল ভরিয়ে রাখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—বেশ তো। আমার লোকই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। চাষীটি খুশি হয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—কে চালিয়ে নিয়ে যাবে সেটা পরে ঠিক করছি।

ফেরার সময় ফ্রান্সিস বলল—সালভা তোমার বাবাকে নিয়ে এসো। একটু কাজ আছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা তৈরি হয়ে গুদোম ঘরের দিকে চলল। ফ্রান্সিস দেখল মারিয়া সেই চাষী মেয়েদের ঢোলা পোশাকটাই পরে আছে। বলল—কী ব্যাপার? তোমার গাউনটা কী হল?

—ওটা সালভার বোনকে দিয়ে দিয়েছি। মারিয়া হেসে বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না।

ফ্রান্সিস গুদোম ঘরে ঢুকে দেখল—চারটে ডুমুর বাদাম খুবানি ভর্তি বড় বস্তা রাখা হয়েছে। সালভার বাবাই এসব বস্তায় লোক এনে ভরিয়েছে। ফ্রান্সিস ঐ লোকগুলোকে চলে যেতে বলল। লোকগুলো চলে গেল। এবার ফ্রান্সিস সালভার বাবাকে বলল—দেখুন—আমরা চারজন চারটে বস্তার মধ্যে লুকোব। আমরা বস্তায় ঢোকার পর আপনি ডুমুর বাদাম এসব ঢেলে বস্তার মুখটা বেঁধে দেবেন। সালভার বাবা তো অবাক। ফ্রান্সিস বুঝিয়ে বলল—মূর সৈন্যদের শেষ ঘাঁটিটা আমাদের এভাবেই পার হতে হবে। ওরা বুঝতেই পারবে না। সালভার বাবা মাথা ঝাঁকাল। তারপর কাজে হাত লাগাল। প্রথমে একটা বস্তা থেকে ডুমুর বাদাম বের করল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে মারিয়া বস্তাটায় বসে পড়ল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। বলল—চোখ বন্ধ কর। মারিয়া মাথা নিচু করে চোখ বন্ধ করল। ফ্রান্সিস এবার ডুমুর বাদাম এসব ঢালল। বস্তা ভরে গেল।

একইভাবে শাঙ্কো আর সালভাও বস্তাবন্দী হল। এবার ফ্রান্সিস সালভার বাবাকে বলল—একটি অল্প বয়েসের ছেলেকে ডেকে আনুন যে খচ্চরের গাড়ি ভালো চালাতে পারে। কিন্তু সাবধান ছেলেটিকে আমাদের কথা বলবেন না। বলবেন এইসব মাল তোকে কোস্তের আড়তে পৌঁছে দিতে হবে। ছেলেটা এলে কাজের লোকগুলো ডেকে গাড়িটার একপাশে প্রথমে আমাকে তার ওপরে মারিয়াকে রাখবেন। সালভার পিঠের ঘা এখনও সম্পূর্ণ সারে নি। আর একপাশে শাঙ্কোর ওপর সালভাকে

রাখবেন। বুঝেছেন সমস্ত ব্যাপারটা? সালভার বাবা মাথা নেড়ে হাসল। এবার ফ্রান্সিস বস্তায় ঢুকল। সালভার বাবা ওকে বস্তাবন্দী করল।

ফ্রান্সিসের নির্দেশমত সালভার বাবা কাজের লোকদের ডেকে ওদের গাড়িতে তুলে সাজিয়ে রাখল। একটা অল্পবয়সী ছেলেকেও জোগাড় করা হল। ছেলেটির হাতে কাঠের ছোট লাঠির মাথায় চামড়া বাঁধা চাবুক দেওয়া হল। ছেলেটি খুব খুশি। গাড়িতে উঠেই চাবুক হাঁকাল খচ্চর দুটোর পিঠে। একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি চলল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি চলল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি এসে উঠল সদর রাস্তায়। এবার গাড়ির ঝাঁকুনি অনেকটা কমল। শাঙ্কোর নাকে ডুমুরের বোঁটার খোঁচা লাগল। হেঁচে ফেলতে গিয়ে শাঙ্কো ডুমুরগুলোর মধ্যেই নাক চেপে ধরল। হাঁচি আটকে গেল। শাঙ্কো নিশ্চিন্ত হল। গাড়ি চলল ঢিকির্ ঢিকির্। ছেলেটির ছপাৎ ছপাৎ চাবুক চালাবার শব্দ শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ ছেলেটি সরু গলায় জোরে গান গাইতে লাগল। গাড়িও চলেছে গানও চলেছে। মাঝে মাঝে পাথরের টুকরোয় চাকা লেগে গাড়িটা লাফিয়ে উঠছে। জোর ঝাঁকুনি ফ্রান্সিসরা মুখ বুঁজে সহ্য করছে।

হঠাৎ ছেলেটির গান বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল সাঁকোর কাছে গাড়ি এসেছে। একজন পাহারাদার মুর সৈন্যের চড়া গলা শোনা গেল। কী যেন বলল। ছেলেটিও ভাঙা ভাঙা আরবী ভাষায় কী বলল। 'কোস্তা' কথাটা ফ্রান্সিস বুঝল। ছেলেটি কোস্তার আড়তে যাবার কথা বলছে। আরো কিছু কথা হল। ফ্রান্সিসের পরিকল্পনার হিসেব মিলে গেল। একে বিকেলবেলা তার ওপরে মালগাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা অল্পবয়সী চাষী ছেলে। সৈন্যদের মনে সন্দেহ হল না। গাড়ি চলতে শুরু করল। তখনই হঠাৎ একটি সৈন্য বস্তায় তরোয়ালের খোঁচা দিল। মারিয়ার হাতের ফাঁক দিয়ে তরোয়ালের ডগাটা লাগল ফ্রান্সিসের পিঠে। ফ্রান্সিস একচুল নড়ল না। বস্তার গায়ে রক্ত ফুটে ওঠার আগেই গাড়ি কিছুটা চলে এল। গাড়ি চলল।

ছেলেটার মুখের হাঃ হাঃ শব্দ আর হাতের চাবুকের শব্দ শুনতে শুনতে ফ্রান্সিসরা এগিয়ে চলল।

বেশ কিছুটা সময় গেল। ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে চাপা গলায় ডাকল—মারিয়া। মারিয়া মৃদু শব্দ করল—উঁ? ফ্রান্সিস তেমনি চাপা গলায় বলল—মনে হচ্ছে না যেন বাড়ির নরম পালঙ্কের বিছানায় শুয়ে আছি। মারিয়া একটু জোরেই বলে ফেলল—তোমার মুণ্ডু। ছেলেটির কানে আস্তে হলেও কথাটা পৌঁছল। ছেলেটি চমকে পেছনের বস্তাগুলোর দিকে তাকাল। ঠিক বুঝল না। তবু ও ভুল শুনল কিনা বুঝতে চেঁচিয়ে বলল— কে কথা বলল? এ্যাঁ? শাঙ্কো আর নিজেকে সামলাতে পারল না। বলে উঠল—ভূত। আর কোথায় যাবে! ছেলেটি চাবুক ছুঁড়ে ফেলে একলাফে গাড়ি থেকে নেমেই রাস্তার পাশের ডুমুর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ছুট লাগাল। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে বস্তা কিছুটা কেটে ফেলে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকল—এই

ছোঁড়া—ভয় নেই। চলে আয়। কে কার কথা শোনে। ছেলেটি ততক্ষণে ডুমুর ক্ষেত পার হয়ে ছুটে চলেছে।

শাঙ্কো ছোরা দিয়ে বস্তার অনেকটা কেটে বেরিয়ে এল। মারিয়া ফ্রান্সিস আর সালভার বস্তার মুখ বাঁধা দড়ি কেটে দিল। সবাই বস্তা থেকে বেরিয়ে হাঁফাতে লাগল। বস্তার মধ্যে এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে থাকা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল যেন। ততক্ষণে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সালভা রাস্তা থেকে চাবুকটা তুলে নিয়ে চালকের জায়গায় বসল। গাড়ি চালাতে লাগল সালভা।

ফ্রান্সিস ঘুরে বসতেই মারিয়া দেখল ফ্রান্সিসের পিঠের দিকে জামাটায় রক্তের দাগ। মারিয়া বলল—তোমার পিঠটা তরোয়ালে কেটে গেছে। ফ্রান্সিস হাসল—ও কিছু না। এখন অনেক ভাবনা—এসব ভাবার সময় নেই।

সন্ধ্যের পরে কোস্তার কাছাকাছি এসে সালভা বলল—ফ্রান্সিস কোস্তা এসে গেছি। কী করবে এখন? ফ্রান্সিস বলল—ঐ চাষীর মালগুলো যা আছে তোমার কোন পরিচিত আড়তদারের কাছে রাখো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে এই গাড়িতে চড়েই পালমার দিকে যাত্রা শুরু করবো।

—রাতটা বিশ্রাম নেবে না? সালভা বলল।

—উঁহুঁ—হাতে সময় কৈ। ফ্রান্সিস বলল।

সালভা গাড়ি থেকে নেমে গেল। কোস্তা বন্দর এলাকাটা বেশ জমজমাট। তিন-চারটে জাহাজ জাহাজঘাটায় রয়েছে। একপাশে বেশ কয়েকটা গুদোমঘরের মত। খচ্চরে টানা গাড়ি আসছে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্র গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। লোকজনের ব্যস্ততা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সালভা ফিরে এল। বলল—ঠিক আড়তদারকেই পেয়েছি। লোক পাঠাচ্ছে। মাল তুলে নেবে। আড়তদারের লোকজন এল। সব মাল নিয়ে গেল আড়তে।

রাত বাড়ছে। ফ্রান্সিস বলল—খেতে চলো সব। গাড়ি থেকে নামল সবাই। এদিক ওদিক খুঁজে ফ্রান্সিস একটা ছোট সরাইখানা বের করল। একটা বড় সরাইখানা ছিল। বেশ ভীড়। ফ্রান্সিস ঐ ভীড়ের সরাইখানায় গেল না।

গরম গরম গোল রুটি মুরগির মাংস পাওয়া গেল। বেশ সুস্বাদু রান্না। ফ্রান্সিসরা সবাই পেট ভরে খেল।

গাড়িতে ফিরে এল সবাই। সালভা বলল—ফ্রান্সিস সারারাত তো গাড়ি চালাতে হবে।

—হ্যাঁ। শাঙ্কো আর আমিও চালাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো খচ্চর দুটোকে দানাপানি খাওয়াতে হয়। সালভা বলল। তারপর গাড়ি থেকে খচ্চর দুটোকে খুলে নিয়ে চলল যেখানে লোকেরা ঘোড়া খচ্চরগুলোকে দানাপানি খাওয়াচ্ছে।

ফ্রান্সিস মারিয়া আর শাঙ্কো গাড়িতে উঠল। ওরা সালভার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

সালভা কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এল খচ্চর দুটোকে নিয়ে। গাড়িতে জুতে গেল। তারপর চালকের জায়গায় বসল। রাত বেড়েছে। সারা কোস্তা বন্দরে এখন আর লোকজনের সাড়াশব্দ নেই।

সালভা গাড়ি চালাতে শুরু করল। গাড়ি চলল পালমার উদ্দেশ্যে। টানা রাস্তা চলেছে। জ্যোৎস্না অনেকটা উজ্জ্বল। দু'পাশে কোথাও ক্ষেতখামার কোথাও ছোট ছোট পাথুরে টিলা। মারিয়া কিছুক্ষণ জেগে রইল। তারপর আর পারল না। গাড়ির দুলুনিতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ও গাড়ির মধ্যে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বুঁজে বসেছিল। একবার চোখ খুলে ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাল। একটু এগিয়ে এসে মারিয়ার মাথাটা নিজের ডানপায়ের উরুর ওপর তুলে নিল। মারিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমুতে লাগল। শাঙ্কো জেগেই ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল। বলল—সালভা—তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি চালাচ্ছি। সালভা সরে এল। শাঙ্কো গাড়ি চালাতে লাগল। রাত শেষ হয়ে আসছে। তখন ফ্রান্সিস গাড়ি চালাচ্ছে।

পূব আকাশ লাল হয়ে উঠল। সেই লাল দিগন্তের আকাশের নিচে কিছু কালো কালো বাড়িঘরের মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস বুঝল ওটাই রাজধানী পালমার বাড়িঘর। ও ঘুমন্ত সালভাকে আর ডাকল না।

পালমা নগরে ওদের গাড়ি যখন ঢুকল তখন চারদিকে উজ্জ্বল রোদের ছড়াছড়ি। মারিয়ার ঘুম ভাঙল তখন। ও দু'পাশের বাড়িঘর দেখতে লাগল। সালভা আর শাঙ্কোও ঘুম ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসকে সালভা বলল—আপনি সরে আসুন আমি চালাচ্ছি।

সালভা গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—এখন কী করবেন? কোন সরাইখানায় খেয়েটেয়ে একটু বিশ্রাম করে রাজপ্রাসাদে যাবেন? ফ্রান্সিস মারিয়ার দিকে তাকাল। বলল—তোমার কি একটু বিশ্রাম চাই? মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—না। ঘুমিয়ে আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

—তাহলে আলমুদাইনা রাজপ্রাসাদেই চলো। ফ্রান্সিস বলল। তখনই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়া সেই চাষী মেয়েদের ঢোলা পোশাকটাই পরে আছে। এখন তো রাজপ্রাসাদে যেতে হবে। রাজার সঙ্গে দেখা করতে হবে। মারিয়া ওদের দেশের রাজকুমারী। তার এই পোশাকে যাওয়া ভালো দেখাবে না। ফ্রান্সিস বলল—সালভা তুমি তো এখানে ছিলে। মহিলাদের ভালো পোশাক কোথায় পাওয়া যায় নিশ্চয়ই জানো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যাবেন? সালভা গাড়ি থামিয়ে বলল। মারিয়া বুঝল ফ্রান্সিস কী চাইছে। মারিয়া বলল—আমার অন্য পোশাকের কোন প্রয়োজন নেই।

—কিন্তু এ দেশের রাজার সামনে এই পোশাকে—ফ্রান্সিস মৃদু আপত্তি করল। মারিয়া বলল—এটা তো এই দেশের চাষী মেয়েদেরই পোশাক। ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। সালভা গাড়ি চালাল।

পালমা নগরীতে তখন লোকজনের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। একটু পরে ফ্রান্সিসদের গাড়ি বিরাট রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল।

সালভা গাড়ি থেকে নামল। চারজন দ্বাররক্ষী লোহার দরজার দু'পাশে ঝক্‌ঝকে পেতলের কারুকাজ করা বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

সালভা দ্বাররক্ষীদের সঙ্গে কী কথাবার্তা ব'লে ফিরে এল। বলল—মুস্কিল হয়েছে। বছর কয়েক আগে এখান থেকে চলে গেছি। এরা সব নতুন দ্বাররক্ষী। আমাকে চেনে না। ফ্রান্সিস বলল—রাজার দেখা পাওয়া সহজে হবে না। বলল—তাহ'লে চলো—কোন সরাইখানায় যাই। অপেক্ষা করি। তুমিও সাক্ষাতের ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যাও।

ওরা কথা বলছে তখনই দ্বাররক্ষীরা হঠাৎ বেশ তৎপর হ'ল। লোহার দরজার টানা টানা গারদের মাথাখোলা কালো রঙের গাড়ি ভেতর থেকে আসছে। একটু পরেই গাড়িটা দরজার কাছাকাছি আসতেই দ্বাররক্ষীরা দু'জন দু'দিক থেকে দরজা খুলে ধরল। গাড়ির কালো গায়ে রুপোর কাপড়ের জোব্বামত পরা এক বৃদ্ধ। সালভা বলে উঠল—আরে মন্ত্রীমশাই। সালভা ছুটে গাড়িটার কাছে গেল। মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলে উঠল—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—আমার কিছু খুব প্রয়োজনীয় কথা বলার আছে। মন্ত্রীমশাই বোধহয় সালভাকে চিনলেন। আস্তে কী বললেন। গাড়ি থামল। সালভা মন্ত্রীমশাইর খুব কাছে গেল। মন্ত্রীমশাই পাকা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে হাসলেন। বললেন—কী ব্যাপার সালভা? পড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিলে কেন? সালভা হেসে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—সব বলবো আপনাকে। তাব আগে দু'টো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি। মহান পুরুষ রামন লাল আমাদের কুটীরে কয়েকদিন আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীমশাই চমকে আসনে উঠে বসলেন। ব'লে উঠলেন—এ কী বলছো সালভা। এতো—সাংঘাতিক খবর।

—আর একটা খবর—। মন্ত্রীমশাই সালভাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—সব শুনবো। তুমি গাড়িতে ওঠো। এক্ষুণি মাননীয় রাজাকে খবরটা দিতে হবে। সালভা ফ্রান্সিসদের দেখিয়ে বলল—কিন্তু আমার এই বন্ধুদের সঙ্গে আমি যেতে চাই। মন্ত্রীমশাই ফ্রান্সিসদের একবার দেখলেন। বললেন—ঠিক আছে—তুমি ওদের নিয়েই এসো। এই ব'লে উনি গাড়িচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন—প্রাসাদে ফিরে চলো। মন্ত্রীমশাইর গাড়ি ঘুরল। সালভা হাতছানি দিয়ে ফ্রান্সিসদের ডাকল। ফ্রান্সিসরা গাড়ি থেকে নেমে এল। তারপর মন্ত্রীমশাইর গাড়ির পেছনে পেছনে ওরা সদর দেউড়ি পার হ'য়ে রাজপ্রাসাদের দিকে হেঁটে চলল। দ্বাররক্ষীরা আর বাধা দিল না।

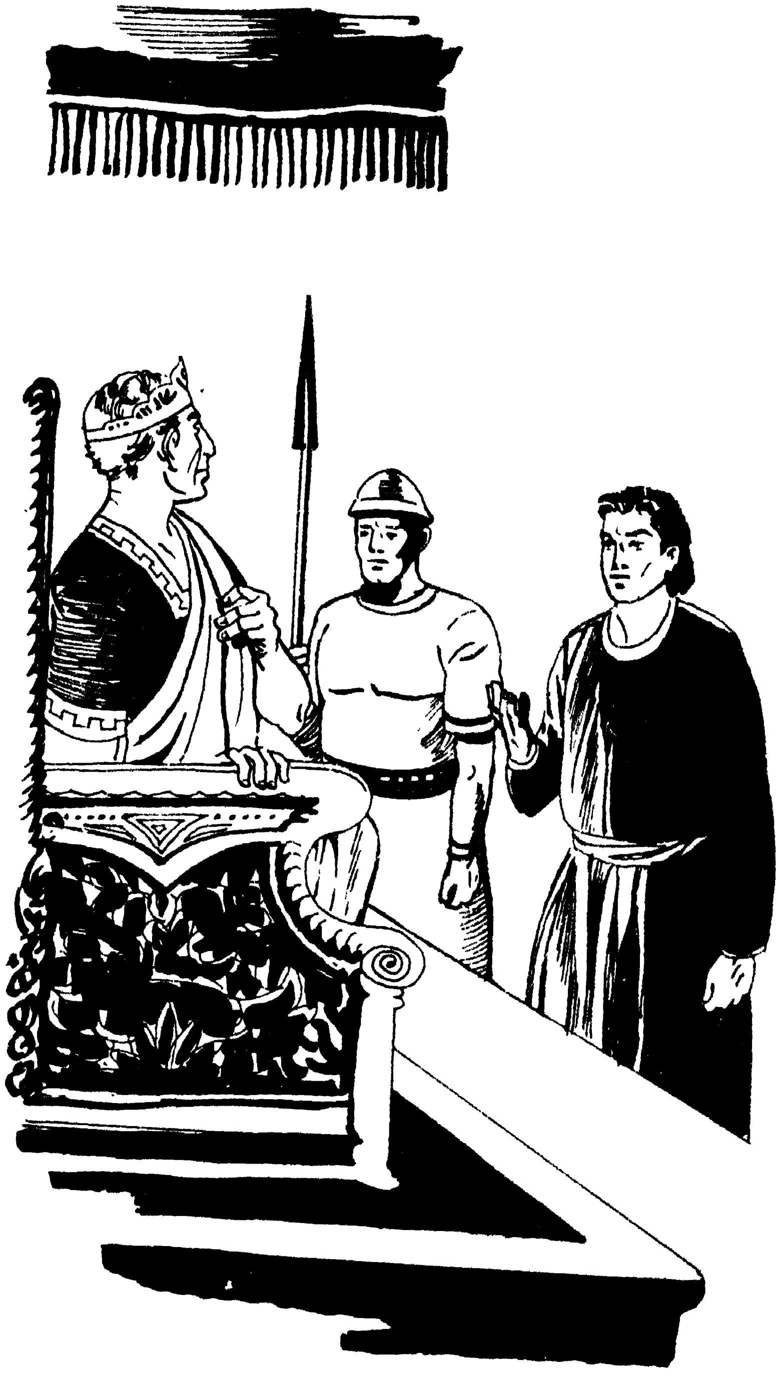
চারদিকে পাথরের দেয়ালঘেরা বিরাট জায়গা নিয়ে রাজপ্রাসাদ। এখানে ওখানে চৌকোনো তিনকোণা ফুলের বাগান। রোদে ঝল্‌মল করছে ফোটা ফুল। বাগানের মাঝখানে ফোয়ারার পর ফোয়ারা। পাথরে বাঁধানো ঝক্‌ঝকে রাস্তা চলে গেছে প্রধান দ্বারের দিকে। চারপাশের বাগান সবুজ মখমলের মত ঘাসে ঢাকা। ছোট ছোট মাঠ দেখতে দেখতে ওরা এগিয়ে চলল সেইদিকে। প্রধান দ্বারের সামনেই

মন্ত্রীমশাই গাড়ি থেকে নামলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন ফ্রান্সিস সালভাদের জন্য।

ওরা এল। মন্ত্রীমশাই ওদের নিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলেন। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। দ্বাররক্ষীরা সবাই পেতলের বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে। ওরা মন্ত্রীমশাইকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাতে লাগল। ডানহাতি একটা ঘরে মন্ত্রীমশাই ঢুকলেন। পেছনে ফ্রান্সিসরা।

ঘরের মাঝখানে বেশ বড় চক্‌চকে কালো পাথরের একটা গোল টেবিল। টেবিলের চারপাশে গদীঅলা ওককাঠের বাঁকা পায়ায় কারুকাজ করা চেয়ার পাতা। বোঝা গেল—এটা রাজার মন্ত্রণাকক্ষ। মন্ত্রীমশাই হাত বাড়িয়ে সবাইকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আস্তে বললেন—সংবাদ পাঠানো হয়েছে। মাননীয় রাজা এক্ষুণি আসবেন। ফ্রান্সিসরা চেয়ারে বসল। মন্ত্রীমশাইও একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তিনি খুবই চিন্তান্বিত। সবাই চুপ করে বসে রইল।

একটু দ্রুতপায়েই রাজা তৃতীয় জেমস্‌ মন্ত্রণাকক্ষে ঢুকলেন। রাজা মধ্যবয়স্ক। মুখে ছাটা দাড়ি গোঁফ। পরণে সাধারণ পোশাক। হলুদ রঙের জোব্বামত গায়ে। বুকের কাছে সোনার সুতোয় কাজ করা জলপাই পাতার মত নক্‌শা। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নুইয়ে রাজাকে সম্মান জানাল। রাজা সবাইকে হাতের ইঙ্গিতে বসতে ব'লে নিজে বড় চেয়ারটায় বসলেন। সবাই বসল। মন্ত্রীমশাই সালভার দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার সংবাদ জানাও। সালভা তখন রমন লালের নৌকোয় চড়ে আসা অসুস্থতা ও মৃত্যুর সংবাদ জানাল। রাজা ব'লে উঠলেন—সেই শ্রদ্ধেয় পুরুষের পবিত্র দেহ এখন কোথায়? সালভা তখন আল আমিরি কর্তৃক দুর্গ দখল—সেই সংবাদ গোপন রাখার ব্যবস্থা—রামন লালের মৃতদেহ আনার সময় ধরা পড়া—এ সব কথা বলল। সবশেষে বলল—গুরুদেবের পবিত্র দেহ আল আমিরি কী করেছে আমি জানি না। সবাই চুপ করে রইল। এবার ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে নিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—আপনি অনুমতি দিলে আমি দু'একটা কথা বলবো। রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। তারপর তাকালেন সালভার দিকে। সালভা বলল—মাননীয় রাজা—এর নাম ফ্রান্সিস। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মারিয়া। বন্ধু শাঙ্কো। এঁরা জাতিতে ভাইকিং। রাজা একটু চুপ করে থেকে বললেন—ভাইকিংদের সাহস আর জাহাজ চালনায় দক্ষতার কথা আমরা শুনেছি। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বললেন—বলো। ফ্রান্সিস বলল—মহান রামন লালের পোশাকের পকেটে ছিল তাঁর দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি। সেটা এখন আল আমিরির কাছে আছে। এই পাণ্ডুলিপি সালভা পড়েছে। এটার শেষ পাতায় রামন লাল লিখেছেন প্রথম পাণ্ডুলিপিতে তিনি অ্যালকেমির যে সূত্রগুলো লিখেছেন সেগুলো নির্ভুল। তাঁর বাসনা ছিল ফিরে এসে তিনি এই সূত্রগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ফ্রান্সিস থামল। রাজা বললেন—হ্যাঁ—প্রথম পাণ্ডুলিপিটা কোথায় আছে তা আমরা খুঁজে বের করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।



—মৃত্যুর পূর্বে মহান রামন লালের বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। তাই একটা কাগজে তিনি একটা নক্‌শা এঁকে সালভাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস বলল। তারপরে ওর পোশাকের ভিতর থেকে নক্‌শাটা বের করে রাজার দিকে এগিয়ে ধরল। রাজা বেশ আগ্রহের সঙ্গে নক্‌শাটা নিলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বললেন—কিন্তু নক্‌শার নির্দেশটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বলল—আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি এই নক্‌শার নির্দেশ বের করতে। ফ্রান্সিস মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—তুমি পারবে?

—যথাসাধ্য চেষ্টা করবো এই পর্যন্ত বলতে পারি। ফ্রান্সিস বলল। রাজা নক্‌শাটা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—

—বেশ। আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

—তাহলে সালভাকে নিয়ে আমি চেষ্টা করবো। সালভাকে এই ক্ষমতা দিন যাতে সে এই রাজপ্রাসাদের সর্বত্র স্বাধীনভাবে আমাদের নিয়ে চলাফেরা করতে পারে—ফ্রান্সিস বলল। রাজা মন্ত্রীমশাইয়ের দিকে তাকালেন। বললেন—আপনি কী বলেন?

—এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করবার জন্যে এই স্বাধীনতাটুকু তো ওদের দিতেই হবে। মন্ত্রীমশাই বললেন।

—ঠিক আছে। সেই অনুমতি দেওয়া হবে। রাজা বললেন। তারপর দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন—সেনাপতিকে এক্ষুণি আসতে বলো। দ্বাররক্ষী মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দ্রুত চলে গেল।

একটু পরেই সেনাপতি বেশ দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন। সেনাপতি দীর্ঘকায়। বলিষ্ঠ গড়ন। সাধারণ জোব্বামত পোশাক গায়ে। কোমরের চামড়ার চওড়া কোমরবন্ধ। তা'তে কোষবদ্ধ তরোয়াল ঝুলছে। সেনাপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—আপনি বোধহয় খবর রাখেন না যে মূরনেতা আল আমিরি পালমা নোভার দুর্গ দখল করে আছে। সেনাপতি বেশ চমকে উঠল। অবাক চোখে একবার রাজা আর একবার মন্ত্রীমশাই-এর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। রাজা বললেন—বসুন। সেনাপতি তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। রাজা বললেন—

—একটি বড়ই শোক সংবাদ পেলাম—মহান পণ্ডিত রামন লাল দেহরক্ষা করেছেন। সেনাপতি উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা আঙ্গুলের ইঙ্গিতে তাঁকে বসতে বললেন। সেনাপতি আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলেন। রাজা বললেন—শুনুন—সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনি এক্ষুণি পালমা নোভা যাত্রা করুন। দুটি কাজ আপনাকে করতে হবে। আল আমিরিকে বন্দী করে মহামতি রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করবেন। পাণ্ডুলিপিটা ওর কাছেই আছে। যাবার সময় একটি মূল্যবান কফিন নিয়ে যাবেন। রামন লালের পবিত্র দেহ আল আমিরি কোথায় কবরস্থ করেছে সেটা জানবেন। সেই পবিত্র দেহ কফিনে করে যথাযোগ্য

মর্যাদায় এখানে নিয়ে আসবেন। এই প্রাসাদ সংলগ্ন সমাধিভূমিতে মহান রামন লালের পবিত্র দেহ রাজকীয় প্রথায় সমাধিস্থ করা হবে।

—মাননীয় রাজা—আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। সেনাপতি বললেন।

—এই সব কাজ আপনাকে করতে হবে কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই। রাজা বললেন। সেনাপতি মাথা নুইয়ে বললেন—

—যথা আজ্ঞা মাননীয় রাজা। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন সেনাপতি। তারপর মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন। রাজাও উঠলেন। মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে ফ্রান্সিসরা প্রাসাদের বাইরে এল। মন্ত্রীমশাই গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

রাজপ্রাসাদ পাথরের দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের ওপাশেই বিস্তৃত প্রান্ত। সেনাপতি বেলোর পাথরের বাড়ি প্রান্তরের একপাশে। অন্যদিকে যোদ্ধাদের ছাউনি। ছাউনি বেশ লম্বা টানা ঘর। ছোট ছোট ঘর পরপর চলে গেছে। যোদ্ধাদের আবাসস্থল।

সেনাপতি বেলা রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। প্রান্তরে এলেন। চললেন যোদ্ধাদের আবাসস্থলের দিকে। সেনাপতি বেলোকে যোদ্ধাদের ছাউনির দিকে যেতে দেখে পাহারাদার কিছু যোদ্ধা এগিয়ে এল। মাথা নিচু করে সেনাপতিকে অভিবাদন জানাল। সেনাপতি তাদের বললেন---যাও—সব যোদ্ধাদের বলো এক্ষুনি জড়ো হতে। আমি সব যোদ্ধাদের কিছু বলবো।

যোদ্ধা ক'জন ছুটে গেল যোদ্ধাদের আবাসস্থলের দিকে। কিছুক্ষণ যোদ্ধাদের মধ্যে সেনাপতির আদেশ জানানো হল। সব যোদ্ধা প্রান্তরে এসে আস্তে আস্তে সার দিয়ে দাঁড়াল। যোদ্ধাদের সামনেই একটি পাথরের বেদী। বেদীর রং কালো। রাজা বা সেনাপতি যোদ্ধাদের কোন আদেশ দেবার সময় এই বেদীতে উঠে আদেশ দেন।

সেনাপতি বেদীতে উঠে দাঁড়ালেন। চারদিক নিস্তব্ধ। যোদ্ধাদের সমাবেশের দিকে তাকিয়ে সেনাপতি বলতে লাগলেন—আমার বীর যোদ্ধারা—দুটো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ জানাচ্ছি। প্রথম সংবাদ হল—মহামতি রামন লাল কয়েকদিন আগে দেহত্যাগ করেছেন! সেনাপতি কথাটা বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। সৈন্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। অনেকেই মুখে 'হায়' 'হায়' করে উঠল। গভীর শোকে অনেক সৈন্য কেঁদে ফেলল। সেনাপতি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। তারপর মাথা তুললেন। সেনাপতি হাত তুলে পোশাকের হাতাটা চোখে ঘষে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন—দ্বিতীয় সংবাদ হল—কিছুদিন আগে এক আরবীয় দলনেতা আমাদের পালমা নোভার দুর্গ দখল করেছে। এই সংবাদটা যাতে রটে না যায় যাতে কেউ রাজধানী পালমায় এসে খবরটা বলতে না পারে তার জন্যে বড় রাস্তাটায় পাহারা বসিয়েছে সে। তাই এই দুটো সংবাদ এতদিন আমরা জানতে পারিনি। সেনাপতি থামলেন। তারপর বললেন—রাজার হুকুম—কালকের মধ্যে পালমা দুর্গ অধিকার করতে হবে। তারপর আরবীয় দলনেতাকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হবে। আর একটি কাজ—মহান চিন্তানায়ক

রামন লালের নশ্বর দেহ এনে রাজপরিবারের কবরখানায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হবে। সেনাপতি থামলেন। তারপর বললেন—জানি, রামন লালের মৃত্যুতে আমরা শোকস্তব্ধ। কিন্তু কর্তব্য তো করতেই হবে। কাজেই সবাই তৈরি হও। আমরা সন্ধ্যেবেলা পালমা নোভার দিকে যাত্রা করবো। যেভাবেই হোক পালমা নোভা দুর্গ অধিকার করতে হবে। সেনাপতি থামলেন। তারপর পাথরের বেদী থেকে নেমে এলেন। রাজার আদেশ জানা হল। যোদ্ধাদের সমাবেশ ভেঙে গেল। যোদ্দারা কথা বলতে বলতে তাদের আবাসস্থলের দিকে চলল। সেনাপতি বেলোও তার বাড়ির দিকে চললেন।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। বিস্তৃত প্রান্তরে পদাতিক বাহিনী সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে ঘোড়সওয়ার বাহিনী। তারপর একটা তীরন্দাজ বাহিনী। ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি এলেন। তীরন্দাজ বাহিনী সকলের সামনে সেনাপতি এলেন। তরোয়াল কোষমুক্ত করলেন। সামনের দিকে তরোয়ালটা তুলে চিৎকার করে বললেন যাত্রা শুরু। যোদ্ধাবাহিনী যাত্রা শুরু করল।

যোদ্ধাবাহিনী নগরের রাজপথে এল। চলা শুরু করল দক্ষিণমুখো পালমা নোভার দিকে। ততক্ষণে পালমা নগরে রামন লালের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। যোদ্ধারা পালমা নোভা দুর্গ দখল করতে যাচ্ছে। আর রামন লালের নশ্বর দেহ আনতে যাচ্ছে এই সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার হাজার নগরবাসী পথের দু'ধারে এসে দাঁড়াল। নগরবাসী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। তারা সবাই শোকস্তব্ধ। যোদ্ধাদের উৎসাহ দেবার জন্যেও কেউ ধ্বনি তুলল না। যোদ্ধারা চলল। চারদিক নিঃশব্দ। শুধু যোদ্ধাদের পায়ে চলার শব্দ। আর অনেকের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

যোদ্ধাবাহিনী যখন পালমা নোভার দুর্গের কাছে এল তখন বেশ রাত হয়েছে। ওদিকে বড় রাস্তার ধারে যে নজরদারদের পাহারা রাখা হয়েছিল তারা দূর থেকে রাজা দ্বিতীয় জেমসের ঐ যোদ্ধাবাহিনী দেখে ছুটে এল দুর্গে। আল আমিরিকে সংবাদ দিল রাজা দ্বিতীয় জেমসের যোদ্ধাবাহিনী পালমা নোভা দুর্গ অধিকার করতে আসছে। আল আমিরি হুকুম দিলে সব যোদ্ধারা যেন দুর্গের চত্বরে এসে জড়ো হয়।

সব সৈন্যরা বর্ম আর শিরস্ত্রাণ পরে তরোয়াল বর্শা হাতে দুর্গের চত্বরে এসে সার বেঁধে দাঁড়াল। তীরন্দাজরাও এল।

একটু পরেই আল আমিরি এল। যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বলল। আমরা যে এই দুর্গটা অধিকার করেছি সেটা যেমন করেই হোক রাজা জেমসের কানে উঠেছে। আমাদের এত কড়া নজরদারি সত্ত্বেও এটা কীভাবে হল জানি না। যাহোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজার যোদ্ধাবাহিনী এসে পড়বে। আমরা দুর্গের বাইরের প্রান্তরে যুদ্ধ করবো। ঐ যোদ্ধাদের দুর্গ পর্যন্ত আসতে দেব না। কাজেই শরীরে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াই চালাতে হবে। আল আমিরি থামল। মুর যোদ্ধারা মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। এটা ওদের যুদ্ধে নামার আগের ধ্বনি। আল আমিরি যোদ্ধাদের দুটো দলে ভাগ করল। একদল বাইরের প্রান্তরে গিয়ে জড়ো হল। অন্যদল দুর্গের

মধ্যেই রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি বেলো আর ঘোড়সওয়ার বাহিনী দুর্গের বাইরের রাস্তায় এসে থামলেন। সেনাপতি বেলো একজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে বললেন—যাও—ঐ মূরবাহিনীর দলনেতা কে তা জানো আর তাকে আমার কাছে আসতে বলো। যুদ্ধের চেয়ে যদি কথা বলে সমস্যাটা মেটানো যায় সেই শেষ চেষ্টাটা করবো আমি।

ঘোড়সওয়ার সৈন্যটি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আল আমিরিব যোদ্ধাবাহিনীর কাছে এল। যোদ্ধাদেব দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের দলনেতা কে? একজন যোদ্ধা বলল—আল আমিরি আমাদের দলনেতা। সেনাপতির পাঠানো যোদ্ধাটি বলল—আল আমিরিকে এখানে আসতে বলো। আমাদেব সেনাপতি বেলো তার সঙ্গে কথা বলবেন। আল আমিবির এক সৈন্য বলল—যদি একা পেয়ে আমাদের দলনেতাকে মেরে ফেলে। সেনাপতির যোদ্ধা বলল—আমাদের সেনাপতিও একাই থাকবেন। আল আমিরির সৈন্যরা আব কিছু বলল না। দু'জন দুর্গের দিকে চলল আল আমিরিকে প্রস্তাবটা জানাতে।

সেনাপতি বেলোর একটু সন্দেহ ছিল আল আমিবি আসবে কিনা। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল আল আমিরি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়া ছুটিয়ে তার যোদ্ধাবাহিনীর সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি বেলো আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আল আমিরিব কাছে এসে বললেন—শুনলাম—আপনার নাম আল আমিবি। আপনি আরবীয় দলনেতা।

—ঠিকই শুনেছেন। আল আমিবি বলল।

—আপনি রাজা দ্বিতীয় জেমসের এই দুর্গ অন্যায়ভাবে দখল করে আছেন সেনপতি বললেন।

—হ্যাঁ। লড়াইয়ে রাজার যোদ্ধাদের হারিয়ে তবে দখল করেছি। আল আমিরি বলল।

—ঠিক আছে—এবার আমি রাজা জেমসের সেনাপতি বেলো আপনাকে বলছি। আপনি ভালোয় ভালোয় দুর্গ ছেড়ে দিয়ে চলে যান। সেনাপতি বললেন।

—যদি না যাই। আল আমিরি বলল।

—তাহলে যুদ্ধ হবে। আমাদের যোদ্ধাবাহিনীর যোদ্ধাদের সংখ্যা আপনার যোদ্ধাদের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু শুধু রক্তপাত মৃত্যুকে ডেকে আনবেন না। আপনারা দুর্গ ছেড়ে চলে যান। সেনাপতি বললেন।

—না। আমরা লড়াই করবো। আল আমিরি বলল।

—আমি শেষ পর্যন্ত শান্তিতে সব মিটিয়ে নিতে চেয়েছি। আপনারা তা হতে দিলেন না। তবে যুদ্ধই হোক। সেনাপতি বললেন।

সেনাপতি নিজের যোদ্ধাবাহিনীর কাছে ফিরে এলেন। আল আমিরিও ঘোড়া ছুটিয়ে দুর্গে ঢুকল।

চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। দুর্গে প্রান্তরে সেই আলো ছড়িয়ে আছে। সেনাপতি বেলো নিজেরে বাহিনীর কাছে ফিরে এলেন।

দু'পক্ষের যোদ্ধাবাহিনীর অনড় অপেক্ষা চলছে। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো বাতাস আসছে। শাঁ শাঁ শব্দ উঠছে। একটু দূরের বন-জঙ্গলে।

সেনাপতি বেলোই প্রথম খোলা তরোয়াল মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে বলল—আক্রমণ করো। ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছুটল। মূর যোদ্ধারা মুখে শব্দ তুলে ঘোড়সওয়ারদের মোকাবিলায় এগিয়ে এল। ওরা ঘোড়সওয়ার বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল যুদ্ধ। ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে চাপে বেশ কিছু মূঢ় সৈন্য আহত হল। তবু অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শরীরে ঘোড়ার গায়ে তরোয়ালের কোপ বসাল। বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল। কিন্তু রাজা জেমসের সুশিক্ষিত যোদ্ধাবাহিনীর সামনে মূঢ়বাহিনী আর কতক্ষণ দাঁড়াবে। তবু ওরা লড়াই করতে লাগল। প্রান্তর ভরে উঠল আর্ত চিৎকার গোঙানি আর তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দে।

এবার সেনাপতির নির্দেশে পদাতিকবাহিনী ছুটে এল। যুদ্ধে নামল। চলল যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল আমিরির যোদ্ধারা হার স্বীকার করতে লাগল। ওদের সংখ্যাও কমে আসতে লাগল। জীবন বিপন্ন দেখে কিছু মূর যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাল। মূর যোদ্ধাবাহিনী পরাস্ত হল। বেশ কিছু মূর যোদ্ধাকে বন্দী করাও হল। এবার সেনাপতি বেলো ঘোড়ায় চড়ে চললেন দুর্গের প্রধান প্রবেশপথের দিকে। তার পেছনে পেছনে যোদ্ধাবাহিনীও চলল।

দুর্গটা ঘিরে চারদিকে পরিখা। পরিখা জলে ভর্তি। পরিখা পার হয়ে দুর্গের পাথুরে দেয়ালের কাছে পৌঁছোতে হবে।

প্রধান প্রবেশপথে যেতে পরিখার ওপর কাঠের সেতু দিয়ে যেতে হয়।

ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি বেলো সেতুর কাছে এলেন। দেখলেন দুর্গের বিরাট কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজার কাছে দেয়ালে তখনও মশাল জ্বলছে। আল আমিরির কোন প্রহরী ওখানে নেই। সেনাপতি বেলো গলা চড়িয়ে যোদ্ধাদের বললেন—আমার বীর যোদ্ধারা—সেতু দিয়ে ওপারে গিয়ে দেয়ালের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াও। যোদ্ধারা কাঠের সেতুর ওপর দিয়ে পরিখার ওপরে গেল। দেয়াল ঘিরে দাঁড়াল। সেনাপতি বেলো আবার উচ্চস্বরে আদেশ দিলেন—দেয়াল ধরে ধরে ওপরে ছাদের দিকে ওঠো।

যোদ্ধারা দেয়ালের কাছে ছুটে এল। দুর্গের এবড়ো-খেবড়ো দেয়াল ধরে ধরে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এবার শুরু হল আল আমিরির যোদ্ধাদের আক্রমণ ওরা দুর্গের ছাদ থেকে যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে তীর বর্শা ছুঁড়তে লাগল। কিছু যোদ্ধা আহত হল। মারাও গেল।

তখন সেনাপতি বেলো চিৎকার করে যোদ্ধাদের চলে আসতে বললেন পরিখার কাছে কাছে যোদ্ধাদের দাঁড়াতে বললেন। যোদ্ধারা তাই দাঁড়াল।

এবার আল আমিরির যোদ্ধারা দুর্গের ছাদ থেকে পাথরের ছোট ছোট চাঁই স্লিং-এ চড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল। স্লিং হচ্ছে কাঠের লম্বা পাটাতন। দড়ি দিয়ে পাটাতন বাঁকিয়ে তার ওপর পাথরের ছোট ছোট চাঁই রাখা হয়। দড়ির বাঁধন খুলে দিলেই বাঁকা পাটাতন প্রচণ্ড জোরে সোজা হয়। পাটাতনে রাখা পাথরের চাঁই ছিটকে গিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো যোদ্ধাদের ওপর পড়ে। কিছু যোদ্ধা মরে কিছু আহত হয়। এভাবেই সাত আটটা স্লিং থেকে পাথরের ছোট ছোট চাঁই ছোঁড়া হতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি বেলো যোদ্ধাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—সবাই পরিখা সাঁতরে পার হয়ে চলে এসো। যোদ্ধারা পরিখার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জল গলা পর্যন্ত। কাউকে সাঁতরাতে হল না। জল ঠেলে যোদ্ধারা এপারে চলে এল। সেনাপতির হুকুমে সার বেঁধে দাঁড়াল। স্লিং থেকে ছোঁড়া পাথরের ছোট ছোট চাঁইগুলো এতদূর এল না। যোদ্ধারা এবার নিরাপদ।

সেনাপতি বেলো এই স্লিং-এর কথা শুনেছেন কিন্তু আগে কখনো দেখেননি। এবারই প্রথম দেখলেন। স্লিং-এর কর্মক্ষমতাও দেখলেন।

সেনাপতি বেলো ভেবে দেখলেন এভাবে দুর্গের বাইরে থেকে আক্রমণ করে দুর্গ দখল করা যাবে না। অন্য কোন উপায় দেখতে হবে।

ওদিকে দুর্গ থেকে পাথর ছোঁড়া বর্শা ছোঁড়া বন্ধ হল। সেনাপতি বেলোর যোদ্ধারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত স্লিলং দিয়ে ছোঁড়া ছোট পাথরের চাঁই উড়ে আসছে না।

তখন পূবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই সূর্য উঠল। ভোরের নরম আলো ছড়ালো দুর্গের গায়ে গাছগাছালির মাথায়। পাখি-পাখালির ডাক শোনা গেল।

সেনাপতির যোদ্ধারা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, সেই পালমা নগর থেকে হেঁটে আসা সারারাত যুদ্ধ করা। কিছু যোদ্ধা এত ধকল সইতে পারল না। ঘাসের প্রান্তরে বসে পড়ল। সেনাপতি দেখলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

এখন যুদ্ধবিরতি চলছে। সেনাপতির আদেশে কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে রসুইকর চলল বনজঙ্গলের দিকে। গাছগাছালির আড়ালে রসুইকররা সকালের খাবার তৈরির জন্য তিনটে পাথর বসিয়ে উনুনের মত বানাল। রান্নার আয়োজন চলল।

ঘোড়ার তদারক করে যারা তাদেরই একজন সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি ঘোড়া থেকে নামলেন। যোদ্ধাটি ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দানাপানি খাওয়াতে।।

সেনাপতি প্রান্তরে পড়ে-থাকা একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসলেন।

তখন বেলা হয়েছে। দুর্গ বড় সড়ক পূবদিকে বনজঙ্গল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেনাপতি একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। ভাবতে লাগলেন কীভাবে দুর্গটা দখল করা যায়। রাতের অন্ধকারে দুর্গের দেয়াল ডিঙানো যায়। কিন্তু দুর্গের ছাদে জ্বলন্ত মশালের আলোতে যোদ্ধারা ধরা পড়ে যেতে পারে। অন্য কোন উপায়

ভেবে বের করতে হবে।

সকালের খাবার খেল সবাই। সেনাপতিও ঐ পাথরে বসেই খাবার খেলেন। খেতে খেতে সর্বক্ষণ ভেবে চললেন কীভাবে দুর্গটা দখল করা যায়।

হঠাৎই একটা উপায়ের কথা মাথায় এল। দুর্গের সদর দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে। সেনাপতি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন কয়েকজন যোদ্ধাকে হাত তুলে ডাকলেন। যোদ্ধারা কাছে এসে মাথা একটু নিচু করে সম্মান জানাল। সেনাপতি বললেন—ঐ বনজঙ্গলের সামনে দেখ। সকলে সেদিকে তাকাল। দেখা গেল ঐ দিকে মানুষের বসতি এলাকা। পাথরের বাড়িঘরদোর। সেনাপতি বললেন—ওখানকার লোকজনের কাছ থেকে কয়েকটা কুড়ুল জোগাড় কর। চলো আমিও যাচ্ছি।

সেনাপতি ঐ জেলেদের বসতির দিকে চললেন। পেছনে কয়েকজন যোদ্ধা চলল। বসতির পাথরের বাড়িগুলোর সামনে এসে সেনাপতি দেখলেন—সব বাড়িই আগুনে পোড়া। আশেপাশে কোথাও মানুষজন নেই। সেনাপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—মনে হচ্ছে এখানে বসতি ছিল। পেছনেই বনজঙ্গল। এই বসতির লোকেরা নিশ্চয়ই বনজঙ্গল থেকে কাঠকুটো জোগাড় করত। কাজেই কুড়ুল ব্যবহার করতো। নিশ্চয়ই এই পোড়া বাড়িগুলো ভালো করে খুঁজলে কুড়ুল পাওয়া যাবে। তোমরা খোঁজো। যোদ্ধারা পোড়া বাড়িগুলোয় ঢুকে কুড়ুল খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই যোদ্ধারা তিনটে কুড়ুল পেল। কুড়ুল নিয়ে ওরা সেনাপতির কাছে এল। সেনাপতি বললেন—এবার চলো বনের মধ্যে। সেনাপতি বনের দিকে চললেন। পেছনে কুঠার নিয়ে যোদ্ধারা চলল।

বনের মধ্যে সেনাপতি একটা বড় গাছ খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল। একটা খাড়া উঠে-যাওয়া চেস্টনাট গাছ। বেশ মোটা গাছ। সেনাপতি যোদ্ধাদের গাছটা দেখিয়ে বলল—এই গাছটা কাটো। যোদ্ধারা কুঠার নিয়ে তৈরি হল। প্রথমে দু'জন কুঠার নিয়ে তৈরি হল। প্রথমে দু'জন কুঠারের কোপ পরপর বসিয়ে গাছের গোড়াটা কাটতে লাগল। দু'জনের মধ্যে একজন পরিশ্রান্ত হল। হাঁ করে হাঁপাতে লাগল। তৃতীয়জন এগিয়ে এল। এবার দু'জনে মিলে আগে পরে কুঠার চালিয়ে গাছটা কাটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে গোড়া কাটা হয়ে গেল। আশেপাশের গাছের ডালে শব্দ তুলে কাটা গাছটা ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল। সেনাপতি বললেন—গাছটার ডালগুলো ছেঁটে ফেল। যোদ্ধারা কুঠার চালিয়ে গাছটার ডালগুলো কেটে ফেলল। শুধু লম্বা মোটা কাণ্ডটা রইল। সেনাপতি এবার শুধু কাণ্ডটা দেখে দেখে কী হিসেব করে কাণ্ডটার ওপরের দিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এখানটা কাটো। একজন যোদ্ধা কুঠার চালিয়ে সেটা কাটল। এবার রইল শুধু বড় লম্বা মোটা কাণ্ডটা। সেনাপতি যোদ্ধাদের বললেন—এবার এটা নিয়ে চলো।

যোদ্ধারা এবার কাটা লম্বা কাণ্ডটা কাঁধে নিয়ে চলল। ওরা সেনাপতির নির্দেশমত কাণ্ডটা নিয়ে দুর্গের প্রধান প্রবেশপথের দিকে চলল। এবার কাঠের সেতুটা পার হতে লাগল। তখনই দুর্গের ছাদ থেকে আল আর্মিরির যোদ্ধারা স্লিং-এ পাথর

চড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল। একটা পাথর সেতুর মধ্যে এসে পড়ল। সেতুর ঐ জায়গার কাঠটা ভেঙে জলে পড়ে গলে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বললেন—ঐ কাঠের কাণ্ডটা নিয়ে কুড়িজন যোদ্ধা প্রধান দেউড়ির দরজার কাছে চলে যাও। ছোটো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

কুড়ি জন যোদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড ঘাড়ে বসিয়ে ছুটে দেউড়ির কাঠের দরজার সামনে চলে এল। এখন আর স্লিং-এ চড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে লাভ নেই। এত কাছে পাথর গিয়ে পড়বে না। স্লিং থেকে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হল। শুধু তীরন্দাজরা তীর ছুঁড়তে লাগল। ওদিকে সেনাপতির হুকুমে তাঁর তীরন্দাজ বাহিনী তীর ছুঁড়তে লাগল। সেনাপতি চিৎকার করে বলল—শুধু ওদের তীরন্দাজদের মারো নয়তো আহত করো। তীরন্দাজরা নিশান ঠিক করে তীর ছুঁড়তে লাগল।

এবার সেনাপতি দ্রুতপায়ে সেতুটা পার হলেন। এলেন দুর্গের সদর দরজার কাছে। যোদ্ধাদের বললেন—এই গাছের কাণ্ডটার কুড়িজন কাঁধে নাও। তারপর ছুটে গিয়ে দুর্গের দরজায় একসঙ্গে কাণ্ডটা দিয়ে ঘা মারো। এভাবে বারবার ঘা মারো।

একজন যোদ্ধা সরু গলায় বলতে লাগল—ধাক্কা মারো একসঙ্গে। যোদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে গাছের কাণ্ডটা একসঙ্গে ধরে কাঠের দরজার মাঝখানে ঘা মারতে লাগল। দড়াম্ দড়াম্ শব্দ হতে লাগল। কাঠের দরজাটা নড়ে উঠতে লাগল।

কুড়িজন যোদ্ধা পরিশ্রান্ত হল। হাঁপাতে লাগল। সেনাপতি তা দেখে সেতুর ওপারে জড়ো হওয়া যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললেন—কুড়িজন চলে এসো। জল্‌দি। দৌড়ে আসবে।

কুড়িজন যোদ্ধা সেতুর ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে এল। আগের কুড়িজনকে সেনাপতি হাতের ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন। কুড়িজন যোদ্ধা চলে গেল।

এবার নতুন কুড়িজন যোদ্ধা কাণ্ডটা ঠেলে নিয়ে দরজায় ঘা মারতে লাগল। ঘা পড়ছে আর দরজার মাঝখানের ফাঁকটা বড় হচ্ছে। কাঠের দুটো মোটা আগল দরজার মাঝখানে এবার দেখা যাচ্ছে। আগল দুটো দেখে যোদ্ধাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। চলল দুম দুম্ শব্দ তুলে আগলদুটোয় ঘা মারা। পরিখার ওপারে দাঁড়ানো সৈন্যরাও চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগল। পর পর ঘা পড়তে লাগল বিরাট দরজাটা নড়তে লাগল।

হঠাৎ একটা ধাক্কায় কাঠের একটা আগল ভেঙে ছিটকে পড়ল। যোদ্ধারা চিৎকার করে উঠল। যোদ্ধারা হাঁপাচ্ছে তখন। সেনাপতি ওদের বলল—এবার অন্যদের ডাকছি। তোমরা যাও। ওরা বলে উঠল—না। দু' একজন বলল—একটা আগল ভেঙেছি অন্যটাও ভাঙবো। আমরাই ভাঙবো।

আবার ঘা পড়ল অন্য আগলটায় বারে বারে। যোদ্ধারা হাঁপাচ্ছে তখন। একজন যোদ্ধা বলে যেতে লাগল—ধাক্কা মারো একসঙ্গে। কাঠের আগলটা ক্রমাগত এই

ধাক্কা সামলাতে পারল না। একটা জোর ধাক্কা খেয়ে কাঠের আগলটা দু' টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল। বন্যার জলের মত যোদ্ধারা চিৎকার করতে করতে দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দুর্গের ছাদ থেকে দুর্গের ঘরগুলোর আশপাশ থেকে আল আমিরির যোদ্ধারা তীব বর্শা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু সেনাপতি যোদ্ধাদের থামাতে পারল না। দুর্গের ঘরগুলো থেকে আল আমিরির যোদ্ধারা খোলা তরোয়াল হাতে সেনাপতির যোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেনাপতির যোদ্ধারা তরোয়ালের লড়াই চালাল। ততক্ষণে বাইরে পরিখার ওপারে দাঁড়ানো সেনাপতির যোদ্ধারা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। আল আমিরির যোদ্ধারা তাদের রুখতে পারল না। আল আমীরির সৈন্যদের ঘিরে ফেলল সেনাপতির যোদ্ধারা চলল তরোয়ালের লড়াই দুর্গের চত্বরে। চত্বরটা ভরে উঠল আহতের আর্ত চিৎকারে গোঙানিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে আল আমিরির যোদ্ধারা হার স্বীকার করতে লাগল। সেনাপতির যোদ্ধারা সাহসী আর রণনিপুণ। আমিরির মূর সৈন্যরা পেরে উঠল না।

দুর্গের ঘরগুলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেনাপতি চিৎকার করে বললেন—বীর যোদ্ধারা—আর হত্যা নয়। ওরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হার স্বীকার করবে। ওদের এখন বন্দী কর। এই দুর্গে নিশ্চয়ই কয়েদঘর আছে। ওদের কয়েদঘরে ঢুকিয়ে দাও।

সেনাপতির যোদ্ধারা তার নির্দেশমত আল আমিরির যোদ্ধাদের বন্দী করতে লাগল। ওদের দু'হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলল কয়েদঘরের দিকে।

লড়াই শেষ। সেনাপতির যোদ্ধারা তখন হাঁপাচ্ছে। সেনাপতি গলা চড়িয়ে বললেন—কিছু যোদ্ধা ছাদে চলে যাও। ওখান থেকে মাঝে মাঝেই তীর বর্শা ছোঁড়া হচ্ছে। কিছু যোদ্ধা ছুটল ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে। ছাদে উঠে আল আমিরির যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করল। তাদের ছাদ থেকে নামিয়ে এনে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

তখনই দেখা গেল আল আমিরি খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। সেনাপতি দ্রুত তার সামনে এলেন। বললেন—আল আমিরি—অস্ত্র ত্যাগ করো। লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তোমার যোদ্ধারা হয় মরেছে নয়তো আহত হয়েছে অথবা কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। তুমি একা লড়ে কী করবে?

আল আমিরি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—আমি লড়াই করবো। মরতে হয় মরবো তবু লড়াই থেকে পিছিয়ে আসবো না।

—তাহলে আমার সঙ্গেই লড়াই করো। সেনাপতি কথাটা বলেই তরোয়াল হাতে আল আমিরির ওপর ঝাঁপিযে পড়লেন। আল আমিরি কোনরকমে সেই মার আটকাল। শুরু হল আল আমিরির সঙ্গে সেনাপতির লড়াই।

তরোয়ালের লড়াইতে কেউ কম যায় না। সেনাপতির যোদ্ধারা লড়াইয়ের জায়গাটা ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াল। লড়াই দেখতে লাগল।

তরোয়ালের লড়াই চলল। সেনাপতি এগিয়ে পিছিয়ে নিপুণ হাতে তরোয়াল চালাতে লাগলেন। আল আমিরিও কম যায় না। সেনাপতির মার ঠেকাতে লাগল।

আবার আক্রমণও করতে লাগল। দু'জনেই তখন হাঁপাচ্ছে। তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ আর শ্বাস ফেলার শব্দ।

এতক্ষণ আল আমিরির তরোয়াল যত দ্রুত এদিক ওদিক ঘুরছিল এখন কিন্তু সেই দ্রুততা আর নেই। তবু হঠাৎ দ্রুত ঘুরে আল আমিরি তরোয়াল চালাল। রোদে ঝলসে উঠল তরোয়াল। সেনাপতির বাঁ বাহু ছুঁয়ে তরোয়ালের ফলা নেমে এল। পোশাকের কাপড় কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। সেনাপতি কাটা জায়গাটা দেখলেন। এবার সেনাপতি দ্রুত তরোয়াল চালাতে লাগলেন। আল আমিরি সেই তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে পিছু হঠতে লাগল। সেনাপতি ওর ওপর সমান চাপ রেখে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ সেনাপতি এত দ্রুত আর এত জোরে তরোয়াল চালালেন যে পরিশ্রান্ত আল আমিরি সেই মার ঠেকাতে পারল না। ওর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গেল। সেনাপতি আল আমিরির গলায় তরোয়ালের ডগাটা ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—তোমাকে মেরে ফেলার হুকুম নেই। তারপর যোদ্ধাদের বললেন—এটাকে বন্দী কর। একজন যোদ্ধা ছুটে গেল। আল আমিরির কোমরের ফেট্টি খুলে তাই দিয়ে ওর হাত বাঁধল। সেনাপতি বললেন—মহামতি রামন লালের নশ্বর দেহ কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছে? আল আমিরি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—দুর্গের উত্তর দিকের প্রান্তরে।

—আমাদের নিয়ে চলো। সেনাপতি বললেন। তারপর বললেন—এখানে বেলচা কোথায় থাকে? আল আমিরি বলল—আমি জানি না। রামন লালের মৃতদেহ কবর দেবার সময় আমরা কেউ যাই নি। কবর খোঁড়েটোড়ে এমন দু'জন গিয়েছিল। সেনাপতি শুধু বলল—আশ্চর্য। তারপর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই দুর্গের ঘরগুলো খোঁজ। কোথাও দু-একটা বেলচা নিশ্চয়ই পাবে। যোদ্ধারা কয়েকজন বেলচা খুঁজতে গেল।

কিছু পরে তারা দুটো বেলচা নিয়ে এল। সেনাপতি আল আমিরিকে বললেন—চলো—কবরের জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।

—সেই জায়গাটা কোথায় তা তো আমি জানি না। আল আমিরি বলল।

—তার মানে? সেনাপতি বললেন।

—কবরের সময় তো আমরা যাই নি। আল আমিরি বলল।

—ও। ঠিক আছে আমরাই খুঁজে নেব। সেনাপতি বললেন। তারপর দু'জন যোদ্ধাকে বললেন—আল আমিরিকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখো।

সেনাপতি দুর্গ থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখো চললেন। তার যোদ্ধারাও নিঃশব্দে তার পেছনে পেছনে চলল। ওরা সেনাপতি আর আল আমিরির সব কথাই শুনেছে।

উত্তরের প্রান্তরে এসে সেনাপতি যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এখানে খুঁজে দেখ তো কোথায় মাটি কাটা আছে। দু'একদিন আগেই কবর কাটা হয়েছে। সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। কবর খুঁজতে লাগল। পাওয়াও গেল। ঘাসের মধ্যে সহজেই মাটি খোঁড়া জায়গাটা দেখা গেল।

কবরের জায়গাটাতে সেনাপতি এলেন কবরের সামনে কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে দাঁড়ালেন। তারপর যে দু'জন যোদ্ধা বেলচা নিয়ে এসেছিল তাদের বললেন—কবরটা খোঁড়। কফিনটা তুলতে হবে। যোদ্ধা দু'জন বেলচা দিয়ে কবর খুঁড়তে লাগল। হাত দুয়েক খুঁড়েই কফিনটা পাওয়া গেল। একটা সস্তা দামের কাঠের কফিন। সালভার পক্ষে এর চেয়ে বেশি দামের কফিন জোগাড় করা সম্ভব ছিল না।

কফিনটা ওপরে তোলা হল। সবাই মাথায় বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। এবার সেনাপতির নির্দেশে কয়েকজন কফিনটা কাঁধের কাছে তুলল। সবার আগে সেনাপতি কফিনটার সামনের দিকে কাঁধ দিল। তখনও সেনাপতির বাঁ বাহু থেকে রক্ত পড়ছিল। কিন্তু সেনাপতি সেটা গ্রাহ্য করল না। বাকি কয়েকজন কাঁধ দিল। সেনাপতি সেটা গ্রাহ্য করল না। বাকি কয়েকজন কাঁধ দিল। সেনাপতি কফিন নিয়ে চলল।

দুর্গের বাঁ দিকে গনজেলেসের কাছে পালমা থেকে আনা দামী কাঠের তৈরি সোনা রুপোর ফুল লতা পাতার কাজ করা কফিনটা রাখা ছিল। সেই কফিনের কাছে এই কফিনটা আনা হল। নতুন কফিনটার মুখ খোলা হল। আগের কফিনের মুখটা খোলা হল। রামন লালের শায়িত মৃতদেহ বেশ কয়েকজন হাত লাগিয়ে তুলল। তারপর নতুন কফিনে আস্তে আস্তে রাখল। কফিনের মুখ বন্ধ করা হল। সেনাপতির দু'চোখে জলে ভরে গেল। যোদ্ধাদের মধ্যেও অনেকে কাঁদছিল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সব যোদ্ধারা ঘাসের প্রান্তরে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছিল। সেনাপতি সেখানে এলেন। গলা চড়িয়ে বললেন—বীর যোদ্ধারা—এখন সবাই বিশ্রাম কর। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা পালমা নগরের দিকে যাত্রা করবো। ভোর ভোর সময়ে পালমা পৌঁছে যাবো।

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল। চারদিক খোলা যে গাড়িটা সেনাপতি এনেছিল সেই গাড়িতে কফিনটা রাখা হল। দুটো ঘোড়া গাড়িটা টানবে। আল আমিরিকে হাত বাঁধা অবস্থায় একটা ঘোড়ায় বসানো হল। একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা সেই ঘোড়ায় আল আমিরির পেছনেই বসল।

একেবারে সামনে রাখা হল কফিনের গাড়িটাকে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে সেনাপতি। তারপর অশ্বারোহী যোদ্ধারা। তারপর পদাতিক যোদ্ধারা, তীরন্দাজরা। সবশেষে বন্দী আল আমিরি।

সেনাপতি তরোয়াল কোষমুক্ত করল। রাজধানী পালমা নগরের দিকে তরোয়াল তুলে চিৎকার করে বললেন—যাত্রা শুরু।

যাত্রা শুরু হল।

আজ চাঁদের আলো খুব উজ্জ্বল নয়। চাঁদ মেঘেও ঢাকা পড়ছে মাঝে মাঝে। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো হাওয়া বইছে।

পালমা নগরে পৌঁছোবার আগেই ভোর হল।

ওদিকে রাজবাড়ি থেকে ফিরে সালভা বলল—ফ্রান্সিস এখন কী করবেন?

ফ্রান্সিস বলল—রামন লাল কোথায় থাকতেন?

ছাত্রাবাসের পাশেই শিক্ষাগুরুদের আলাদা আবাস। তারই একটিতে রামন লাল

থাকতেন। সালভা বলল।

—তা'হলে ঐ ছাত্রাবাসেই একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা কর। আমরা সেই ঘরেই থাকবো। ফ্রান্সিস বলল। উত্তরমুখো কিছু পাথরের ঘরের দিকে দেখিয়ে সালভা বলল—

—ছাত্রাবাস শিক্ষাগুরুদের আবাস ঐদিকে। সেইদিকে চলল ওরা। তখনি প্রাসাদের দক্ষিণ দিককার দেয়ালের ওপাশ থেকে বহু মানুষের কোলাহল ঘোড়ার ডাক শোনা গেল। সালভা বলল—ঐ দিকেই সৈন্যবাস। একটা বিরাট প্রান্তর আছে ঐদিকে। বোধহয় সৈন্যসজ্জা চলছে সেখানে।

হাঁটতে হাঁটতে উত্তরের ঘরগুলোর কাছে ওরা এল। সালভা প্রথম ঘরটার দরজায় দাঁড়াল। ফ্রান্সিসরাও এসে ওর পেছনে দাঁড়াল। দেখা গেল ছোট একটা ঘর। একপাশে পাথরের মেঝেয় কম্বলমত মোটা কাপড়ের বিছানা পাতা। বিছানায় একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ের ছাইরঙের মোটা কাপড়ের একটা অংশ ঘোমটার মত তাঁর মাথায় টানা। বৃদ্ধ একটি পাণ্ডুলিপি পড়ছেন।

সালভা গিয়ে বৃদ্ধের সামনে মেঝেয় বসল। বৃদ্ধ মুখ তুলে সালভার দিকে তাকালেন। সালভা মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। হেসে বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো—আমাকে চিনতে পারছেন? বৃদ্ধ ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাসলেন। কপালে মুখে বলিরেখা স্পষ্ট হল। বললেন—তুমি সালভা—তাই না? সালভা হেসে মাথা ঝাঁকাল। বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো—মহামতি রামন লালের প্রথম পাণ্ডুলিপিটা তো এখনো পাওয়া যায় নি। ম্যাস্ত্রো মাথা নাড়লেন। সালভা ইশারায় ফ্রান্সিসকে ডাকল। ফ্রান্সিস এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে সালভা বলল—এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বন্ধু। ম্যাস্ত্রো একবার তাকিয়ে ফ্রান্সিসকে দেখলেন। সালভা বলল—রাজা এই ফ্রান্সিসকেই দায়িত্ব দিয়েছেন ঐ পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করার জন্যে।

—ভালোই তো। ম্যাস্ত্রো বললেন।

—তাই ফ্রান্সিস তার বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকবেন। একটা ঘরের ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে হবে। সালভা বলল।

—এ আর বেশি কথা কি। তুমি তো সবই চেনো। যে কোন একটা খালি ঘর পছন্দ করে থাকো। ম্যাস্ত্রো বললেন। একটু থেমে সালভা বলল—এবার আপনাকে একটা শোক সংবাদ জানাচ্ছি। আমাদের গুরুদেব মহামতি রামন লাল কিছুদিন আগে দেহত্যাগ করেন। ম্যাস্ত্রো কেমন বিহ্বলচোখে সালভার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—দীর্ঘদিন আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁর কোন খোঁজ পাই নি। কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

—পরে সব বলবো আপনাকে। সালভা বলল। মাথা নাড়তে নাড়তে ম্যাস্ত্রো বললেন—এখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছি আমরা। আশা ছিল, যশস্বী রামন লাল ফিরে আসবেন। আমরা তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ পাবো। আঃ বড় কষ্ট হচ্ছে। ম্যাস্ত্রো মাথা নাড়লেন। সালভা উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে সম্মান

জানিয়ে ঘরের বাইরে এল। চলল টানা বারান্দা ধরে। ফ্রান্সিসরাও চলল। পর পর বেশ ক'টা ঘর পার হ'ল ওরা। প্রত্যেকটাতেই ছাত্ররা রয়েছে। পাথরের বারান্দাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা খালি ঘর পাওয়া গেল। ঘরটায় ঢুকল সবাই। ঘরটা বড়। কিন্তু ঘরটার মেঝেয় কোন বিছানা মত কিছু নেই। ঘরটার পাথুরে দেয়ালের ওপরের দিকে চ্যাপ্টা লোহার কয়েকটা গরাদ বসানো জানলা। ওরা ঘরটা দেখছে তখনই একটি অল্পবয়সী ছেলে এসে দরজায় দাঁড়াল। ছেলেটার মাথা ন্যাড়া। সালভা বলল—কীরে—তুই এখানে কাজ করিস?

—হ্যাঁ। কর্তা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটি বলল। বোঝা গেল ম্যাস্ত্রো পাঠিয়েছেন।

ন্যাড়া মাথা ছেলেটিই ফ্রান্সিসদের ওখানে স্নান খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

ঘরে এসে দেখল চারজনেরই বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। ফ্রান্সিস বিছানায় শুয়ে পড়ল। তারপর ক্লান্তিতে চোখ বুজল। শাঙ্কো আর মারিয়াও বিছানায় বসল। ক্লান্ত সকলেই। সালভা বলল—আমি রাজবৈদ্যির কাছ থেকে পিঠের ওষুধটা নিয়ে আসছি। ঘা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু টনটনানিটা যাচ্ছে না। সালভা চলে গেল।

শাঙ্কো টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলল—মারিয়া—শুয়ে বিশ্রাম করো। অনেক ধকল গেছে। মারিয়া শুয়ে পড়তে পড়তে বলল— ফ্রান্সিস—পারবে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে? চোখ না খুলেই ফ্রান্সিস বলল—আগে রামন লালের থাকার ঘর—পড়ার ঘর—পেছনের ছোট গীর্জাটা—শিক্ষাগুরুদের থাকার জায়গাগুলো—এসব দেখি—তারপর বুঝবো—পারবো কি পারবো না।

বিকেল হয়ে এল। সালভা ফিরল তখন। ওর পোশাকের পকেট থেকে একটা তামার চৌকোনো চাকতি বের করল। ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে বলল—পাঞ্জা। রাজা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা দেখিয়ে যেখানে খুশি আমরা যেতে পারবো। মারিয়া হাত বাড়িয়ে পাঞ্জাটা নিল। দেখতে লাগল। শাঙ্কো দেখল। ওরা নিশ্চিন্ত হ'ল যে এখন রাজপ্রাসাদে ঢোকবার বা বেরোবার জন্যে আর সমস্যা থাকবে না। সালভা ফ্রান্সিসকে বলল—জানেন—মহামতি রামন লালের দেহরক্ষার সংবাদে সারা নগর শোকে মুহ্যমান। বন্দরে সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। দোকানটোকানও বন্ধ হয়ে গেছে। পথ জনশূন্য। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কালকে কখন সেনাপতি রামন লালের পবিত্র দেহ নিয়ে আসে। ফ্রান্সিস শুনল। কোন কথা বলল না। ওর তখন চিন্তা—নক্শায় কীভাবে কী নির্দেশ দিয়েছেন রামন লাল?

সন্ধ্যে হ'ল। ফ্রান্সিস তখনও চুপ করে শুয়ে ভাবছে। সালভা বলল—কী করবেন এখন?

—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অন্ধকারে শুধু মোমবাতির আলোয় কিছু বোঝা যাবে না। আজ রাতে শুধু বিশ্রাম। কালকে সকাল থেকে কাজে লাগতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মোমবাতির আলোয় নক্শাটা দেখল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মোমবাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভোর হতেই পালমার অধিবাসীরা দলে দলে এসে জড়ো হতে লাগল রাজপ্রাসাদের বাইরে। আস্তে আস্তে ভীড় বাড়তে লাগল। সকাল হতেই বহুলোক জড়ো হল। সবাই শ্রান্ত। কারো মুখে কথা নেই। এত লোক। কিন্তু কোন শব্দ নেই। শুধু এখানে ওখানে দু'চারজন বুড়োবুড়ির ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ জনারণ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। দেখা গেল দূরে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সেনাপতি ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে একটা ঘোড়ায়টানা গাড়িতে রাখা কাঠের কফিন। গাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে আসছে একদল অশ্বারোহী সৈন্য। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সৈন্যরা সবাই পরিশ্রান্ত। অপেক্ষারত নগরবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগল। সবাই সেই কফিনের কাছে যেতে চায়। কিন্তু সৈন্যরা কাউকে এগোতে দিল না।

রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে মন্ত্রীমশাই। পেছনে প্রাসাদরক্ষীরা। রাজা ও মন্ত্রীমশাই পায়ে হেঁটে সিংহদ্বারের কাছে এলেন। সিংহদ্বার আগেই খুলে রাখা হয়েছিল। কফিনের গাড়ি আস্তে আস্তে সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকল। রাজা আর মন্ত্রী মাথা নুইয়ে সম্মান জানালেন। সিংহদ্বারের সামনেই কফিনের গাড়িটা থামিয়ে দেওয়া হল। বন্ধ করে দেওয়া হল সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের লোহার গরাদের ওপর মানুষের ঢল নামল। সবাই সেই কফিনটা দেখতে চায়। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে চায় রামন লালের নশ্বর দেহকে।

ফ্রান্সিসরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখছিল। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল—বুঝলে মারিয়া—মাজোরকার মানুষরা সত্যিই রামন লালকে শুধু শ্রদ্ধাই করতো না—ভালওবাসতো।

ওদিকে বন্দী আল আমিরিকে নিয়ে যাওয়া হল সৈন্য আবাসের লাগোয়া কয়েদখানায়। উদ্ধার করা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে সেনাপতি রাজার পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা প্রাসাদেই ফিরলেই পাণ্ডুলিপিটা দেবেন।

রামন লালের পবিত্র দেহ প্রাসাদ সংলগ্ন সমাধিস্থলে সমাধিস্থ করার আয়োজন চলল।

ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—চলো—রামন লালের থাকার ঘর যেখানে ছিল সেখানে। মারিয়া শাঙ্কো এগিয়ে এল। চলল সবাই।

শিক্ষাগুরুদের বাসস্থানের এলাকায় এল ওরা। সালভা ওদের নিয়ে এল পর পর কয়েকটা আলাদা আলাদা বাড়ির কাছে। বাড়িগুলো পাথরের দেয়াল ঘেরা। কয়েকটা বাড়ির পরে একটা বাড়ির সামনে সালভা দাঁড়াল। বাড়িটার সাধারণ কাঠের দরজায় তালা ঝুলছে। সালভা পকেট থেকে চাবি বার করতে করতে বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রোর কাছ থেকে আমি চাবিটা নিয়ে রেখেছি। জানি আপনারা এখানে আসবেন। রামন লালের আবাসস্থল দেখতে চাইবেন।

দরজা খোলা হল। ভেতরে ঢুকল সবাই। সামনেই একটু বাঁধানো জায়গা। তার পরে ঘর। ওরা ঘরটার কাছে এল। দরজা ভেজানো ছিল। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ঘরে ঢুকল সবাই। ঘরের একপাশে মেঝেয় বিছানা রয়েছে। অন্যপাশে দেয়ালে পাথরের তাক। তাতে হাতে লেখা চামড়া বাঁধানো পাণ্ডুলিপি। পরপর সাজানো। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বোঝা গেল—নিয়মিত ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা আছে। ঘরটা বেশ বড়। পেছনের দেয়ালের ওপরের দিকে তিনটি চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বসানো জানলামত চৌকোনো ফোকর। আলো হাওয়া আসছে। সালভা বলল—এখানেই মহামতি রামন লাল থাকতেন।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। বলল—সালভা—তুমি তো অনেকবার এখানে এসেছো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ যে জানলার নিচে একটা বড় চৌকোনো পাথর আর তার পাশে নিচুতে একটা পাথর ওটাই ছিল মহামতি রামনের লেখাপড়ার জায়গা। ফ্রান্সিস ওখানটায় গেল। দেখল ওপরের জানলা দিয়ে এখানে যথেষ্ট আলো আসছে। এবার ফ্রান্সিস পাথরের তাকে রাখা পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টে দেখতে লাগল। মারিয়াকে ডেকে বলল—

—এই পাণ্ডুলিপিগুলো দেখ তো। আমার বিদ্যে তো জানো। মারিয়া এগিয়ে এল। পাতা উল্টে দেখতে লাগল। দেখে নিয়ে বলল—গ্রীক আরবী আর ল্যাতিন ভাষায় লেখা। এটুকু বুঝতে পারছি। তার বেশি বোঝার বিদ্যে আমারও নেই। সালভা বলল—এসব পুরোনো সংগ্রহের কিছু কিছু আমার পড়ার কাজে লেগেছে। দর্শন, রসায়ন আর জ্যোতির্বিদ্যার ওপরেই লেখা বেশি।

—আচ্ছা—গ্রীক ভাষায় লেখা রামন লালের কোন পাণ্ডুলিপি এখানে আছে? মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—আমিও ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। সালভা সেই পাথরপাতা জায়গাটায় গেল। পাশেই পাথরের তাকটার দিকে তাকিয়ে বলল—রামন লালের নিজের পাণ্ডুলিপিগুলো সব এখানেই থাকতো। এখন দেখছি না। শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো হয়তো বলতে পারবেন।

—চলো তো। ফ্রান্সিস বলল। ওরা বাড়ির বাইরে এল। দরজায় তালা লাগিয়ে সালভা চলল ম্যাস্ত্রোর ঘরের দিকে। যেতে যেতে সালভা বলল—শ্রদ্ধেয় ম্যাস্ত্রো এখানকার ছাত্রাবাসের দায়িত্বে আছেন। তাই শুধু উনিই ছাত্রাবাসের ঘরে থাকেন। কিন্তু ম্যাস্ত্রোর ঘরের সামনে এসে দেখল ঘরে তালা ঝুলছে। ম্যাস্ত্রো নেই। সালভা ছাত্রদের ঘরে গিয়ে জেনে এল যে রামন লালের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করার আয়োজনে উনি এখন ব্যস্ত।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার সময় ম্যাস্ত্রো এলেন। তখন সালভা ফ্রান্সিসকে নিয়ে গেল। ম্যাস্ত্রোকে ফ্রান্সিস বলল—মহামতি রামন লালের নিজের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি একটু দেখতে চাই। ম্যাস্ত্রো পাশের দেয়ালের তাক থেকে চারটে পাণ্ডুলিপি বের করলেন। মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বড় বই মত বেশ মোটা ভারী। ফ্রান্সিস বইটার লেখাগুলো দেখল। তারপর মারিয়ার হাতে দিল। মারিয়াও দেখল—গ্রীক ও আরবী

ভাষায় লেখা। বাকিগুলোও দেখল ওরা। খুব পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। ফ্রান্সিস ভাবল এমনি হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি নিখোঁজ। এখন সেটাই খুঁজে বার করতে হবে। ভরসা শুধু নক্শাটা।

ফেরার সময় সালভা বলল—দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ঐ পাণ্ডুলিপিগুলোতে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।

ওদিকে প্রাসাদসংলগ্ন রাজপরিবারের সমাধিভূমিতে রামন লালের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হচ্ছে। বহুলোক জড়ো হয়েছে সেখানে। মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস—এরকম একটা অনুষ্ঠান তো বড়ো একটা দেখা যায় না। আমি যাবো দেখতে। ফ্রান্সিস বলল—তোমার সঙ্গে শাঙ্কোও থাক।

—তুমিও চলো না। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস মাথা নাড়ল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রামন লালের পবিত্র দেহ সমাধিস্থ হওয়ার পরেও লোকের আসার বিরাম নেই। বিকেল নাগাদ সমাধিভূমি জনশূন্য হয়ে গেল।

সন্ধ্যেবেলা ফ্রান্সিস সালভাকে বলল—তুমি বলেছিলে এই প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে একটা ছোট গীর্জা আছে।—হ্যাঁ—শিক্ষাগুরুদের বাড়িগুলোর ওপাশে। এই গীর্জাটা ছাত্র আর শিক্ষাগুরুদের জন্যে। সালভা বলল।

—রামন লালও কি ঐ গীর্জায় উপাসনা করতে যেতেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না। তাঁর থাকার ঘরের পাশে আছে একটা ছোট ঘর। সেখানে যীশুর মূর্তি আছে। তিনি সেই ঘরেই নিয়মিত উপাসনা করতেন। সালভার কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস সাগ্রহে বলল—এরকম একটা ঘর আছে নাকি? কিন্তু তুমি তো আমায় বলোনি।

—রামন লাল শুধু উপাসনার সময় আধঘণ্টার জন্যে ঐ ঘরটায় যেতেন। সালভা বলল। ফ্রান্সিস বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো তো আর একবার রামন লালের ঘরগুলো দেখবো।

—কিন্তু অন্ধকারে এখন—সালভা বলল।

—মোমবাতির আলোয় দেখবো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া বলে উঠল—কোথায় ভাবলাম পালমা নগরটা আজকে সন্ধ্যেবেলা একটু ঘুরেটুরে দেখবো—তা নয় তুমি চললে বাড়িঘর দেখতে। ফ্রান্সিস হাসল। বলল—

তুমি আর শাঙ্কো যাও—ঘুরে এসো তো। শাঙ্কো বলল—তুমিও চলো না।

—না শাঙ্কো—নক্শার রহস্যটাই এখন আমার চিন্তায়—আর কিছু ভাবতে পারছি না। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া কিন্তু নগরে বেড়াতে গেল না। ফ্রান্সিস আর সালভার পিছু পিছু চলল। শাঙ্কোও চলল সঙ্গে।

তালার চাবিটা সালভাই নিজের কাছে ম্যাত্রোর কাছ থেকে চেয়ে রেখেছিল।

রামন লালের ঘরের কাছে এল সবাই। সালভা দুটো মোমদানিতে দুটো বেশ মোটা লালচে রঙের মোম এনেছিল। মোম জ্বালাল। একটা মোমদানি নিজে নিল।

আর একটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল।

রামন লালের থাকার ঘরটা মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিস আবার খুঁটিয়ে দেখল। সেই ওপরের দিকে ফোকর মত জানলা। চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বানানো। নক্শার রহস্যভেদে কাজে লাগবে এমন কিছুই পেল না। বলল—সালভা উপাসনার ঘরটায় চলো। সালভা আলো নিয়ে ঘরের বাঁদিকের কোণায় এল। দেখা গেল একটা ছোট সাধারণ কাঠের দরজা। সালভা কয়েকটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। মাথা নিচু করে সবাইকে ঘরটায় ঢুকতে হল।

মোমবাতির আলোয় ফ্রান্সিসরা দেখল অন্য ঘরগুলোব মত এই ঘরেও উঁচুতে দেয়ালের দুটো চ্যাপ্টা লোহার গরাদ বসানো চৌকোনো জানলামত। তার নিচে দেয়ালে গায়ে যীশুর কাঠের একটা মূর্তি। একটা হালকা নীল সার্টিন কাপড়ে ঢাকা চৌকোনো লম্বাটে বেদীর ওপর মূর্তিটা রাখা। মূর্তির নিচে মেঝেয় একটা পশমের আসন এখনও পাতা রয়েছে। আলো নিয়ে ফ্রান্সিস ছোট ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখল। তারপর বলল—সালভা—এই উপাসনার ঘরে কি তুমি আসতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—কত এসেছি। সকালবেলা রামন লাল উপাসনা করতেন ঐ আসনে বসে। আমিও মাঝে মাঝে আসতাম। দেখতাম রামন লাল চোখ বুঁজে মাথা নিচু করে আসনে বসে আছেন। আমিও চুপ পরে তাঁর পেছনে বসে প্রার্থনা করতাম। উপাসনা সেরে আমাকে দেখে খুশি হতেন। একটু থেমে সালভা বলল—উনি আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন। সালভার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ও হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল। মারিয়া বলল—যীশুর মূর্তিটা কী সুন্দর। সালভা বলল—রামন লাল যখন প্রথম পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তখনই মূর্তিটা এনেছিলেন। জুডিয়ার এক গ্রাম্য মিস্ত্রির হাতে তৈরি।

ফ্রান্সিস কয়েকবার সমস্ত ঘরটা দেখল। তারপর বলল—চলো সব। সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাতে সবাই শুয়ে পড়েছে তখন। ফ্রান্সিস ডাকল—সালভা। সালভা ওর দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস বলল—দেখ নক্শাটা প্রথম দেখে আমি যা অনুমান করেছিলাম এখন সেটা আর অনুমান নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—রামন লাল নক্শায় যে জায়গাটা নির্দেশ করেছেন সেই জায়গাটা তোমার খুবই পরিচিত।

—কিন্তু আমি তো সেই জায়গাটা কোথায় কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সালভা বলল।

—সেটা আমিই তোমাকে বোঝাবো। আমার মনে হচ্ছে আমি সমাধানের কাছাকাছি এসেছি। ফ্রান্সিস বলল। তারপর বলল—রামনের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা তুমি পড়েছো। সবশেষের পাতায় যা লেখা আছে তুমি কি সেদিন সেটা ঠিক ঠিক আমাকে বলতে পেরেছিলে? সালভা একটু ভেবে বলল তখন আমার যা মনের অবস্থা—ঠিক ঠিক মনে রাখা সম্ভব ছিল না।

—যা হোক—দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা রাজার কাছে রয়েছে। কাল সকালে তুমি আমাদের রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দাও। ঐ পাণ্ডুলিপিটা আমি চাইবো।

রাজা দিলে পড়বো মানে তুমি পড়ে আমাকে অর্থ বলবে। রামন লাল ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সেটা আমি জানতে চাই। ফ্রান্সিস বলল।

পরদিন সকালে সালভা রাজপ্রাসাদে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। বলল—রাজা নিজেই তোমাকে দেখা করবার জন্যে একজন প্রহরীকে পাঠিয়েছেন।

—তাহলে তো ভালোই হল। ফ্রান্সিস বলল।

প্রহরীর সঙ্গে ফ্রান্সিসরা রাজার সাক্ষাতের জন্যে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। প্রহরী ফ্রান্সিসদের রাজার মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এসে বসাল।

কিছু পরে রাজা এলেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। রাজা বললেন—তোমরা পাণ্ডুলিপি খোঁজার ব্যাপারে কতদূর এগিয়েছো?

—মহামান্য রাজা—ফ্রান্সিস বলল—আমরা অনেকটা এগিয়েছি।

—খুশি হলাম। রাজা বললেন। তারপর মারিয়াকে বললেন—শুনলাম তুমি নাকি রাজকুমারী?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যাঁ মহামান্য রাজা—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—কী আশ্চর্য তোমার পোশাক দেখে আমি ভেবেছিলাম তুমি এই দেশের গ্রামের লোক। রাজা বললেন। মারিয়া বলল—আমি এই পোশাক স্মারক হিসেবে আমাদের দেশে নিয়ে যাবো। রাজা একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—সত্যিই আমি প্রীত হলাম। এবার ফ্রান্সিস বলল—

—মাননীয় রাজা—একটা অনুরোধ ছিল।

—বলো। রাজা বললেন।

—মহামতি রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা কিছুক্ষণের জন্যে আমি পড়তে চাই—বিশেষ করে শেষাংশটুকু।

—বেশ তো। সালভা নিয়ে যাবে—তোমাদের পড়ে বুঝিয়ে দেবে। রাজা উঠলেন। ভেতরে গেলেন। সালভাকে রেখে ফ্রান্সিসরা চলে এল।

কিছুক্ষণ পরে সালভা ফ্রান্সিসদের ঘরে এল। হাতে রামন লালের দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা। মারিয়া হাত বাড়িয়ে নিল ওটা। গ্রীক ভাষায় লেখা। ওর বোঝার কথা নয়। ফ্রান্সিস বলল—সালভা—কালিকলমের ব্যবস্থা করতে পারো? সালভা হাসল। বলল—এটা লেখাপড়ারই পীঠস্থান। আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন। ফ্রান্সিস হাসল। মাথা নেড়ে বলল—সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। সালভা চলে গেল। মারিয়া পাণ্ডুলিপিটা ফ্রান্সিসের হাতে দিল। একটু পরেই সালভা রূপোর দোয়াতদানি আর পালকের কলম নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের বিছানায় বসল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নক্‌শাটা বের করল। নক্‌শাটা মারিয়াকে দিয়ে বলল—সালভা পাণ্ডুলিপির শেষাংশটুকু স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে বলবে তুমি নক্‌শার কাগজের পেছনে সেটা লিখবে। মারিয়া বসল। নক্‌শার উল্টোপিঠে শেষ পাতাটা বের করল। অনুবাদ করে বলতে লাগল। মারিয়া লিখতে লাগল। পাণ্ডুলিপির পার্চমেন্ট কাগজগুলো খোলা। তখনও বাঁধানো হয় নি।

লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস পড়তে লাগল—"গ্রীস, মিশর, মেসোপটেমিয়া আরো নানা জায়গায় ঘুরে আমি নানাভাবে যেসব জায়গার অ্যালকোমিচর্চার তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং যেসব তথ্য সূত্রাকারে লিখে রেখেছিলাম সেসব আমার পরিভ্রমণকালে লেখা প্রথম পাণ্ডুলিপিতে।

এবার পরিভ্রমণে বহির্গত হবার পূর্বে সেই পাণ্ডুলিপি এক পবিত্রস্থানে গোপনে রেখে এসেছিলাম।

এবারের পরিভ্রমণকালে আমি অনেক কষ্টে কখনও জীবন বিপন্ন করে আরো তথ্য সংগ্রহ করেছি। এখন মাজোরকা ফিরে যাবো। সব তথ্য সূত্র একত্র করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবো। যদি সত্যিই আমি নিকৃষ্ট ধাতু সীসে দস্তা আর পারদ সোনায় রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে সমস্ত সূত্র তথ্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাগজপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করবো।" এই পর্যন্ত পড়ে ফ্রান্সিস আশ্চর্য হয়ে গেল। ও একবার সালভার মুখের দিকে তাকাল। মারিয়ার দিকে তাকাল। তারপর আবার পড়তে লাগল—"পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করবো যে মানুষও পারে বিপুল স্বর্ণসম্পদ সৃষ্টির অধিকার লাভ করেও তা তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করতে।"

পাণ্ডুলিপি এখানেই শেষ। ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—সালভা—রামন লাল শুধু মনস্বীই ছিলেন না—মহামতিও ছিলেন। এককথায় খাঁটি মানুষ ছিলেন। তারপর মাথা নিচু করে বলল—আমি তাঁকে নতমস্তকে আমাব অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সবাই চুপ করে রইল।

একটু পরে সালভা উঠে দাঁড়াল। বলল—সৈন্যদের ছাউনিতে আল আমিরির বিচার চলছে। আমাকে যেতে হবে। আমাদের আগুনে পোড়া বস্তীর পুনর্নির্মাণের খরচ আল আমিরির কাছ থেকে আদায় করবো। সালভা চলে গেল।

ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হ'ল। রামন লালের সংকল্পটা আবার পড়তে লাগল।

হঠাৎ দরজার কাছে কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস—ডাক। ফ্রান্সিস উঠে বসল। মারিয়া উঠে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল হ্যারি। পেছনে বিস্কো। হ্যারি আর ফ্রান্সিসকে উঠতে দিল না। বসা অবস্থাতেই ফ্রান্সিসকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিসের গায়ে হাত বুলোতে লাগল। ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠল। ফ্রান্সিস বুঝল সেটা। ধমক লাগাল—এই হ্যারি—কী ছেলেমানুষি হচ্ছে। বিস্কো তখন মারিয়াকে বলছে—দিন কয়েক আমরা অপেক্ষা করলাম। যেদিন রাতে রাজার সৈন্যবাহিনী পালমা নোভার দুর্গ দখল করল, আল আমিরিকে বন্দী করল সেদিনই আপনাদের জন্যে ভীষণ চিন্তা হল। পরদিনই এলাম। আগুনে পোড়া জেলেবস্তীতে তখন কয়েকটা পরিবার ফিরে এসেছে। সালভার কথা জিজ্ঞেস করতে ওরা সালভার বাবার কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তার কাছেই আপনাদের সব সংবাদ পেলাম। বিস্কো থামতেই হ্যারি বলে উঠল—ফ্রান্সিস তোমরা মরণজলা পার হয়েছিলে? মারিয়া বলে উঠল—আমি তো মরেই যাচ্ছিলাম। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল—হুঁ। বলল—তারপর তোমরা জাহাজ চালিয়ে পালমা বন্দরে এলে।

হ্যারি বলল—হ্যাঁ। আজ খুব ভোরে এসেছি। জাহাজ থেকে নেমে সোজা ছুটে এলাম এখানে। জানি বামন লাল এখানে থাকতেন। তোমরা এখানেই আসবে। কিন্তু দ্বাররক্ষীরা আটকাল। ভিনদেশি আমাদের রাজপ্রাসাদে ঢুকতে দেবে না। অগত্যা প্রধান ফটকের বাইরে আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম যদি তোমরা কেউ বেরিয়ে আসো বা তোমাদের কাউকে যদি দেখতে পাই।

—সে কি—ফ্রান্সিস বলল—সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছো। মাথা নেড়ে হ্যারি হাসল। বলল—সালভাকে প্রধান ফটকের দিকে আসতে দেখে আমরা চ্যাচামেচি শুরু করে দিলাম। সালভা ছুটে এল। তারপর এখন—হে বন্ধু— তোমার সম্মুখে। হ্যারির বলার ভঙ্গী শুনে ফ্রান্সিস মারিয়া হেসে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—শোন হ্যারি—এখন আমি জাহাজে যাবো না। মারিয়া আর শাঙ্কো যাক। মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—মারিয়ার পোশাকের চেহারা দেখেছো? মারিয়া বলে উঠল—পোশাক পাল্টাতে নয়। আমি জাহাজে যাবো আমার বন্ধুদের দুশ্চিন্তা দূর করতে।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে মারিয়া শাঙ্কো হ্যারিদের সঙ্গে জাহাজঘাটার দিকে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বামন লালের লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ ডাকল—সালভা। সালভা দরজার কাছে সেই ন্যাড়া ছেলেটাকে বলছিল—কীরে তুই এখানে কবে থেকে কাজ করছিস্? ছেলেটা কী বলতে যাচ্ছিল ফ্রান্সিসের ডাক শুনে থেমে গেল। সালভা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল—কী হল? ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে দরজার কাছে এল। বলল—বামন লালের উপাসনা ঘরে চলো।

—কেন? সালভা আশ্চর্য হয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—বামন লাল তাঁর লেখায় বলেছেন—'পবিত্রস্থান'-এ তিনি পাণ্ডুলিপি গোপনে রেখে গেছেন। উপাসনা ঘরের মত পবিত্রস্থান আর কী আছে। চলো। যেতে যেতে বলল—সালভা—নক্‌শার রহস্যের কুয়াশা কেটে যাচ্ছে।

দু'জনে বামন লালের উপাসনা ঘরে এল। ফ্রান্সিস ঘরটার চারদিকে তাকাতে লাগল। এখন দিনের বেলা। ওপরের চ্যাপ্টা লোহার গবাদ বসানো দুটো জানলা দিয়ে ঘরটায় আলো আসছে। জানলাটা দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস বলল—সালভা এখানকার শিক্ষাগুরুদের ঘরগুলো সব একদিকে আর সব ঘরেই এরকম জানলা আছে—তাই না?

—মনে তো হয়। লক্ষ্য করি নি তেমন। সালভা বলল।

—এখন যাও—সব ঘরে ক'টা করে জানলা আছে আর ক'টা করে গরাদ আছে দেখে এসো। ফ্রান্সিস বলল।

—আপনার মাথায় বোধহয় ভূত চেপেছে। বিড় বিড় করে কথাটা বলতে বলতে সালভা চলে গেল।

কিছুক্ষণ কাটল। ফ্রান্সিস তাকিয়ে আছে যীশুর মূর্তি আর বেদীর দিকে।

সালভা ফিরে এল। বলল—তিনটে করে জানলা আর ছ'টা করে গরাদ। তাতে হলটা কী? ফ্রান্সিস বলল।

—এ ঘরে জানলা দুটো আর গরাদ পাঁচটা করে দেখ। সালভা জানলা দুটো দেখল। গরাদগুলো গুনল। পাঁচটা। বলল—হ্যাঁ। ফ্রান্সিস হাতের নক্‌শাটা ওকে দেখিয়ে বলল—এই দেখ—এই দুটো জানলা আঁকা। সালভা দেখল। বলল—কিন্তু গরাদ তো পাঁচটা আঁকা নেই।

—যেটা আঁকা আছে সেটা রোমান অক্ষরে পাঁচ কিনা। দেখ ভালো করে। ফ্রান্সিস বলল। সালভা দেখে বলল—হ্যাঁ পাঁচই তো। ফ্রান্সিস বলল—

—ভুলে যেও না—রামন লাল যখন নক্‌শাটা আঁকেন তখন তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত। অসাড় হয়ে আসতে থাকা হাতে পাঁচটা দশটা টান দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই রোমান "V" এঁকেছেন। এই ঘরের জানলার গরাদও পাঁচটা। মিলে গেল কিনা। সালভা বলে উঠল—সত্যিই তো। ফ্রান্সিস বলল—এবার শেষ সূত্র। দেখ নিচে একটা লম্বাটে চৌকোনো দাগ আছে কিনা।

—হ্যাঁ আছে তো। সালভা বলল। ফ্রান্সিস বলল—

—যীশুর মূর্তির নিচে বেদীটা কাপড়ে ঢাক· তাই বুঝতে পারছি না ওটা পাথরের না কাঠের। তুমি কাপড়টা একটু সরিয়ে দেখ—ওটা কীসের? সালভা বেদীর সামনে গেল। বুকে ক্রুশ এঁকে মাথা নুইয়ে যীশুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আস্তে কাপড়টা কিছু সরিয়ে দেখল—লম্বাটে কাঠের দেরাজমত। ফ্রান্সিস দেখল সেটা। আরও দেখল সামনেটায় কাঠের ঢাকনা মত। সালভা কাপড়টা ছেড়ে দিল। দেরাজ ঢাকা পড়ে গেল। পেছন ফিরে সালভা দেখল—ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। একটুক্ষণ। চোখ মেলে ফ্রান্সিস বলে উঠল—মহামতি রামন লাল—আপনার আশীর্বাদে আমি আপনার পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পারলাম। সালভা তো অবাক। বলল—কিন্তু পাণ্ডুলিপি কোথায়? ফ্রান্সিস দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—সব বলবো মহামান্য রাজাকে।

তুমি এক্ষুণি রাজাকে গিয়ে বলো তিনি যেন এখানে একবার দয়া করে আসেন। কারণ পাণ্ডুলিপি পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনিই।

নিজের ঘরে ফিরে এল ওরা। ফ্রান্সিস কলমে কালি নিল। তারপর নক্‌শাটায় কী লিখতে লাগল। লেখা শেষ হলে ফ্রান্সিস সেই উপাসনা ঘরে গিয়ে রাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা এলেন। সঙ্গে মন্ত্রীমশাই। পেছনে সালভা আর ম্যাস্ত্রো। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে দু'জনকেই সম্মান জানাল। রাজা বললেন—পাণ্ডুলিপি কোথায়? ফ্রান্সিস রাজার হাতে নক্‌শাটা দিল। উল্টোপিঠটা দেখিয়ে বলল—মহামতি রামনের শেষ সংকল্পটা আপনি আর একবার পড়ুন—এই অনুরোধ। রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অনুবাদটা পড়লেন। মন্ত্রীমশাইকে দিলেন। মন্ত্রীমশাইও পড়লেন। ফ্রান্সিস বলল—মহামতি রামনের অ্যালকেমিচর্চার আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার শেষ সংকল্প তো জানেন। এরপরও কি প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা আছে মাননীয় রাজা? রাজা একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখো—নিকৃষ্ট ধাতুকে

সোনায় রূপান্তরিত করার আগ্রহ নিয়ে আমি প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের চেষ্টা করিনি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই প্রথম পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের চেষ্টা করেছি।

—তাহলে—আপনিই ঐ বেদীর ঢাকনার কাপড়টি দয়া করে সরান। ফ্রান্সিস বলল।

রাজা একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে নিয়ে যীশুর মূর্তির বেদীর সামনে এলেন। মাথা নিচু করে বুকে ক্রুশ আঁকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বেদী ঢাকা কাপড়টা সরালেন। সেই ওক কাঠের লম্বাটে দেরাজমত।

—ঢাকনাটা দয়া করে খুলুন। ফ্রান্সিস বলল। রাজা দেরাজের ঢাকনাটা আস্তে আস্তে খুললেন। ভেতরে দেখা গেল একটা মরোক্কো চামড়ায় বাঁধানো পাণ্ডুলিপি। রাজা পাণ্ডুলিপিটা আস্তে আস্তে বার করে আনলেন। সামান্য ছাইরঙা পার্চমেন্ট কাগজের পাণ্ডুলিপি পাতা ওল্টালেন। কিছুটা পড়লেন। তারপর মন্ত্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ—এটাই প্রথম পাণ্ডুলিপি। তারপর ফ্রান্সিসের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—তুমি নক্‌শার সমাধান বের করলে কী করে? ফ্রান্সিস রাজার হাতে নক্‌শাটা দিয়ে বলল—মাননীয় রাজা—মহামতি রামন লাল মৃত্যুকালীন দুঃসহ কষ্টের মধ্যেও যা আঁকতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি আমি সেটাই সম্পূর্ণ করে এঁকে এবং লিখে দিয়েছি। রাজা নক্‌শাটা দেখলেন—

আনন্দিত রাজা বললেন, "আমি নিজে এবং মাজোরকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" রাজা পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘরের বাইরে এলেন। প্রাসাদের দিকে চললেন। পেছনে মন্ত্রী।

ফ্রান্সিসরা নিজেদের ঘরে এল। তখনই সালভা ঘরে ঢুকল। বলল, "ফ্রান্সিস, আপনার বন্ধুরা জাহাজ চালিয়ে পালমা বন্দরে এসেছে। ওরা রাজপ্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে।"

ফ্রান্সিস বলে উঠল, "আমাদের কাজ শেষ। মারিয়া, শাঙ্কো, চলো আমাদের জাহাজে।"

ওরা রাজপ্রাসাদের বাইরে আসতে হ্যারি, বিস্কো, পেড্রো ছুটে এল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, "তোমাদের সব কথা আমরা শুনেছি।" বন্ধুরা আনন্দের ধ্বনি তুলল, "ও হো—হো—।" পালমার লোকেরা ওদের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। ভাইকিংরা এত আনন্দের কারণ বুঝল না।

ফ্রান্সিসরা দলবেঁধে এগিয়ে চলল জাহাজঘাটার দিকে।

নক্‌শাটা ভালো করে দেখে রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। বললেন—সত্যি তুমি যথেষ্ট বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছো। তারপর রাজা মন্ত্রীমশাইকে বললেন—মহান রামন লালের পরিভ্রমণের দুটি পাণ্ডুলিপিই এই পবিত্রস্থানে রাখা হবে। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—

—মহামান্য রাজা—যদি অভয় দেন তাহলে আমি বিনীতভাবে একটা অনুরোধ করছি।

—বলো। রাজা বললেন। ফ্রান্সিস বলল—সালভা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি পড়েছে। প্রথম পাণ্ডুলিপির বিষয়ে সে জানে। সে বলেছে মহামতি রামন দেশে দেশে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা এই দুটি পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন। শুধু অ্যালকেমির তথ্য ও সূত্র আলাদা করে এই পবিত্রস্থানে রাখুন। কিন্তু তাঁর পরিভ্রমণের মূল্যবান কাহিনী থেকে এখানকার শিক্ষাগুরু ও ছাত্রদের বঞ্চিত করবেন না। মহামতি রামন লালের রচনা তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক এটা কি মহামান্য রাজা চান না? রাজা ফ্রান্সিসের কথাটা মন দিয়ে শুনলেন। বললেন—তোমাব কথাটা ভেবে দেখবো। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—মহামান্য রাজা—আমার কর্তব্য শেষ। আমাকে আমাদের জাহাজে ফিবে যেতে হবে। আপনি অনুমতি দিন। রাজা বললেন—

—আমি নিজে এবং মাজোরকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ফ্রান্সিস মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে ঘরের বাইরে এল। সালভা ছুটে এল। বলল—চলুন—আপনাকে জাহাজঘাটায় নিয়ে যাই। ফ্রান্সিস হেসে বলল—ধন্যবাদ সালভা—আমি একাই যেতে পারবো। তুমি রাজা ও মন্ত্রীমশাইয়ের কাছে থাক।

বন্দরে যখন ফ্রান্সিস পৌঁছল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বেশ ক'টা জাহাজ রয়েছে বন্দরে। নিজেদের বহু পরিচিত অনেক সুখ-দুঃখের সঙ্গী সেই জাহাজ খুঁজে নিতে দেরি হল না।

ফ্রান্সিস যখন পাতা পাটাতন দিয়ে জাহাজে উঠছে রেলিঙে দাঁড়ানো বন্ধুরা চেঁচিয়ে বলল—ফ্রান্সিস এসেছে। মুহূর্তে বন্ধুরা অনেকে ডেক-এ উঠে এল। ফ্রান্সিস জাহাজের ডেক-এ পা ফেলা মাত্র ওরা ছুটে এল। সবাই ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরতে চায়। আনন্দের ধ্বনি তুলল ওরা—ও—হো—হো। মারিয়া আর হ্যারি ছুটে এল। মারিয়া বলল—পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে পেরেছো? ফ্রান্সিস হেসে বলল—হ্যাঁ। মারিয়া বলে উঠল—আমাকে তো থাকতেই দিলে না। ফ্রান্সিস—মারিয়া—তোমার অনেক ধকল গেছে। পরিচিত পরিবেশে তোমার বিশ্রামের দরকার ছিল। তাই তোমাকে জাহাজে পাঠিয়েছিলাম। মারিয়া আর কিছু বলল না। ফ্রান্সিস হেসে দু'হাত ছড়িয়ে বলল—মারিয়া—এবারও আমার হাত শূন্য। আমি কিছুই আনতে পারিনি। মারিয়া মাথা নেড়ে বলল—তাতে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। শাঙ্কো বলল—সবাই জানতে চাইছে তুমি কী করে পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করলে।

ফ্রান্সিস বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—ভাইসব—সব তোমাদের বলবো কিন্তু তার আগে আমাকে খেতে দাও। বড্ড খিদে পেয়েছে।

বন্ধুরা ফ্রান্সিসকে প্রায় পাঁজাকোলা কবে নিয়ে চলল।

চার্লসের স্বর্ণসম্পদ

চার্লসের স্বর্ণসম্পদ

কেরিনিয়া বন্দর ছেড়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজ এল মাঝ সমুদ্রে। এবার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা তুলল ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা। মারিয়া মুখে কিছু না বললেও সেও যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফিরে যেতে চায় এটা ওর মুখ দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল।

অগত্যা ফ্রান্সিস সেদিন বিকেলে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়া, হ্যারি, বিস্কো। ফ্রান্সিস মুখে কিছু বলে নি। বন্ধুদের দেশে ফেরার জন্যে বার বার তাগাদা শুনে গেছে। এখন ফ্রান্সিস জাহাজ চালক ফ্রেজারকে কী নির্দেশ দেয় সবাই সেটা শোনবার জন্যে ডেক-এ এসে জড়ো হল।

ফ্রান্সিস ফ্রেজারের কাছে এল। বলল—ফ্রেজার, দিক ঠিক করে জাহাজ দেশের দিকে চালাও। কথাটা শুনেই সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো-। এই ধ্বনি ওদের আনন্দের প্রতিবাদের আবার সঙ্কল্পেরও ধ্বনি।

একদল উঠে গেল পাল খাটাবার কাঠের ওপরে। দড়িদড়া টেনে—পালগুলো ঠিক করে দিতেই পালগুলো ফুলে উঠল হাওয়ার তোড়ে। জাহাজ চলল দ্রুতগতিতে। দাঁড় বাইবার প্রয়োজন নেই। তবু দাঁড় বাইতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং দাঁড়-ঘরে নেমে এসে দাঁড়ে হাত লাগাল। জাহাজের গতি আরো বাড়ল। সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে জাহাজ চলল দ্রুতগতিতে। মারিয়ার দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস হেসে বলল—কি? খুশি তো?

—ভীষণ খুশি। মারিয়া প্রায় লাফিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত বলে উঠল।

ফ্রান্সিসদের জাহাজ চলেছে। নির্মেঘ আকাশ। বাতাসও বেগবান। জাহাজ চলেছে দ্রুতগতিতে।

সেদিন ভোর ভোর সময়ে নজরদার পেড্রোর হাঁক শোনা গেল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন ভাইকিং জাহাজের ডেক-এ শুয়ে ছিল। একজন উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বলল—পেড্রো ভালো করে দেখ ডাঙা বালির মাটির না পাথরের। পেড্রো চোখ কুঁচকে তাকাল। তখনই সূর্য যেন সমুদ্রের জলের ঢেউয়ের মধ্যে থেকে উঠল। রোদ ছড়াল। পেড্রো তাকিয়ে দেখতে দেখতে গলা চড়িয়ে বলল—পাথুরে ডাঙা। ঢালু হয়ে সমুদ্রের পার পর্যন্ত এসেছে। ডেক-এ বিস্কোও শুয়েছিল। ওর ঘুম ভেঙে গেল। বিস্কো উঠে দাঁড়াল। মাস্তুলের ওপরে বসে থাকা পেড্রোকে চেঁচিয়ে বলল—পেড্রো ভালো করে দেখ। আমি ফ্রান্সিসকে ডাকতে যাচ্ছি। পেড্রোও গলা চড়িয়ে বলল—কিছুক্ষেণের মধ্যে তোমরাও দেখতে পাবে।

বিস্কো চলল ফ্রান্সিসকে ডাকতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে

এল। পেছনে মারিয়া। ফ্রান্সিস রেলিঙে ভর দিয়ে ডাঙার দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্রের বুকে ঘন কুয়াশা। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস অপেক্ষা করতে লাগল—কখন কুয়াশা কেটে যায়। ওদের ভাগ্য ভাল। একটু পরেই হঠাৎ সব কুয়াশা কেটে গেল। সকালের রোদে স্পষ্ট দেখা গেল ডাঙা। পাথুরে ডাঙা। ঢালু হয়ে সমুদ্রের জল পর্যন্ত নেমে এসেছে। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—কী করবে এখন?

—ফ্লেজারের কাছে চলো। ফ্রান্সিস বলল। তিনজনে এবার চলল জাহাজ চালক ফ্লেজারের কাছে। ওরা ফ্লেজারের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—ফ্লেজার—ডাঙা দেখা যাচ্ছে। জাহাজ কি তীরে ভেড়ানো যাবে? না নৌকো নিয়ে যেতে হবে? ফ্লেজার জাহাজের হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—যতদূর মনে হচ্ছে—সমুদ্রের তীর পর্যন্ত জাহাজ নিয়ে যাওয়া যাবে।

—তাই নিয়ে চলো। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া একটু ভীতস্বরে বলল—এখানে নামবে নাকি?

—উপায় নেই। কোথায় এলাম এটা না জানতে পারলে কতদূরে কোনদিকে আমাদের দেশ—সেটা বুঝবো কী করে। ফ্রান্সিস বলল। হ্যারি বলল—রাজকুমারী—আপনার কী মনে হয়? কোথায় এলাম আমরা?

—সঠিক তো বলতে পারবো না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি আমরা এখনও ভূমধ্যসাগর থেকে বেরোতে পারিনি। আমরা সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে দক্ষিণ মুখে আসছি। যদি আমার হিসেব ঠিক থাকে তবে এখন যে ডাঙা দেখছি সেটা মাল্টা দ্বীপপুঞ্জের কোন দ্বীপ।

—রাজকুমারীর অনুমান সঠিক। হ্যারি বলল।

—সেটা জেনে খোঁজ না করলে জানা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল। ফ্লেজারকে বলল—ফ্লেজার, জাহাজ যদি তীর পর্যন্ত যায় তবে তীরের কাছে যাও।

—হ্যাঁ—জাহাজ তীর পর্যন্ত যাবে। ফ্লেজার বলল। তারপর তীরের দিকে জাহাজ চালাল।

দূর থেকে দেখা গেল—একটা ছোট জাহাজ তীরে ভেড়ানো আছে। বোঝাই যাচ্ছে এটা জাহাজঘাটা। এবার জাহাজঘাটার পরেই লোকজন যাওয়া আসা করছে এটা দেখা গেল। ফ্রান্সিস এবার সাবধান হল। দিনের বেলা জাহাজ ভেড়ানো ঠিক হবে না। ফ্রান্সিস বলল—ফ্লেজার—জাহাজঘাটায় এখন এই দিনের বেলা জাহাজ ভেড়ানো ঠিক হবে না। এখানকার খোঁজখবর আমরা রাতে আনতে যাবো। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলল—ডানদিকের ঐদিকের তীরের কাছেই ঝোপ জঙ্গল শুরু হয়েছে। আমরা সন্ধ্যেবেলা ঐদিকের তীরেই জাহাজ ভেড়াবো। এখন তো এখানেই নোঙর ফেলো। আমরা এখন আর এগোবো না।

—বেশ। ফ্লেজার বলল। তারপরে বিস্কো আর কয়েকজনকে বলল—নোঙর ফেলো। বিস্কোরা নোঙর ফেলতে গেল। ফ্লেজার আর কয়েকজন বন্ধুদের

বলল—পাল নামাও। আমরা আর এগোব না। বন্ধুরা চলল পাল নামাতে। নোঙর ফেলা হল। পাল গুটিয়ে ফেলা হল। জাহাজ থামল। ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা দোল খেতে লাগল।

এখন কোন কাজ নেই। ভাইকিংরা এখানে ওখানে জড়ো হয়ে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিকেলে পশ্চিম আকাশে রঙীন মেঘ দেখা গেল। গভীর কমলা রঙের সূর্য আস্তে আস্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যেন ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পরেই পশ্চিম আকাশের কমলা রং মিলিয়ে গেল। অন্ধকার নামল।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে বলল—রাত গভীর হলে আমরা ডাঙায় নামবো। তৈরি হয়ে এসো। মারিয়া পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও বলে উঠল—আমিও যাবো। ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—না। তোমাকে নিয়ে যাবো না।

—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বিদেশ বিভুঁই। আমরা এখানকার কিছুই জানি না। যদি বিপদে পড়ি আপনি থাকলে আমাদের বিপদ বেড়ে যাবে কমবে না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে ঠিক আছে। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর চলে গেল।

তখন রাত গভীর। ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কোকে নিয়ে জাহাজের ডেকে উঠে এল। দেখল ফ্রেজার হুইলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন ভাইকিং বন্ধু নোঙর তুলল। কয়েকজন ভাইকিং ফ্রেজারের নির্দেশে দাঁড়ঘরে নেমে গেল। দাঁড় বাওয়া চলল। ফ্রেজার হুইল ঘুরিয়ে জাহাজ চালাল তীরের দিকে। জাহাজটা আস্তে আস্তে সমুদ্রতীরে ভিড়ল। কাঠের পাটাতন পাতা হল। যথাসম্ভব নিঃশব্দেই সব কাজ হল।

পাটাতনের ওপব দিয়ে ফ্রান্সিস হ্যারি আর শাঙ্কো হেঁটে তীরে নামল। একটু মাঠমতো। তারপরই জঙ্গল শুরু হয়েছে। ওরা মাঠ পার হয়ে চলল। জোছনা উজ্জ্বল। কাছাকাছি সবই দেখা যাচ্ছে। ওরা একটু পরেই জঙ্গলে ঢুকল। বন খুব ঘন নয়। ছাড়াছাড়া গাছপালা। ঘাস-ঢাকা মাটিতে কোথাও কোথাও ভাঙা জোছনা পড়েছে। ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল।

বনজঙ্গল শেষ হল। বনজঙ্গল থেকে বেরিয়ে দেখল একটা বড় রাস্তা উত্তরমুখো চলে গেছে। দুপাশে পাথর আর কাঠের বাড়ি। বসতি এলাকা।

ফ্রান্সিসরা দাঁড়িয়ে পড়ল। কোন বাড়িতে ডেকে খোঁজ নেবে ফ্রান্সিস এরকমই ভাবছিল। তখনই হঠাৎ ডানদিকে গলিমত একটা পথ দিয়ে জনা দশেক সৈন্য এসে হাজির হল। সৈন্যদের বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। ঝোলা হাতা হাঁটুঝুল ঢোলা জামা। কোমরে ফেট্টি তাতে তরোয়াল গোঁজা। প্রয়োজনে এঁদের সঙ্গে লড়া যাবে। একেবারে ফ্রান্সিসদের মুখোমুখি। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুদলই দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত। সৈন্যরা প্রায় ফ্রান্সিসদের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়তে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। পাথুরে মাটিতে শব্দ হল—ঝনাৎ। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি শাঙ্কো—তরোয়াল ফেলে দাও। ফ্রান্সিসদের অস্ত্র ত্যাগ করতে দেখে সৈন্যদের মধ্যে থেকে থুতনিতে ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা একজন সর্দার গোছের সৈন্য এগিয়ে এল। গ্রীক ভাষায় বলল—তোমরা তো এখানকার লোক নও। হ্যারি বলল।

—না। আমরা ভাইকিং। বিদেশী।

—এখানে কেন এসেছো? লোকটি বলল।

—দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ানো আমাদের নেশা। হ্যারি বলল।

সর্দার ওর সঙ্গীদের দিকে তাকাল।

তখন সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল—তোমরা এখানে কী করে এলে?

—জাহাজে চড়ে। হ্যারি বলল।

—তোমাদের জাহাজ কোথায়? সর্দার জানতে চাইল।

—ঐ জঙ্গলের পরে সমুদ্রতীরে ভিড়িয়ে রাখা হয়েছে। হ্যারি বলল।

—তোমরা এখন কোত্থেকে আসছো? সর্দার জিজ্ঞেস করল।

—সাইপ্রাস দ্বীপ থেকে। হ্যারি বলল।

—মিথ্যে কথা। সর্দার গলায় জোর দিয়ে বলল।

—ভাইকিংরা মিথ্যে কথা বলে না। হ্যারিও গলা চড়িয়ে বলল।

—তোমরা রাজা তৃতীয় পিটারের গুপ্তচর। খোঁজ নিতে এসেছো—আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত। কোথায় কোথায় আমাদের ঘাঁটি। লোকটি বলল।

—আমি আবার বলছি। আমরা কোন রাজার গুপ্তচর নই। আমরা ভাইকিং। জাহাজে চড়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। সমস্ত পৃথিবীই আমাদের ঘরবাড়ি। হ্যারি বলল।

সর্দার থুতনির ছুঁচোলো দাড়িতে কয়েকবার হাত বুলোল। তারপব বলল—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। কালকে দলপতি যা হুকুম দেবেন তাই পালিত হবে।

—কী কথা হল বলো। ফ্রান্সিস বলল।

হ্যারি আস্তে আস্তে সর্দার যা বলল সেসব জানাল। ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি উপায় নেই। রাজা তৃতীয় পিটারের নাম আমরা এই প্রথম শুনলাম এসব বলেও রেহাই পাবো না। অগত্যা এখন বন্দীদশা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। সর্দার বলল—এবার চলো। একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল নিয়ে চলল।

সর্দার ফ্রান্সিসদের আগে রাখল। পেছনে সৈন্যরা আসতে লাগল। চাঁদের উজ্জ্বল আলোতে দেখা গেল দুপাশে নিঝুম বাড়িঘরদোর। ফ্রান্সিসরা হেঁটে চলল। ফ্রান্সিসের শুধু এক চিন্তা—ওদের যে বন্দীশালায় রাখা হবে সেটা কেমন।

কিছুক্ষণ পরে সর্দার ওদের একটা খোলা মাঠমত জায়গায় নিয়ে এল। মাঠটার

চারদিক কাঁটা তারে ঘেরা। প্রবেশদ্বারের সামনে আনা হল। প্রবেশদ্বারও কাঁটা তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তৈরি। সবাই প্রবেশদ্বারের সামনে এসে দাঁড়াল। দুতিনজন পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছিল।

সর্দার পাহারাদারদের কী বলল। একজন পাহারাদার কোমরের ফেট্টি থেকে চাবির তোড়া বের করল। চাঁদের আলোয় তোড়ার ঠিক চাবিটা বের করল। কাঁটাতারের দরজাটা খুলল। ফ্রান্সিসদের ঠেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। হ্যারি জানে এ ধরনের ব্যবহার ফ্রান্সিস সহ্য করবে না। তাই গলা চড়িয়ে বলল—ফ্রান্সিস—সব মেনে নাও। মাথা গরম করো না। ফ্রান্সিস কোন কথা বলল না—রুখেও দাঁড়াল না। ওরা বন্দী শিবিরে ঢুকল। দেখল—আগেও কিছু বন্দী মাটিতে শুয়ে বসে আছে।

ফ্রান্সিসরা কাঁটাতারের বেড়ার কাছে বসল। ফ্রান্সিস ধূলোটে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—হ্যারি তুমি ঘুমিয়ে নাও। রাত জাগা তোমার সইবে না।

—কিন্তু তুমি? হ্যারি বলল।

—বাকি রাতটা জেগেই কাটাবো। ফ্রান্সিস বলল।

শাঙ্কো বলল—না ফ্রান্সিস—তুমি ঘুমোও আমি জেগে থাকবো। কপালে দুহাত রেখে ফ্রান্সিস চোখ বুঁজল। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ল না। নানা চিন্তা মাথায়।

ভোর হল। সকালের উজ্জ্বল রোদ ছড়ালো কাঁটাতারে ঘেরা বন্দী শিবিরে। উত্তর দিকের জঙ্গল থেকে বিচিত্র পাখির ডাক শোনা গেল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—যাও তো ঐ বন্দীদের সঙ্গে কথা বলে এসো। এই দলপতি কেমন লোক। ওদের বন্দী করেছে কেন—মাল্টা এখান থেকে কতদূর সব খবর নিয়ে এসো।

হ্যারি আগে থেকে বন্দীদের কাছে গেল। গ্রীক ভাষায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল। তখনই পাহারাদারেরা সকলের খাবার নিয়ে ঢুকল। বন্দীদের বসতে বলল। সামনে একটা করে বড় পাতা দেওয়া হল। খেতে দেওয়া হল গোল কাটা রুটি আর আলু শাক-সব্জীর ঝোল। খেতে খেতে হ্যারি বলল—ওরা প্রায় সবাই দস্যুতার জন্যে এখানে কয়েদ হয়ে আছে। এখনকার শাসক দলপতি নাকি অদ্ভুত লোক। নিজেই টহলদার সৈন্যদের সঙ্গে পাহারা দেয়। দলপতির নাম সিক্কা। মাল্টা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। হ্যারি একটু থেমে বলল—সবচেয়ে মারাত্মক খবর হল—কয়েকদিন পরেই এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। সুস্থ সবল বন্দীদের সেই হাটে বিক্রী করা হবে।

—বলো কি! ক্রীতদাস কেনাবেচা যারা করে তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবিকতা বোধ থাকে না। তাদের কাছে ক্রীতদাসরা গরু ছাগলের মত। বোঝাই যাচ্ছে—আমরা ভয়ানক বিপদে পড়েছি। শুধু বন্দীর জীবন মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ক্রীতদাসের জীবন মেনে নেওয়া অসম্ভব। ফ্রান্সিস বলল।

—কী বরবে এখন? হ্যারি বলল।

—পালাবার উপায় বের করতে হবে। এখানকার পাহারার ব্যবস্থা দেখে পালানোর উপায় ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

একটু বেলা হতে বন্দী শিবিরের দরজার সামনে সৈন্যদের তৎপরতা দেখা গেল। তার মানে ওদের দলনেতা সিঙ্কা হয়তো আসবে। তারই তোড়জোড় শুরু হল।

কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে গেল। একজন বৃদ্ধকে নিয়ে সিঙ্কা ঢুকল। এ কি? এ তো সেই থুতনিতে ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা লোকটা। সিঙ্কা বুঝল ফ্রান্সিসরা একটু অবাকই হয়েছে। সিঙ্কা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। হাসি নয়। যেন দাঁত খিঁচিয়ে বলল—এবার ক্রীতদাসের হাটে আমরা ভালো দর পাবো। এরকম বলিষ্ঠদেহী সাদা মানুষ তো সব সময় পাওয়া যায় না। ফ্রান্সিস বুঝল ওদের ক্রীতদাসের কেনাবেচার হাটে বিক্রি করা হবে। ফ্রান্সিস বসেছিল। এবার দ্রুত উঠে দাঁড়াল। স্পেনীয় ভাষায় বলল—আমাদের কেন ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করা হবে? আমাদের অপরাধ কী?

—বাঃ তোমরা তো রাজা পিটারের গুপ্তচর। তোমাদের মেরেই ফেলতাম কিন্তু তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছি ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করবো বলে। সিঙ্কাও স্পেনীয় ভাষায় বলল।

—আগে প্রমাণ করুন যে আমরা রাজা পিটারের গুপ্তচর। যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে যে শাস্তি দিতে চান দেবেন। আমরা সেই শাস্তি মেনে নেব। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমাদের ব্যাপারে অত খোঁজখবর করা যাবে না। তোমাদের ক্রীতদাস কেনাবেচার হাটে বিক্রি করা হবে। ব্যস্—! সিঙ্কা বলল।

ফ্রান্সিস আর কোন কথা বলল না। মাটিতে বসে পড়ল।

সিঙ্কা দস্যুদলের কাছে গেল। বলল—তোমাদেরও বিক্রি করা হবে। সব মিলিয়ে এবার আমার ব্যবসা ভালোই হবে। সিঙ্কা খুক্ খুক্ করে হাসল। তারপর দরজার দিকে চলল। যেতে যেতে গলা চড়িয়ে বলল—এদের যত্নটত্ন করবি। ভালো খেতে দিবি। কারো যেন অসুখ না করে। সবারই একেবারে তরতাজা চেহারা চাই। তবে না ক্রীতদাস বেচাকেনার হাটে বেশি দাম পাবো।

সিঙ্কা বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হল।

ফ্রান্সিসদের বন্দীজীবন কাটতে লাগল। ফ্রান্সিস সারাক্ষণ শুয়ে থাকে আর ভাবে কীভাবে এই বন্দী শিবির থেকে পালানো যায়।

দুদিন একইভাবে কাটল।

তৃতীয় দিন। তখন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেয়েছে। ফ্রান্সিস সামান্য ঘাসধুলোর ওপর শুয়ে পড়ল। মাথায় এক চিন্তা—কী করে মুক্তি পাবো।

একটু পরে হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস—ওঠো আমাদের সমস্যা আরো বাড়ল। ফ্রান্সিস চোখের ওপর থেকে দুহাতের কনুই সরিয়ে তাকাল। বলল—ওকথা বলছো কেন?

—রাজকুমারী বিস্কো পেড্রো আরো কয়েকজন বন্দী হল। হ্যারি বলল।

—বলো কি? ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে বসল। দেখল—দরজা খোলা হল। রাজকুমারী বিস্কোরা ঢুকছে। ফ্রান্সিস বলে উঠল—সর্বনাশ। আর পালাবার ভরসা নেই। ক্রীতদাসের হাটে আমরা বিক্রি হয়ে যাবো।

মারিয়ারা ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বসল।

ফ্রান্সিস রেগে বলে উঠল—তোমরা এত অধৈর্য হয়ে পড়লে কেন? মারিয়া বিস্কো—তোমরা কেন এলে?

—তোমাদের কোন খোঁজ নেই দুদিন ধরে। আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি? মারিয়া একটু কান্নাভেজা গলায় বলল।

—আমাদের খুঁজতে এসে লাভের মধ্যে আমাদের সমস্যা বাড়ালে। ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তো—মারিয়া বলতে গেল। ফ্রান্সিস ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—খুব অন্যায় করেছো। জানো দুদিন পরে এখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। ভেবেছিলাম তার আগেই পালাবো। তোমরা ধরা পড়লে—আর কোন উপায় নেই। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি হতে হবে।

—এর মধ্যে তো একটা উপায় বার করতে পারবে। মারিয়া বলল।

—ক্রীতদাস কেনাবেচা যারা করে তারা যে কী হৃদয়হীন তা তোমার জানা নেই। এদের কবল থেকে বাঁচতে গেলে হয় মরতে হবে নাতো সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল। মারিয়া চুপ করে রইল তারপর কেঁদে ফেলল। বলল—তাহলে এদের আমি বলবো যে আমাকে বিক্রি করুক তোমাদের যেন মুক্তি দেয়।

—এ কথাটা তুমি বলতে পারলে? ফ্রান্সিস আস্তে বলল। মারিয়া কোন কথা না বলে কাঁদতে লাগল। হ্যারি মারিয়ার কাছে এসে বসল। বলল—রাজকুমারী আপনি কান্নাকাটি করলে আমাদের মন দুর্বল হয়ে যাবে। আপনি শান্ত হোন। ফ্রান্সিস নিশ্চয় পালাবার কোন উপায় বের করবে। শুধু আপনি ভেঙে পড়বেন না—এই অনুরোধ। মারিয়া চোখ মুছল। আস্তে আস্তে শান্ত হল।

শাঙ্কো এতক্ষণ ফ্রান্সিসদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার বলল—ফ্রান্সিস আমি আজ রাতেই পালাবো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি চমকে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো —তুমি কি পাগল হলে। এই কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীশিবির থেকে পালানো অসম্ভব বলবো না। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

—ফ্রান্সিস, শুধু আমিই পালাবো। বাইরে থেকে তোমাদের মুক্তির ব্যবস্থা

করবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমাকে বোঝাও কী করে পালাবে? ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো—দেখাচ্ছি। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। দু'জনে চলল সদর দরজার দিকে।

দরজার কাছে এসে শাঙ্কো একজন পাহারাদারকে স্পেনীয় ভাষায় বলল—জল আনো। জল ফুরিয়ে গেছে। পাহারাদারটি বলে উঠল—তা কি করে হয়। সকালেই কাঠের পীপেয় জল ভরা হয়েছে।

—ঠিক আছে। তুমি দেখবে এসো। শাঙ্কো বলল। পাহারাদার দরজার তালা খুলে ঢুকল। চলল খাবার জল আছে কিনা দেখতে। অন্য পাহারাদারটি তরোয়াল উঁচিয়ে দরজা পাহারা দিতে লাগল।

শাঙ্কো মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস—দরজার দুপাশে আর ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখ শুধু তারে বাঁধা। ফ্রান্সিস পায়চারি করতে করতে লক্ষ্য করল। শাঙ্কোর কথা ঠিক। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। কিন্তু ওপরে হাত পাঁচেক কাঁটা- তারে ঘেরা।

—ঐটুকু পেরোতেই সাবধান হতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—তবু তুমি আহত হবেই। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। সে সব কাটাটাটা ভেন-এর ওষুধেই সেরে যাবে। কিন্তু পালাবার এই সুযোগ ছাড়া যাবে না। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস আর কিছু বলল না। তখনই পাহারাদারটি এল। ভাঙাভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলল—তোমাকে কে বলেছে যে জল নেই। পীপে ভর্তি জল।

—তাহলে কেউ মিথ্যে করে বলেছে। শাঙ্কো বলল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো নিজেদের জায়গায় ফিরে এলো।

ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো—তুমি দরজার মাথা দিয়ে পালাতে চাও। কিন্তু ঐখানে রাতে মশাল জ্বলে আর পাহারাদারেরা পাহারা দেয়। ওদের নজর এড়িয়ে উঠে পালাতে পারবে?

—ফ্রান্সিস—আকাশের দিকে তাকাও। শাঙ্কো বলল। ফ্রান্সিস কথাটার অর্থ বুঝল না। ওপরে খোলা আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশে কালো মেঘের আসা যাওয়া চলছে। ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—বৃষ্টি হবে। দরজার মাথায় রাখা মশাল নিভে যাবে। পাহারাদাররাও সৈন্যদের ছাউনিতে চলে যাবে। তখন সাধারণ তারে পা রেখে রেখে ওঠা যাবে। বাকি হাত চার-পাঁচেক কাঁটা-তার পার হতে হবে। এই বলতে চাও।

শাঙ্কো হেসে বলল—ফ্রান্সিস তোমার বুদ্ধি চিন্তার কাছে আমরা ছেলেমানুষ।

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—উঁহু—শাঙ্কো—তুমি অনেক চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছো। এবার কাজটা করা। তার জন্যে এখন প্রয়োজন ঝড় বৃষ্টির। আকাশের মেঘ দেখে যা বুঝতে পারছি সন্ধ্যে নাগাদ ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে। আমরা ভাইকিং।

সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াই। ঝড়বৃষ্টির আগাম সংকেত আমরা সহজেই বুঝি। সাবাস—শাঙ্কো।

ফ্রান্সিসদের অনুমান সত্যি হল। সন্ধ্যের পরেই আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা রেখা আকাশটা যেন চিরে ফেলতে লাগল। সেই সঙ্গে বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দ।

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীশিবিরের ওপরে। শুরু হল বৃষ্টি। দরজার মাথায় রাখা মশাল নিভে গেল। পাহারাদার দু'জন সৈন্যদের ছাউনিতে চলে গেল। একজন ছাউনির জানালা দিয়ে বন্দীশিবিরের দিকে নজর রাখল।

গভীর অন্ধকারে শুধু বিদ্যুতের আলো ঝলসে উঠছে যখন তখন যা মুহূর্তের জন্যে দেখা যাচ্ছে।

—ফ্রান্সিস পালাচ্ছি। এই বলে শাঙ্কো দ্রুত বন্দীশিবিরের দরজার কাছে এল।

সাধারণ তারগুলোয় পা রেখে রেখে হাত দিয়ে ধরে ধরে উঠতে লাগল। এবার কাঁটাতার পার হওয়া। এটুকু উঠতে কয়েক প্যাঁচ কাঁটাতার হাত দিয়ে ধরতে হল। পায়ে ভর নিতে হ'লো। তাতেই কাঁটাতারের খোঁচায় হাত পা জখম হল।

এ বার শুধু কাঁটা তার পার হওয়া। শাঙ্কো উঠতে লাগল। হাতে পায়ে গায়ে কাঁটাতারের কাঁটা ফুটতে লাগল। বুকে গায়েও কাঁটা ফুটতে লাগল। শাঙ্কোর পোশাক রক্তে ভিজে গেল। কানের কাছে বৃষ্টিঝরার একটানা শব্দ। অন্ধকার চোখের সামনে। শুধু বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠা। ঐ দু এক মুহূর্তে। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

শাঙ্কো মুখ বুঁজে সব যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল। একসময় ওঠা শেষ হল। এবার নামা। শাঙ্কো কাঁটা ছাড়া তার দেখে দেখে নামতে লাগল। তখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শাঙ্কোকে যেই দেখল কাঁটাতারের বেড়া বেয়ে নেমে আসছে। পাহারাদার তার সৈন্যদের ছাউনির জানালা দিয়ে দেখল, সঙ্গীকে ডাকাডাকি করল। সঙ্গীকে পেল না। ওদিকে বন্দী পালাচ্ছে। পাহারাদারটি খোলা তরোয়াল হাতে ছুটে এল। শাঙ্কোও লাফ দিয়ে মাটিতে নেমেছে পাহারাদার তখনই ওর সামনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কোর পোশাক ছেঁড়া খোড়া। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঁবু হয়ে পোশাকের মধ্যে হাত বাড়িয়ে ছোরাটা বের করল। পাহারাদার তরোয়াল চালাল। শাঙ্কো ছোরা দিয়ে ঠেকাল। শাঙ্কো ভালো করেই বুঝেছিল শুধু ছোরা দিয়ে পাহারাদারের আক্রমণ ঠেকানো যাবে না। শাঙ্কো দ্রুত একবার চারপাশটা দেখে নিল। বাঁদিকে একটু দূরেই দেখল জঙ্গলমত। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটল। পাহারাদারও তরোয়াল হাতে ওর পেছনে পেছনে ছুটল।

শাঙ্কো জঙ্গলে ঢুকে পড়েই দিক পাল্টে বাঁদিকে সরে গেল। দ্রুত জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। পাহারাদার তখনও জঙ্গলে শাঙ্কোকে খুঁজছে।

এবার শাঙ্কো আস্তে আস্তে জঙ্গলে ঢুকল। ডালপাতার আড়াল থেকে

পাহারাদারটির দিকে এগোতে লাগল। পাহারাদারের হাত কয়েক পেছনে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো একটু মাথা নিচু করে তৈরি হল। বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের আলোয় আন্দাজ করে পাহারাদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের ছোরাটা পাহারাদারের পিঠে ঢুকিয়ে দিল। পাহারাদারটি শাঙ্কোর ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকবার নড়েচড়ে মরে গেল।

শাঙ্কো তখন হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। মাটিতে বসে পড়ল। একটুক্ষণ হাঁপালো।

তারপর ছোরাটা কোমরে গুঁজল। পাহারাদারের পোশাক টেনে খুলল। নিজের কাঁটাতারের ঘষ্‌টা লেগে শতচ্ছিন্ন পোশাকটা খুলল। তারপর পাহারাদারের পোশাকটা পরল। পোশাকের মাথাব কাছে কাপড়টা বেশি। ওটা দিয়ে মাথা ঢাকা যায়। শাঙ্কো পাহারাদারের তরোয়ালটা নিল।

কোমরের মোটা বেল্টটা লাগাতে লাগাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে বিদ্যুৎ চমকানো বন্ধ হয় নি।

অন্ধকারের মধ্যে শাঙ্কো আস্তে আস্তে কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীশিবিরের পেছনের দিকে এল। ফ্রান্সিসরা ঐদিকটাতেই বসেছিল। শাঙ্কো কাটাতারের বেড়ার কাছে এসে চাপা গলায় ডাকল—ফ্রান্সিস—ফ্রান্সিস। ফ্রান্সিস বৃষ্টিভেজা মাটিতেই শুয়ে ছিল। ডাক কানে যেতেই দ্রুত উঠে বসল। পেছনদিকে তাকাল। তখনই বিদ্যুৎ চমকালো। ও শাঙ্কোকে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এল।

শাঙ্কো বলল—আমি পোশাক পাল্টেছি। তরোয়ালও পেয়েছি। এখন কী করবো?

—দলপতি সিক্কার—সৈন্যদের মধ্যে মিশে থাকো। পরশু ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট বসবে। তখন আমাদের তো বন্দীশিবিরের বাইরে আনা হবে। হাটে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন পালাবার উপায় ভাববো। লড়াই করে নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে অক্ষত দেহে আমাদের পালাতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে সব ভালো করে দেখতে হবে। একটা উপায় বের করবোই। শাঙ্কো বলল।

—কাঁটাতারে ঘষা খেয়ে তুমি খুব আহত হওনিতো? হ্যারি এগিয়ে এসে বলল।

—তা সে হয়েইছি। ও ভেনের ওষুধে সেরে যাবে। এখন কী করে পালাবো সেটা ভাবতে হবে। শাঙ্কো বলল। তারপর ও সৈন্যদের ছাউনির দিকে চলল।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। শাঙ্কো ওপরে আকাশের দিকে তাকাল। দেখল আকাশ সাদাটে হয়ে আসছে। সূর্যোদয়ের বেশি দেরি নেই।

একটু পরেই সূর্য উঠল। আলো ছড়ালো সৈন্যদের ছাউনিতে বন্দী শিবিরে। ওপাশের জঙ্গলে পাখির ডাক শুরু হল।

শাঙ্কো সৈন্যদেব ছাউনিতে এ ঘর ও ঘর দেখতে লাগল। সব ঘরেই সৈন্যদের

সংখ্যা বেশি। পশ্চিম দিকে একটা ছোট্ট ঘর দেখল। কাছে এগিয়ে এল। ঘরটায় মাত্র একজন সৈন্য আছে। শাঙ্কো ঐ ঘরটাই বেছে নিল। ঘরে আর একটা খালি লোহার খাট।

শাঙ্কো ঘরটায় ঢুকল। দেখল সৈন্যটি ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে উঠে বসল। সৈন্যটি হাই তুলতে তুলতে শাঙ্কোকে দেখতে পেল। তারপর গ্রীক ভাষায় শাঙ্কোকে বলল—'ভাই তুমি কি কাউকে খুঁজছো?' শাঙ্কো হাসল। আঙ্গুল দিয়ে মুখ গলা দেখিয়ে আবার হাসল।

—ও বোবা কালা। সৈন্যটি বলল। শাঙ্কো হাত দিয়ে জল খাওয়ার ইঙ্গিত করল। সৈন্যটি বুঝল জলতেষ্টা পেয়েছে লোকটার। ও ঘরের কোণায় রাখা মাটির পাত্র দেখাল। শাঙ্কো গিয়ে জল খেয়ে এল।

সৈন্যটি চুপ করে বসে রইল। শাঙ্কোর সঙ্গে আর কী কথা বলবে। তবু হাত নেড়ে ইঙ্গিতে জানতে চাইল বোবা কালা লোকটা কোন দেশের কোত্থেকে এসেছে। শাঙ্কোও হেসে আঙ্গুল নেড়ে বোঝাল ও এই দেশেরই লোক। সৈন্যটি কী বুঝল কে জানে। সে চুপ করে রইল। এবার শাঙ্কো খালি লোহার খাটটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে বোঝাল এ খাটে সে শুতে চায় থাকতে চায়। সৈন্যটি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

সৈন্যটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো তখন খালি খাটেই শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। গত রাত জাগতে হয়েছে। সারা শরীরে হাতে পায়ে কাঁটাতারের খোঁচা। সেসব ঢাকতে শাঙ্কো হাত দুটো খোলা জামার পকেটে রাখল। সৈন্যটির নজরে পড়লে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কী করে কাটল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যটি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। দু'জনের খাবারই এনেছে। ঘুমন্ত শাঙ্কোকে ডাকতে গিয়ে দেখল শাঙ্কোর কাটা ছেঁড়া হাত। ও খাবারটা শাঙ্কোর বিছানাতেই রাখল। নিজেও খেল না। শাঙ্কোর ঘুম ভাঙার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শাঙ্কোর ঘুম ভাঙল। ও উঠে বসল। একটু সময় গেল বুঝতে যে ও এখন কোথায় আছে। সৈন্যটিকে দেখে বুঝল সব। সঙ্গে সঙ্গে ও হাত দুটো পকেটে পুরল। সৈন্যটি হেসে বলল—ঐ কাটা ছেঁড়া দাগ কি সবসময় পকেটে ঢেকে রাখতে পারবে? শাঙ্কো বোকার হাসি হাসল। সৈন্যটি ওর খাবার দেখিয়ে বলল—এবার তো হাত বের করতে হবেই। শাঙ্কো হেসে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে খেতে লাগল। খেতে খেতে সৈন্যটি শাঙ্কোকে ইঙ্গিতে বোঝাল—তোমার হাত মুখ এরকমভাবে কেটে ছড়ে গেল কেন? শাঙ্কো গাছে চড়ার ইঙ্গিত দিয়ে বোঝাল গাছে উঠতে গিয়ে হাত মুখ কেটে ছড়ে গেছে। সৈন্যটি মাথা নেড়ে বোঝাল ও বুঝতে পেরেছে। সৈন্যটি বেরিয়ে গেল। শাঙ্কো আবার ঘুমিয়ে নিল।

ওদিকে খোলা আকাশের নিচে বন্দীশিবিরে ফ্রান্সিসরা ঝড়বৃষ্টিতে ভিজে গেল। জল বেশি জমে নি। পূবদিকে ঢাল বেয়ে বৃষ্টির জল চলে গেছে। তবু মাটি তো

ভেজা। ফ্রান্সিসরা ভেজা মাটিতেই শুয়ে বসে রইল। ফ্রান্সিসের এরকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। বন্ধুরাও খুব একটা কাবু হয়নি। কিন্তু মারিয়া দুহাত বুকের কাছে নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে রইল।

ফ্রান্সিস উঠে গিয়ে ওর জামাটা খুলে ফেলল। ভেজা জামাটা দিয়ে মারিয়ার মাথা মুখ হাত পা মুছে দিতে লাগল। বিস্কো হ্যারিও জামা খুলে মারিয়ার মাথা হাত পা মুছিয়ে দিল। মারিয়ার শরীর একটু শুকোল। আগের ঠাণ্ডা ভাবটা আর রইল না।

সকালের খাবার খাওয়া হয়ে গেছে। কাঁটাতার আর কাঠে তৈরি দরজা দিয়ে দলপতি সিক্কা ঢুকল। হেসে সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—কাল রাতে তোমাদের খুব অসুবিধে হয়েছে তাই না? আমার বন্দীশিবিরটা এমনি। মাথার ওপরে খোলা আকাশ।

দলপতি সিক্কা এবার মারিয়ার দিকে তাকাল। মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করে বলল—আহা একে তোরা অন্য জায়গায় নিয়ে গেলি না কেন। দ্যাখ তো কী অবস্থা হয়েছে চেহারার। বেচাকেনার হাটে তো দাম পড়ে যাবে। একে অন্দরমহলে নিয়ে যা। চানটান করে নতুন পোশাক পরুক।

একজন পাহারাদার মারিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিস দ্রুত উঠে দাঁড়াল। বলল—উনি আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—তাহলে তো আরো ভালো। রাজকুমারী বলে কথা। সিক্‌কা হেসে বলল।

—আমি যাবো না। মারিয়া গলা চড়িয়ে বলে উঠল। ফ্রান্সিসও বলে উঠল—না—রাজকুমারীকে নিয়ে যেতে দেব না।

হ্যারি উঠে দাঁড়াল। বলল—ফ্রান্সিস বাধা দিও না। এই নরককুণ্ডে রাজকুমারী আর একদিনের জন্যে থাকলেও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। তাতে আমাদের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। অন্দরমহলে গিয়ে স্নান করে শুকনো পোশাক পরলেই রাজকুমারী সুস্থ থাকবেন। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বসে পড়ল। আর কোন কথা বলল না। মারিয়া মাথা নেড়ে বলে উঠল—না আমি যাবো না। হ্যারি বলল—রাজকুমারী আপনি আমাদের সকলের বিপদ ডেকে আনবেন না। আপনি যান। আপনি সুস্থ থাকুন এটাই আমরা চাই।

মারিয়া ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর পাহারাদারের সঙ্গে চলে গেল।

দলপতি সিক্কাও বেরিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা চুপ করে বসে রইল।

ওদিকে সৈন্যটি শাঙ্কোকে নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে গেল। শাঙ্কোর গায়ে সিক্‌কার সৈন্যদের পোশাক। কাজেই কেউ সন্দেহ করল না। শাঙ্কো বোবা কালার অভিনয় করতে লাগল।

খেয়েদেয়ে শাঙ্কো এবার চলল সমুদ্রতীরের দিকে। যেখানে ওদের জাহাজটা রয়েছে শাঙ্কো সেখানে এল। জাহাজ থেকে পার অব্দি পাতা কাঠের পাটাতনের

ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল।

বন্ধুরা ছুটে এল। সবাই জানতে চায় ফ্রান্সিসদের কথা। শাঙ্কো সকলের দিকে তাকিয়ে একে একে সব ঘটনা বলে গেল।

ফ্রেজার বলল—এখন কী করবে?

—দলপতি সিক্কা ফ্রান্সিসদের ক্রীতদাসের হাটে বিক্রির জন্যে তুলবেই। এখন পালানোর কথা ভাবতে হবে। কীভাবে ফ্রান্সিসদের মুক্ত করা যায়—এসব ভাবতে হবে। তার ব্যবস্থা করতে হবে। শাঙ্কো বলল।

—তুমি এখন কী করবে? ফ্রেজার বলল।

—আমি আজকের রাতটা জাহাজেই থাকবো। শাঙ্কো বলল। তারপর গায়ের পোশাকটা খুলে ফেলল। দেখা গেল ভেতরে ওদের পোশাকটাও ছিঁড়ে গেছে। বুকে পিঠে রক্তের দাগ। হাতেই সবচেয়ে দাগ বেশি। তখনও অনেক ক্ষতে রক্ত জমে আছে।

শাঙ্কো চারদিকে তাকিয়ে ভেনকে খুঁজল। ভেন এখানে নেই। শাঙ্কো ভেনের কাছে যাবে বলে এগোচ্ছে তখনই দেখা গেল ভেন ওর ওষুধপত্রের থলে নিয়ে আসছে। ভেন সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমরা শাঙ্কোকে বিরক্ত করো না। ওর এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।

সবাই চলে গেল। কয়েকজন রইল। ওরা চুপ করেই রইল।

ভেন শাঙ্কোকে বলল জামা খুলে ফেল। শাঙ্কো ওদের দেশীয় পোশাকটা খুলে ফেলল। এবার ভেন বলল—নড়াচড়া করো না।

ভেন থলে থেকে দুটো কাচের বোয়াম বের করল। বোয়াম দুটো রেখে থলে থেকে পরিষ্কার ন্যাকড়া বের করল। তারপর দুটো বোয়ামেরই ওষুধে ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে নিয়ে শাঙ্কোর কাটাছেঁড়া জায়গায় ওষুধ লাগাতে লাগল। এবার দেখা গেল শাঙ্কোর শরীর হাত পা কাঁটাতারের খোঁচায় কীভাবে কেটে গেছে। ভেন বারকয়েক ওষুধটা লাগাল। তারপর বলল—এখন পোশাক খুলেই রাখ। যাও শুয়ে পড় গে।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে উঠে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। জ্বালা যন্ত্রণা কমল অনেকটা।

সেই রাতটা শাঙ্কো জাহাজেই রইল।

পরদিন সকালেই সকালের খাবার খেয়ে চলল বন্দীশিবিরের দিকে। তার আগে দলপতি সিক্কার সৈন্যদের পোশাকটা পরে নিল। এখন এই পোশাকটাই ভরসা। সিক্কার সৈন্যদের চোখে ধুলো দেওয়ার এটাই বড় অস্ত্র।

অল্পক্ষণ পরেই শাঙ্কো বন্দীশিবিরের কাছে এল। দেখল এর মধ্যেই বন্দীশিবিরের বাইরে লোকজন জমে গেছে।

বন্দীশিবিরের পাশেই একটা পাথরের মঞ্চমত। তার মাঝখানে একটা গোল কাঠের থামমত। তাতে দড়ি বাঁধা। সামনেই একটা পাথরের আসনমত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দলপতি দু'জন বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এল। বৃদ্ধ দু'জন বোধহয় তার পরামর্শদাতা।

একজন সৈন্যের পাহারায় মারিয়াকে আনা হল। মারিয়ার পোশাক এখন এ দেশীয় মেয়েদের মত পা পর্যন্ত ঢাকা ঢোলা জামা। মারিয়াকে সৈন্যটি বন্দীশিবিরে ঢোকাল।

ফ্রান্সিসরা এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস মারিয়ার মুখ চোখ দেখেই বুঝল মারিয়া রাত্রে ঘুমোয় নি। ফ্রান্সিস বলল—তোমার শরীর ভালো তো? মারিয়া মাথা কাত করল।

তখনও ক্রীতদাসদের মঞ্চে তোলা হয়নি। শাঙ্কো চারদিকে নজর রেখে ঘুরতে লাগল। শাঙ্কোর পরনে সিক্কার সৈন্যদের পোশাক। কাজেই কেউ সন্দেহ করল না।

শাঙ্কো উত্তর দিকের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট চেস্টনাট গাছ দেখতে পেল। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি সেদিকে গেল। ঝোপজঙ্গল সরিয়ে এগিয়ে গেল। চেস্টনাট গাছটা দেখল। তারপর ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আরো এগোল। দেখলো ওখানে একটা খাদমত। খাদের পরেই সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকা। সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর পালানোর উপায় ভাবা হয়ে গেল। ও দ্রুত ছুটল সমুদ্রতীরের দিকে। ওদের জাহাজে এল। তখন শাঙ্কো মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে।

ফ্রেজার এগিয়ে এল। বলল—কী ব্যাপার শাঙ্কো?

—ফ্রান্সিসদের পালাবার উপায় বের করেছি। তুমি শিগগিরি আমাকে বেশ লম্বা মোটা কাছি দাও। ফ্রেজার ছুটে গেল ওদের কাঠ দড়ি কপিকল এসব রাখবার ঘরের দিকে।

কাছি নিয়ে ফ্রেজার একটু পরেই এল। শাঙ্কো কাছিটা কোমরে বুকে প্যাঁচালো। তারপর চলল বন্দী শিবিরের দিকে।

বন্দী শিবিরের সামনে পৌঁছে দূর থেকেই দেখল আটজন ডাকাত মূরকে সেই পাথরের বেদীতে তোলা হয়েছে। শাঙ্কো লক্ষ্য করল—মূরদের হাত পা বাঁধা হয় নি। শাঙ্কো অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—ও—হো-হো। তাহলে ফ্রান্সিসদেরও হাত পা বাঁধা হবে না।

শাঙ্কো একটু দূরে দূরে থেকে জঙ্গলটায় ঢুকল। চেস্টনাট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে কাছিটার একটা মুখ বাঁধল। তারপর বাকি কাছিটা খাদে ঝুলিয়ে দিল। তারপর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। দেখল অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

তখনই ফ্রান্সিসদের আনা হল। সঙ্গে মারিয়া। ফ্রান্সিসদের হাত পা বাঁধা নয়। খুশিতে শাঙ্কোর মন নেচে উঠল। ফ্রান্সিসদের পাথরের বেদী- পাশে দাঁড় করানো হল। ফ্রান্সিস তখন ভাবছে—এইভাবে ক্রীতদাসের জী- মেনে নেবে? কিন্তু ও তো নিরুপায়। সিক্কার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নাম। যেত। কিন্তু তাতে বেশ কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু মারা যেত। মারিয়াকে নিয়ে পালানো যেত না। ফ্রান্সিসের এই আশঙ্কার মধ্যেও ক্ষীণ আশা—শাঙ্কো মুক্ত আছে। ও যদি কোন উপায় বের

করে।

শাঙ্কো সিক্কার সৈন্যদের পোশাক পরে. বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ফ্রান্সিসদের পেছন দিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগল আর মৃদুস্বরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলে যেতে লাগল—উত্তরে জংলার কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বিরাট চেস্টনাট গাছ। গাছের গুঁড়িতে আমি কাছি বেঁধে রেখেছি। কাছি ধরে ঝুলে নিচে উপত্যকায় নেমে যাবে। তারপর সমুদ্রতীরের দিকে ছুটবে। জাহাজে উঠবে।

এবার রাজকুমারী মারিয়াকে দুতিনজন সৈন্য হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে লাগল—না-না। তবু সৈন্যরা জোর করে মারিয়াকে নিয়ে আসতে লাগল। তখন অতলোকের গুঞ্জন থেমে গেল। শুধু ফিস্‌ফাস শোনা যেতে লাগল—রাজকুমারী—রাজকুমারী।

মারিয়া শুধু একবার তাকিয়ে নিল ফ্রান্সিসের দিকে। তারপর আর বাধা দিল না। পাথরের বেদীতে উঠল। কোনদিকে তাকাল না। শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কাঠের থামের সঙ্গে মারিয়াকে দড়ি দিয়ে আলগা করে বাঁধা হল।

উপস্থিত খরিদ্দারদের মধ্যে দামাদামি শুরু হয়ে গেল।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—হাত দুটো পেছনে আনো। ফ্রান্সিস পেছনে হাত নিল। শাঙ্কো ওর বড় ছোরাটা ফ্রান্সিসের হাতে দিয়ে বলল—এবার কাজ হাসিল কর।

ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দলপতি সিক্কা যে পাথরের আসনে বসে আছে সেইদিকে। সিক্কার সৈন্যরা কিছু বোঝবার আগেই ফ্রান্সিস সিক্কার গলায় ছোরা চেপে ধরল। দাঁতচাপা স্বরে বলল—তোমার সৈন্যদের বলো এখান থেকে চলে যেতে।

ফ্রান্সিসের এই কাণ্ড দেখে লোকজন সব পালাতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। সিক্কার কিছু সৈন্য তখনও ছিল। ফ্রান্সিস ছোরার চাপ বাড়াল। দলপতি সিক্কা বলল—বলছি—বলছি। এবার সিক্কা গলা চড়িয়ে বলল—সৈন্যরা তোমরা এখান থেকে চলে যাও। সৈন্যরা আর কি করে। দলপতির প্রাণ বিপন্ন। এখান থেকে চলে যেতেই হবে। সৈন্যরা দলবেঁধে চলে গেল।

এবার ফ্রান্সিস বিস্কোকে বলল—বিস্কো রাজকুমারীকে তুমি নিয়ে যাও। তোমরা সকলে চলে যাও উত্তরের ঐ বিরাট চেস্টনাট গাছের কাছে। গাছটায় মোটা কাছি বাঁধা আছে। কাছি ধরে নেমে একটা উপত্যকা পাবে। সেটা ধরে সমুদ্রতীরে জাহাজে চলে যাও।

সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটল চেস্টনাট গাছটার দিকে। বিস্কো বেদীতে উঠল। মারিয়ার গায়ে বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল। তারপর মারিয়াকে পাথরের বেদী থেকে নামিয়ে আনল। শরীরে অসহ্য ক্লান্তি। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া মনে

জোর আনো। কাছি ধরে নিচে নামতে পারলেই আমাদের মুক্তি। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মারিয়া ফ্রান্সিসের কথা শুনে একবার থমকে দাঁড়াল তারপর হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে শরীর ছেড়ে দিয়ে ঘাসে-ঢাকা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে মারিয়াকে তুলে কাঁধে শুইয়ে নিল। বিস্কো যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে ছুটল চেস্টনাট গাছটার দিকে।

বিস্কো যখন কাছিটার কাছে এল ততক্ষণে বাকি বন্ধুরা কাছি ধরে ধরে নিচের উপত্যকায় নেমে গেছে। বিস্কো নিচু হয়ে কাছিটা ধরল। বলল—রাজকুমারী আমরা মুক্তির দোরগোড়ায়। যতটা সম্ভব জোরে আমাকে ধরে থাকুন। মারিয়া দুহাত বাড়িয়ে বিস্কোর কোমর ধরে রইল।

বিস্কো আস্তে আস্তে কাছি ধরে নামতে লাগল। একটু হাঁপানো গলায় মারিয়া বলল—ফ্রান্সিস শাঙ্কো ওরা তো এল না।

—ওদের জন্যে ভাববেন না। এখন শুধু একটাই সমস্যা—আপনাকে নিরাপদে জাহাজে নিয়ে যাওয়া। বিস্কো বলল।

বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে নিচের দিকে তাকাল। দেখল—আর হাত দশেক নামলেই উপত্যকায় নামা যাবে। বিস্কো হাঁপাতে হাঁপাতে উপত্যকায় নেমে এল।

ওদিকে ফ্রান্সিস তখনও দলপতি সিক্কার গলায় ছোরা চেপে আছে।

শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—এতক্ষণে মারিয়া আর বন্ধুরা উপত্যকায় নেমে গেছে। ওরা জায়গাটা চেনে না। এইজন্যে আমাকে এখুনি যেতে হবে। একটু থেমে বলল—ফ্রান্সিস চলো—তাড়াতাড়ি।

এবার ফ্রান্সিস দলপতি সিক্কার গলা থেকে ছোরাটা তুলে নিয়ে ছুটল চেস্টনাট গাছের দিকে। দু'জনে গাছটার নিচে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—শাঙ্কো তুমি আগে নেমে যাও। আমি পরে নামবো। কিন্তু তোমার হাত কাটাছেঁড়া। পারবে কাছি ধরে ধরে নামতে?

—আমি হাত দুটো বেশি কাজে লাগাবো না। দুই হাঁটু দিয়ে কাছি নিয়ে নেমে যাবো। আমার জন্যে ভেবো না।

—বেশ। নামো তবে। ফ্রান্সিস বলল। শাঙ্কো নামতে শুরু করল। একটু সময় নিয়ে শাঙ্কো উপত্যকায় নেমে গেল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ খোলা তরোয়াল হাতে আট দশ জন সৈন্য ছুটে আসছে।

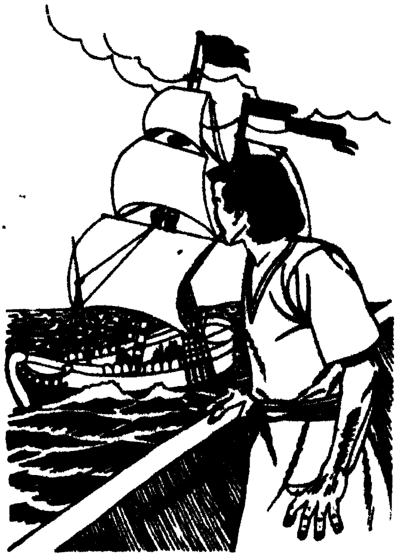
এবার ফ্রান্সিস কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। গাছের সঙ্গে বাঁধা কাছিটা পোঁচ দিয়ে দিয়ে অর্ধেকটা কাটল। তারপর সৈন্যরা এসে পৌঁছুবার আগেই কাছি ধরে ধরে ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল। দেখল শাঙ্কো পেছনে পেছনে অনেক দূর চলে গেছে।

ওদিকে দু'জন সৈন্য কাছি ধরে নেমে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস কাছি ধরে প্রাণপণে হাঁচ্‌কা টান দিতে লাগল। অর্ধেক কাটা কাছিটা ছিঁড়ে গেল। সৈন্য দু'জন

ছেঁড়া কাছির সঙ্গে ছিটকে পড়ল। নিচের উপত্যকার একটা পাথরের চাঙের ওপর দু'জনে পড়ল। দু'জনেই মারা গেল।

এবার ফ্রান্সিস ছুটল হ্যারি শাঙ্কোদের দলের দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস বন্ধুদের কাছে এসে পৌঁছল। সবাই ধ্বনি তুলল— ও-হো--হো।



ফ্রান্সিস বলল—কাছি ছিঁড়ে দিয়ে এসেছি। দু'জন সৈন্য কাছি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। কিন্তু ওরা হাল ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না। দলপতি সিক্কার সৈন্যরা জাহাজঘাটা পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে।

মারিয়া মুখ বুঁজে সব সহ্য করতে লাগল। ফ্রান্সিস মারিয়ার পাশে এল। ডান হাতে মারিয়াকে ধরে নিয়ে চলল।

ফ্রান্সিসরা যখন জাহাজ ঘাটায় [illegible] তখন দেখল দলপতি ডি সিক্কার [illegible] দশজন সৈন্য ছুটে আসছে। তাই দেখে ফ্রান্সিসের বন্ধুরা যারা জাহাজে ছিল তারা খোলা তরোয়াল হাতে জাহাজের পাটাতন দিয়ে নেমে এল। সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লড়াই শুরু হল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে গলা চড়িয়ে বলল—আমার দলের সবাই জাহাজে উঠে যাও। লড়াই করতে যেও না।

অল্পক্ষণের মধ্যেই দলপতি সিক্কার সৈন্যরা হার স্বীকার করল। আহতদের ফেলে রেখে বাকিরা পালিয়ে গেল।

বিজয়ী ভাইকিংরা আনন্দে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। সব ভাইকিংরাই গলায় গলা মেলাল—ও-হো-হো-।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ধরে ধরে কেবিনঘরে নিয়ে এল। বলল—আর কোন কথা নয়। এখন শুধু বিশ্রাম। ঘুম পেলে ঘুমিয়ে নাও। রাঁধুনি বন্ধু বলেছে রান্না সারতে দেরি হবে।

ওদিকে ডেক-এ তখন আড্ডা শুরু হয়েছে। শাঙ্কো হাত পা নেড়ে বাকি ঘটনাটা বলছে।

ভেন ওষুধের থলে নিয়ে এল। শাঙ্কোকে বলল—চুপ করো—জামাটামা খোল। শাঙ্কো গলা থামিয়ে জামাটামা খুলল। ভেন দেখল শাঙ্কোর হাত থেকে অল্প অল্প রক্ত পড়ছে। ভেন শাঙ্কোর ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। তারপর একটা ঝোলা

থেকে একটু ওষুধ আঙ্গুলে তুলে নিয়ে দু হাতের তেলোয় ঘষে ঘষে তিনটে বড়ি বানালো। শাঙ্কোকে বলল—দিনে একটা করে খাবে। এখন বকবকানি থামিয়ে নিজের কেবিনঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। চলল নিজের কেবিনের দিকে।

সেদিন শেষ রাতে সমুদ্রে ঘন কুয়াশা পড়েছে। মাস্তুলের মাথায় বসে নজরদার পেড্রো ঐ কুয়াশার আস্তরণের মধ্যে দিয়ে চারদিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। একঘেয়েমির জন্যেই বটে—পেড্রোর আবার একটু তন্দ্রা এসেছিল। কতক্ষণ পেড্রো তন্দ্রায় ঢুলছে জানে না। হঠাৎই সজাগ হয়ে দেখল কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দুটো ফেল্লুকা অর্থাৎ যুদ্ধ জাহাজ ওদের জাহাজের দুধার দিয়ে আসছে। পেড্রো ঘাবড়ে গেলেও ভয় পেল না। জলদস্যুদের জাহাজ নয়। দুটো জাহাজেই সবুজ নীল পতাকা উড়ছে। কিন্তু পেড্রো বুঝে উঠতে পারলো না ফেল্লুকা দুটোর উদ্দেশ্য কী। ওরা ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসছে না লড়াই করতে আসছে। পেড্রো চিৎকার করে বলল—ভাইসব-—সাবধান। ফ্রান্সিসকে বলো দুটো যুদ্ধ জাহাজ আমাদের জাহাজের দুপাশ দিয়ে চলেছে।

ডেক-এ শোয়া দুতিনজন ভাইকিং-এর ঘুম ভেঙে গেল পেড্রোর চিৎকারে। ওরা দেখল ওদের জাহাজকে মাঝখানে রেখে দুটো যুদ্ধ জাহাজ চলেছে একই গতিতে।

কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখল দুটো জাহাজেই গ্রীক সৈন্যদের মত বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণপরা কিছু সৈন্য দুটো জাহাজেরই ডেক-এ ঘোরা ফেরা করছে।

ওরা ছুটল ফ্রান্সিসকে খবর দিতে। একটু পরেই ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে ডেক-এ উঠে এল। রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। পেছনে আরো কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু। পাশের জাহাজ থেকে একজন সৈন্য গ্রীক ভাষায় জিজ্ঞেস করল—তোমরা কারা? হ্যারি থেমে থেমে গ্রীক ভাষাতেই বলল—আমরা ভাইকিং।

—তোমরা কোথায় যাচ্ছো? সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল।

—দেশে ফিরে যাচ্ছি। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের দলপতি আনগেভিন তোমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তোমরা জাহাজ থামাও। আমরাও জাহাজ থামাবো। সৈন্যটি বলল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে সব বুঝিয়ে বলল। ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেতে চাই। আমরা জাহাজ থামাবো না। হ্যারি বলল সে কথা। সৈন্যটি বলল—তোমরা যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করো তাহলে কামানের গোলা ছুঁড়ে তোমাদের জাহাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল কথাটা। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে একটুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল—বলো যে আমরা দলপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা জাহাজ থামাবো। হ্যারি সৈন্যটিকে বলল সে কথা।

সৈন্যটি বলল—তাহলে আমরাও জাহাজ থামাচ্ছি।

ফ্রান্সিস ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—পাল নামাও। জাহাজ থামাও। ভাইকিং বন্ধুরা পাল খাটানোর কাঠে উঠল। একে একে পালগুলো গুটিয়ে ফেলল। দাঁড়িদেরও দাঁড় টানা বন্ধ করতে বলা হল।

তিনটি জাহাজই দাঁড়িয়ে পড়ল।

তখন সকাল হয়েছে। যুদ্ধ জাহাজের সৈন্যদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা গেল। কিছু পরেই ওদের দলপতি আনগেভিন যুদ্ধ জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তার পরণে ধর্মযাজকদের পোশাক কালো জোব্বা। মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা। ফ্রান্সিসরা একটু অবাকই হল। ধর্মযাজক হয়েও আনগেভিন সৈন্য, যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে কোথায় চলেছে?

আনগেভিন দু'জন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। হ্যারি এগিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা কয়েকজন হ্যারির পেছনে পেছনে এল। হ্যারি গ্রীকভাষায় বলল—আমরা ভাইকিং। লড়াই নয় আমরা শান্তি চাই। আনগেভিন বলল—আমরা কিন্তু লড়াই চাই। তবে তোমাদের সঙ্গে নয়। তোমরা ভাইকিং। বীরের জাতি। এই যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য চাই। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল কথাগুলো। ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। কোন কারণেই কোন যুদ্ধের সঙ্গে আমরা জড়াবো না। আপনাদের সমস্যা আপনারাই মেটান। হ্যারি আনগেভিনকে বলল সে কথা।

আনগেভিন মাথা নেড়ে বলল—তা হবে না। তোমাদের আমার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তৃতীয় পিটারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কথাটা হ্যারির মুখে শুনে এবার ফ্রান্সিসের চিন্তা হল। এরপর ফ্রান্সিসের শেখানো মত হ্যারি বলতে লাগল।

হ্যারি বলল—দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের ঢাল নেই লোহার বর্ম নেই লোহার শিরস্ত্রান নেই। রাজা তৃতীয় পিটারের সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে আমরা লড়বো কী করে।

—তোমাদের ঢাল বর্ম শিরস্ত্রান সব দেওয়া হবে। আনগেভিন বলল।

—তা সত্ত্বেও যদি আমরা যুদ্ধ না করি। ফ্রান্সিস বলল।—তাহলে কামান দেগে তোমাদের জাহাজ ধ্বংস করা হবে। আনগেভিন বলল। ফ্রান্সিস চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস যুদ্ধ জাহাজ দুটো ভালো করে দেখল। দেখল দুটো জাহাজেই কামান বসানো আছে। ইচ্ছে করলেই আনগেভিন ওদের জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। ফ্রান্সিস বলল— আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে পরে আপনাকে জানাচ্ছি আমরা কী করবো।

—বেশ। আমি অপেক্ষা করছি। ততক্ষণ তোমাদের জাহাজও অপেক্ষা করবে। আমাদের জাহাজও দাঁড়িয়ে থাকবে। আনগেভিন বলল। তারপর দু'জন সৈন্যের সাহায্যে নিজেদের জাহাজে চলে গেল।

ফ্রান্সিস তখন হ্যারিকে বলল—সব বন্ধুকে ডেক-এ আসতে বলো। মারিয়াও যেন আসে।

সকালের খাওয়া সেরে সবাই ডেক-এ এসে জড়ো হল। ফ্রান্সিস বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে বলতে লাগল—ভাইসব—আমরা একটা গভীর সমস্যায় পড়েছি। কিছুক্ষণ আগে দুটো যুদ্ধ জাহাজের অধিকারী ও দলনেতা আনগেভিন আমাদের জাহাজে এসেছিল। সে ধর্মযাজকের পোশাক পরে অথচ যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু রক্তক্ষয় চায়। কেন বুঝলাম না। যাহোক কাছেই মালটা দ্বীপপুঞ্জ। সেখানকার রাজা এখন তৃতীয় পিটার। তাকে যুদ্ধে হারিয়ে মালটা অধিকার করাই আনগেভিনের উদ্দেশ্য। সে চায় তার দলের হয়ে আমরা লড়াই করি। ফ্রান্সিস থামল।

—তাদের হয়ে আমরা লড়াই করতে যাবো কেন? আমরা এখন দেশে ফিরে যাবো। বিস্কো বলল।

—বিস্কো—ফ্রান্সিস বলল—আমিও ঠিক এই কথাটাই আনগেভিনকে বলেছি। উত্তরে আনগেভিন বলেছে তাহলে সে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। সমস্যাটা এখানেই। দেখতেই পাচ্ছো ওদের যুদ্ধ জাহাজে কামান রয়েছে। কাজেই ওরা ইচ্ছে করলে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল—এবার ভাইসব তোমরাই স্থির কর কী করবে। সবাই চুপ করে রইল। এরকম একটা সমস্যায় ওদের পড়তে হবে এটা ওরা স্বপ্নেও ভাবে নি।

শাঙ্কো বলে উঠল—ভাইসব—এই সমস্যার সমাধান ফ্রান্সিস আর হ্যারির ওপর ছেড়ে দাও। ওরা দু'জনে যা বলবে তাই মেনে নাও। শাঙ্কো হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলল—হ্যারি তুমি কী বলো? হ্যারি একটু চুপ করে থেকে বলল—ভাইসব—খুবই গভীর সমস্যায় আমরা পড়েছি। আনগেভিনের দলে আমাদের যোগ না দিলে উপায় নেই। দু দুটো যুদ্ধ জাহাজের নজরদারি এড়িয়ে আমরা পালাতে পারবো না। পালাবার চেষ্টা করলেই জাহাজ সুদ্ধ সবাই আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। ওরা কামানের গোলা ছুঁড়ে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করবে। আমরা ভীষণ বিপদে পড়বো। হ্যারি থামল। ফ্রান্সিসকে বলল—ফ্রান্সিস তুমি কী বলো?

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—আমি তোমার সঙ্গে একমত। আমরা আনগেভিনের পক্ষেই যোগ দেব। এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। তবে এই লড়াই আমরা করবো আত্মরক্ষামূলক। কারণ এই লড়াই থেকে আমাদের কোন লাভ নেই। আনগেভিনের লক্ষ্য তৃতীয় পিটারকে পরাজিত করে মাল্টা দখল করা এবং রাজা হওয়া। এর জন্যে আমরা কেন প্রাণ দিতে যাবো। আমরা যতটা সম্ভব শরীর বাঁচিয়ে লড়াই করবো। ফ্রান্সিস থামল।

হ্যারি সব ভাইকিং বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল—তাহ'লে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবে তোমরা রাজি। সকলেই চুপ করে রইল। সবাই বুঝতে পারল এ ছাড়া উপায় নেই। দুদুটো যুদ্ধ জাহাজের পাহারা থেকে ওদের জাহাজ বের করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া

সম্ভব নয়। শুধু শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—আবার দেশে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—তা ঠিক—তবে দেশে ফিরে কী হবে। যা ঘটতে যাচ্ছে সেটাও একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমার চিন্তা শুধু একটাই—আমাদের কারো যেন প্রাণহানি না ঘটে।

সভা ভেঙে গেল।

বিকেলে ফ্রান্সিস হ্যারিকে নিয়ে আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজে গেল। আনগেভিনের কেবিনঘরে বসেই ওরা কথা বলল। ফ্রান্সিস নিজেদের সম্মতির কথা জানাল। আরো বলল—আপনারা জয়ী হলেই আমরা কিন্তু দেশের দিকে জাহাজ চালাবো।

—ঠিক আছে। আমাদের লক্ষ্য যুদ্ধে জয়লাভ করা। আনগেভিন বলল।

সন্ধ্যের পর থেকে আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ দুটি সামনে চলতে লাগল পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজ।

পরদিন সকালে আনগেভিনের দূত হিসেবে একজন লোক এল। হ্যারির সঙ্গে কথা বলল। হ্যারি ফ্রান্সিসকে বলল—আনগেভিন বলে পাঠিয়েছেন যে পঁচিশটি যুদ্ধাস্ত্র অর্থাৎ বর্ম ঢাল আর শিরস্ত্রান আমাদের দেবে। এর বেশি অস্ত্র ওদের মজুত নেই। আমাদের পঁচিশজনকে যেতে বলছে ওদের যুদ্ধ জাহাজে। যুদ্ধাস্ত্র আনতে।

—চলো। আমরা নিশ্চয়ই যাবো। এরকম যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া তৃতীয় পিটারের সশস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না। তখনই ভাইকিং বন্ধুদের ফ্রান্সিস হ্যারিকে দিয়ে ডেকে পাঠাল। সবাই এলে বন্ধুদের থেকে চব্বিশজনকে বেছে নিল। তারপর দলবেঁধে চলল আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজে। যাবার সময় ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—তুমি লড়াইতে নামবে না। তুমি মারিয়ার সঙ্গে থাকবে।

ফ্রান্সিস বিস্কো শাঙ্কোসহ পঁচিশজন বর্ম শিরস্ত্রান ঢাল হাতে নিজেদের জাহাজে ফিরে এল। এইসব যুদ্ধাস্ত্র পেয়ে সবাই খুশি। ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল— হ্যারি তুমি বলে এসো যে আমাদের যে সব বন্ধুরা যুদ্ধাস্ত্র পেল না তারা লড়াই করবে না। হ্যারি সে কথা আনগেভিনকে গিয়ে বলে এল। আনগেভিন বলল—যুদ্ধ না করুক কিন্তু যুদ্ধরত সৈন্যদের সাহায্য করতে হবে। হ্যারি তাতে সম্মত হল। ফ্রান্সিসকে এসে বললও সে কথা। ফ্রান্সিস বলল— ঠিক আছে।

পরদিন দুপুর নাগাদ নজরদার পেড্রো মাস্তুলের ওপরে ওর বসার জায়গা থেকে চেঁচিয়ে বলল— ডাঙা দেখা যাচ্ছে— ডাঙা।

একটু পরেই আনগেভিন হ্যারিকে ডেকে পাঠাল। হ্যারি এলে বলল — আমরা মাল্টায় এসে গেছি। আমরা মাল্টার উত্তর দিকে নামবো। এখানেই আছে সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ। সেই দুর্গ আমরা পিটারের সৈন্যদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে দখল করবো। তোমার বন্ধুদের সৈন্যদের যুদ্ধের জন্যে—তৈরি হতে বলো। তৈরি হয়ে তারা যেন আমাদের দুই জাহাজে চলে আসে। তোমাদের জাহাজ তো যুদ্ধ জাহাজ

নয়। তোমাদের জাহাজ একটু দূরে থাকবে। হ্যারি জাহাজে ফিরে এসে সব ফ্রান্সিসকে বলল।

মাল্টার তীরভূমি দেখা গেল। তিনটি জাহাজই তীরভূমির কাছে এল। দেখা গেল তীরভূমিতে পাথরের চাঁই নেই। প্রায় সমতল পাথুরে রাস্তামত ঢালু হয়ে সমুদ্রে নেমে এসেছে। এতে সৈন্যদের চলাফেরার সুবিধেই হবে। যুদ্ধ জাহাজ থেকে তীর পর্যন্ত কাঠের পাটাতন পাতা হল।

আনগেভিনের নেতৃত্বে তার সৈন্যরা আর ফ্রান্সিসরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে পাতা কাঠের পাটাতন দিয়ে হেঁটে নেমে এল। পাথুরে রাস্তামত ঢালু জায়গা দিয়ে সকলেই উঠতে লাগল। রাজা তৃতীয় পিটারের কোন সৈন্যের দেখা পাওয়া গেল না। খুশিতে আনগেভিনের সৈন্যরা তরোয়াল বর্শা উঁচিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধে নামতে হবে। অথচ দেখা গেল সমুদ্র তীরে রাজা পিটারের একটা সৈন্যও নেই।

ফ্রান্সিস একটু অবাকই হল যখন দেখল বিনা বাধায় ওরা এগিয়ে চলল। কিছুটা এগোতেই এবার একটা বড় দুর্গ দেখা গেল। পাথরের দুর্গটার চারপাশ ঘিরে পাথুরে দেয়াল। আনগেভিন তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল—সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ আমরা জয় করবো। সব সৈন্যরা হৈ হৈ করে উঠল। শূন্যে তরোয়াল ঘোরাল। বর্শা ওঠাতে নামাতে লাগল।

সামনে একটু উৎরাইমত। সেটা পার হতেই দেখা গেল রাজা পিটারের সৈন্যরা দুর্গ-ঘেরা পাথুরে প্রাচীরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

আনগেভিনের নেতৃত্বে সৈন্যদল এগিয়ে চলল দুর্গের দিকে। মাত্র হাত পঞ্চাশেক দূরে থাকতেই আনগেভিন চিৎকার করে হুকুম দিল — আক্রমণ করো। তার সৈন্যরা শূন্যে তরোয়াল ঘোরাতে ঘোরাতে অন্যদল বর্শা উঁচিয়ে দ্রুত ছুটে গিয়ে দুর্গরক্ষী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসরাও তাদের পেছনে পেছনে ছুটে গেল। দুর্গের চারপাশ ভরে উঠল যুদ্ধরত সৈন্যদের অস্ত্রের ঝনঝনা রণহুংকার আর উৎসাহের ধ্বনিতে। তারপরই শোনা গেল আহতদের আর্ত চিৎকার।

লড়াই চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল রাজা পিটারের সৈন্যদের সংখ্যা কমে গেছে। যারা তবু লড়াই করছিল তারা পিছু হটতে হটতে দুর্গের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। আনগেভিনের সৈন্যদের হাতে দুর্গ পতনের মুখে। তীব্র লড়াই চলল। রাজা পিটারের সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগল। এতে আনগেভিনের সৈন্যদের ও যুদ্ধরত ভাইকিংদের উৎসাহ দ্বিগুণ হল। রাজা পিটারের সৈন্যদের বন্দী করা হতে লাগল। এবার দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেয়া সৈন্যদের বন্দী করার জন্যে আনগেভিনের সৈন্যরা জলস্রোতের মত দুর্গটায় ঢুকতে লাগল। দুর্গের মধ্যেও বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলল। তারপর পরাজিত রাজা পিটারের সৈন্যদের বন্দী করা হল। রাখা হল দুর্গের কয়েদঘরে।

যুদ্ধ শেষ। এবার ফ্রান্সিস ওর বন্ধুদের খুঁজে খুঁজে বের করে দুর্গের একটি ঘরে নিয়ে এল। সবাই যুদ্ধ ক্লান্ত। অনেকেই শুকনো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের বিশ্রাম নেই। বন্ধুদের গুণে গুণে দেখল— তিনজন এখনো আসেনি। তারা যুদ্ধে মারা গেছে কিনা আহত হয়েছে সেই খোঁজে ফ্রান্সিস দুর্গের বাইরে এল।



নিহত আহত সৈন্যদের মধ্যে ফ্রান্সিস বন্ধুদের খুঁজতে লাগল। অনেক নিহত আহত সৈন্যদের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে এক আহত বন্ধুকে পেল। আহত বন্ধুটাকে তুলে দাঁড় করাল। দেখল বন্ধুটির পিঠে তরোয়ালের কোপ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সিস ওকে বলল— তুমি একটু অপেক্ষা কর। আরো দু'জন বন্ধুর খোঁজ পাচ্ছি না। ওদের কী হয়েছে দেখি. তুমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। আমিই তোমাকে দুর্গে নিয়ে যাবো। জাহাজ থেকে বৈদ্য ভেনকে এনে তোমার চিকিৎসা করাব। এই বলে আহত বন্ধুটিকে ওখানে বসিয়ে রেখে ফ্রান্সিস আর দু'জন বন্ধুকে খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের যায়গায় ঘুরে ঘুরে ফ্রান্সিস দুই বন্ধুকে পেল। কিন্তু জীবিত বা আহত নয়। যুদ্ধে দু'জনই মারা গেছে।

ফ্রান্সিসের গভীর দুঃখে চোখে জল এল। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে বন্ধু দু'জন মারা গেল। দেশে ফিরে তাদের বাবা মাকে অনেক কষ্টে শান্ত করতে হবে। ফ্রান্সিস ভাবল যুদ্ধে নামলে মৃত্যু হতেই পারে। এই নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। বরং এখন কী কী কাজ করতে হবে সেটাই ভেবে নিল।

ফ্রান্সিস আহত বন্ধুটির কাছে ফিরে এল। ওকে তুলে ধরে আস্তে আস্তে দুর্গের দিকে নিয়ে চলল। বন্ধুটির পিঠ থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বেশ কষ্ট করেই বন্ধুটিকে ফ্রান্সিস দুর্গে নিয়ে এল। ওরা যে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঘরেই আহত বন্ধুটিকে রাখল। তারপর বিস্কোকে বলল— জাহাজ থেকে ভেন হ্যারি আর মারিয়াকে এখানে নিয়ে এসো। বিস্কো চলে গেল।

ফ্রান্সিস এবার বন্ধুদের বলল—আমাদের দুই বন্ধু যুদ্ধে মারা গেছে। কথাটা শুনে সব ভাইকিংরা নিজেদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ করল। মাথা নিচু করে সবাই মৃত বন্ধু দু'জনের স্মৃতির প্রতি ভালোবাসা জানাল।

দুর্গের ডানদিকে একটু দূরে কবরখানা। বিকেলে আনগেভিন সেখানে এল। যে

সব সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে তাদের কবর দেওয়া হল। ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি অন্য কিছু বন্ধু তাদের মৃত দুই বন্ধুর দেহও কবর দিল।

সন্ধ্যে নামতেই সবাই দুর্গে ফিরে এল। ওদের ঘরেই ফ্রান্সিসরা এল। দেখল— বৈদ্য ভেন-এর ওষুধে আহত বন্ধুটি এখন অনেকটা ভালো হয়েছে।

একটু রাত হতে ফ্রান্সিস হ্যারিকে বলল—হ্যারি আনগেভিনের নির্দেশ তো আমরা মেনেছি। যুদ্ধ করেছি। আনগেভিনকে সে কথা বলতে হবে— চলো।

বলবো যে যুদ্ধে জয়ও হয়েছে। এবার আমরা দেশের দিকে যাবো। সৈন্যদের জিজ্ঞেস করে দুর্গের সবচেয়ে ভালো ঘরটায় এল। দেখল—আনগেভিন কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে পাখির পালকে তৈরি বিছানায় বসে আছে। যুদ্ধজয়ের আনন্দে আনগেভিন মশগুল।

হ্যারি বলল—আনগেভিন—আপনি যুদ্ধে আমাদের সাহায্য চেয়েছিলেন। আমরা লড়াইতে অংশ নিয়েছি। আপনি সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ জয় করেছেন।

—হ্যাঁ—তোমাদের সাহায্য আমাদের খুব কাজে লেগেছে। তোমাদের লড়াই করা তো দেখলাম। সত্যিই তোমরা দুঃসাহসী যোদ্ধা। আনগেভিন বলল।

হ্যারি বলল— যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য করেছি। এবার আমরা আমাদের দেশের দিকে জাহাজ চালাতে চাই।

—— না— আনগেভিন বলল— এখনও আমরা রাজধানী ভ্যালেত্তা জয় করতে পারি নি। ভ্যালেত্তা জয় করা পর্যন্ত তোমাদের সাহায্য চাই।

— কিন্তু এসব তো আপনাদের দেশের ব্যাপার—আপনাদের দেশের সমস্যা। এসবের সঙ্গে আমাদের জড়াচ্ছেন কেন। এই যুদ্ধেই আমরা দুই বন্ধুকে হারিয়েছি। হ্যারি বলল।

— ও সব বুঝি না— ভ্যালেত্তা দখলের লড়াইয়ে তোমাদেরও থাকতে হবে। আমরা ভ্যালেত্তা জয় করবো। আমি মাল্টার রাজা হব। তখন তোমরা ছাড়া পাবে তার আগে নয়।

আনগেভিন বলল।

হ্যারি সবকথা ফ্রান্সিসকে বলল। ফ্রান্সিস বলল— এখন আনগেভিনের কথা মানতেই হবে সময় সুযোগ বুঝে পালাবো আমরা। ফ্রান্সিস ওদের ভাষায় বললে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দুর্গের ঘরের দিকে এলো। সবাই এগিয়ে এল কী হবে এখন জানতে। ফ্রান্সিস বলল, ভাইসব— আনগেভিন এখনই আমাদের মুক্তি দিতে রাজি নয়। রাজধানী ভ্যালেত্তা দখল না হওয়া পর্যন্ত আনগেভিনের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে। লড়াইও করতে হবে।

— আমরা লড়াই করবো না— আমরা দেশে ফিরে যাবো। শাঙ্কো বলল। কিছু ভাইকিং বন্ধু সেটা সমর্থনও করল। ফ্রান্সিস বলল— শাঙ্কো আনগেভিনকে এসব কথা আমরা বলেছি। কিন্তু আনগেভিন আমাদের চলে যেতে দেবে না। ও কোন

কথাই শুনতে রাজি নয়।

— আমরা তো এখন বন্দী নই। গভীর রাতে জাহাজ নিয়ে পালাতে পারি। ফ্রেজার বলল। ফ্রান্সিস বলল— ফ্রেজার—এখন যুদ্ধ চলছে। আনগেভিনের সৈন্যরা রাত জেগে ওদের যুদ্ধ জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। আমরা জাহাজে চড়ে পালাতে গেলে ওরা কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। আমরা তাহলে অনেকেই মারা যাবো। যারা বেঁচে থাকবে তারাও দেশে ফিরে যেতে পারবে না। একটু থেমে ফ্রান্সিস বলতে লাগল— আমরা আমাদের অটুট জাহাজ নিয়ে পালাবো ঠিকই তবে সেটা সময় ও সুযোগ বুঝে।

বিকেলের দিকে ফ্রান্সিসরা খবর পেল যে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আনগেভিন তার সৈন্যদল নিয়ে স্থলপথে রাজধানী ভ্যালেত্তা আক্রমণ করবে। সৈন্যদলের সঙ্গে ফ্রান্সিসদেরও যেতে হবে।

সেদিন গভীর রাতে দূরে কামানের গোলার শব্দে ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস হ্যারি শাঙ্কোদের ডাকল। আস্তে আস্তে সবারই ঘুম ভেঙে গেল। ফ্রান্সিস বলল— মনে হচ্ছে রাজা পিটারের সৈন্যরা জলপথে লড়াই করতে এসেছে।

ততক্ষণে দুর্গে সাজো সাজো রব পড়ে গেছে। সব সৈন্যরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। দু'তিনজন সৈন্য আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে— রাজা পিটারের সৈন্যরা তিনটি যুদ্ধজাহাজে এসে আনগেভিনের জাহাজ আক্রমণ করেছে।

ফ্রান্সিস বলল— শাঙ্কো তৈরি হও। কামানের গোলা ছুঁড়ে দু'পক্ষই যুদ্ধ করবে। মাঝখান থেকে আমাদের জাহাজটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ঐ জাহাজই আমাদের একমাত্র ভরসা। চলো— আমাদের জাহাজটা বাঁচাতে হবে।

শাঙ্কোকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস ঘরের বাইরে এল। দেখল তখন আনগেভিনের সৈন্যরাও ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছে। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো অন্ধকারে উত্তর মুখো দিক ঠিক রেখে চলল। ওদিকেই সমুদ্রতীরে আনগেভিন আর ওদের জাহাজ রয়েছে।

অন্ধকার সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল ওরা। দেখল—আনগেভিনের গোলন্দাজ বাহিনীও ওদের যুদ্ধ জাহাজ থেকে কামানের গোলা ছুঁড়ছে।

ফ্রান্সিস এবার ছুটতে শুরু ক'রে বলল— শাঙ্কো তাড়াতাড়ি চলো। আমাদের জাহাজটা কামাদের গোলার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। দু'জনেই ছুটতে লাগল।

সমুদ্রতীরে লাগানো কাঠের পাটাতন দিয়ে দু'জনে ওদের জাহাজে উঠে এল। ফ্রান্সিস ছুটে গেল নোঙরের দড়িটার দিকে। দু'জনে নোঙরের দড়িটা টেনে নোঙর তুলে ফেলল। তারপর একটা লম্বা কাছি নিচের কেবিনঘর থেকে শাঙ্কো নিয়ে এল ফ্রান্সিসের নির্দেশে। কাছিটার মাঝামাঝি জায়গাটা জাহাজের মাথায় বাঁধল। ফ্রান্সিস বলল— কাছির মাথাটা কোমরে বাঁধ। এই বলে নিজেও কাছিটা কোমরে বাঁধল। তারপর জাহাজের মাথার কাছ থেকে দু'জনে জলে ঝাঁপ দিল। মারিয়া অন্য

ভাইকিং বন্ধুরা জাহাজের রেলিং ধরে দেখতে লাগল— কী করে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজটা টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

দু'জনে প্রাণপণে কাছি টেনে নিয়ে সাঁতরাতে লাগল। তখনই ফ্রান্সিস দেখল অন্ধকার আকাশে আলো ছড়িয়ে দুপক্ষের জাহাজ থেকেই কামানের গোলা ছুটে আসছে। কাছিতে টান পড়ায় ফ্রান্সিসদের জাহাজটা একটু নড়ল। ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সমান টান রাখলো। জাহাজটার মুখ আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। ফ্রান্সিস চেঁচিয়ে ধ্বনি দিল—ও—হো—হো। শাঙ্কোও ধ্বনি দিল ও—হো—হো। জাহাজ থেকে বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল। এবার ফ্রান্সিসদের জাহাজ আনগেভিনের যুদ্ধ জাহাজ দু'টি থেকে অনেকটা সরে এল। তখনই একটা কামানের গোলা এসে পড়ল আনগেভিনের একটা যুদ্ধজাহাজের পেছন দিকে। পেছনের হালের কাছে আগুন ধরে গেল। ফ্রান্সিসদের জাহাজ তখন বেশ দূরে চলে এসেছে। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে ঐ আগুন ফ্রান্সিসদের জাহাজেও ছড়িয়ে পড়ত। ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো জাহাজটা আরো দূরে টেনে নিয়ে চলল। ফ্রান্সিস দেখল— আনগেভিনের সৈন্যরা দড়ি বাঁধা কাঠের পাত্রে সমুদ্র থেকে জল তুলে তুলে আগুন নেভাচ্ছে। তখনও আগুন বেশি ছড়ায় নি। জল ঢালারও বিরাম নেই। ফ্রান্সিস বুঝল— আগুন নিভে যাবে। অবশ্য জাহাজের হালের জায়গায় অনেকটাই পুড়ে গেছে।

ওদিকে রাজা পিটারের একটা জাহাজে কামানের গোলায় আগুন লেগে গেছে। রাজা পিটারের সৈন্যরা অনেক চেষ্টা করেও আগুন আয়ত্তে আনতে পারল না। জাহাজটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বোধহয় অস্ত্র-ঘরে মজুত কামানের গোলায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কামানের গোলাগুলো দুম্ দাম্ ফাটতে লাগল। আকাশে অনেক উঁচুতে আগুনের ফুল্‌কি উড়ল। আরো কয়েকটা গোলা ফাটল। সৈন্যরা জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনে পোড়া জাহাজটার বাকি অংশ জলে ডুবে গেল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো ওদের জাহাজটা অনেক দূরে টেনে এনেছে তখন। ওদিকে কামান দাগা শেষ হ'ল। ডেক-এ উঠে দু'জনেই শুয়ে পড়ল। দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। মারিয়া আর অন্য বন্ধুরা ছুটে এল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে মারিয়াকে বলল—একটু বিশ্রাম পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফ্রান্সিস নিজের কেবিনঘরে ঢুকল। ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল। শাঙ্কো নিজের কেবিনঘরে এল। দু'জনেই একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল। তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। মারিয়া আর ঘুমলো না। ফ্রান্সিসের শিয়রে বসে রইল।

সকাল হতেই রাজা পিটারের সৈন্যরা তাদের দু'টো জাহাজ থেকে নেমে আসতে লাগল। তাদের একটা জাহাজ তো গতরাতে পুড়ে গেছে। তাদের সেনাপতি মান্দোর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী চলল সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গ অধিকার করতে। কিছু সৈন্য



চলল— আনগেভিনের একটি যুদ্ধ জাহাজ দখল করতে।

ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ডেক-এ উঠে এল। দেখল— যুদ্ধ শুরু হতে দেরি নেই। শাঙ্কো উঠে এল। ফ্রান্সিস বলল— চলো— টেনে জাহাজটাকে ডাঙার কাছে নিয়ে যাই।

দু'জনেই দাঁড়ঘরে নেমে এল। দাঁড় বাইতে লাগল। একটু পরেই জাহাজটা তীরভূমির খুব কাছে এল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো কাঠের পাটাতন পেতে জাহাজ থেকে মাটিতে নেমে এল। তারপরই ছুটল দুর্গের দিকে।

ততক্ষণে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আনগেভিনের সৈন্যরা দুর্গের সামনের ময়দানে যুদ্ধ করছে রাজা পিটারের সৈন্যদলের সঙ্গে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি চিৎকার, আহতের আর্তনাদে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো সমুদ্রতীর থেকে দুর্গের কাছে এল। দুর্গের পেছন ফিরে ঘুরে এসে ওরা আনগেভিনের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিল।

যুদ্ধ চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস বুঝল—রাজা পিটারের এই সেনাবাহিনী দুর্ধর্ষ। ওরা যুদ্ধে নিপুণ।

ঘণ্টাখানেকের মধোই দেখা গেল আনগেভিনের সেনাবাহিনী দুর্গের দিকে পিছু হটছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আহত। মারাও গেছে অনেক। রাজা পিটারের সৈন্যরা সমান চাপ রেখে লড়াই চালাতে লাগল।

হারের মুখে এসে দাঁড়াল আনগেভিনের সৈন্যদল। ওরা রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল। অনেকেই পিছিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিতে লাগল।

এক সময় লড়াই করতে করতে বিস্কো ফ্রান্সিসদের পাশে এল। তলোয়ার চালাতে চালাতেই বলল—ফ্রান্সিস, দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে আনগেভিন পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সমুদ্রতীরে পৌঁছবার আগেই আনগেভিন ধরা পড়েছে। এখন সে সেনাপতি মান্দোর হাতে বন্দী। কথাটা শুনেই ফ্রান্সিস তরোয়াল চালানো বন্ধ করল। চিৎকার করে বলল—বন্ধুরা-ভাইসব—অস্ত্রত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রের একপাশে দু' হাত তুলে দাঁড়াও। এখন আমাদের লড়াই করা অর্থহীন। আমরা বন্দীত্ব মেনে নেব।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে তরোয়াল মাটিতে ফেলে দিল। বর্ম শিরস্ত্রানও মাটিতে ফেলে দিল। তারপর ফ্রান্সিসের নির্দেশে দু'হাত ওপরে তুলে রণক্ষেত্র থেকে সরে এল।

পিটারের সৈনারা তুমুল চিৎকার ধ্বনি তুলে দুর্গের দিকে ছুটে গেল। দলে দলে সৈন্যরা দুর্গটায় ঢুকতে লাগল। আনগেভিনের সৈন্যদের বন্দী করতে লাগল।

যুদ্ধ শেষ। আনগেভিনের যে সৈন্যরা দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও হার স্বীকার করল।

ফ্রান্সিসদেরও রাজা পিটারের সৈন্যরা বন্দী করল। ওদের নিয়ে চলল দুর্গের মধ্যে। ওদের হাত বেঁধে দুর্গের চত্বরে বসিয়ে রাখা হল। ওদিকে আনগেভিনের সৈন্যদের দুর্গের ঘরে ঘরে ঢুকে মান্দোর সৈন্যরা বন্দী করতে লাগল।

এভাবে বসে থাকাটা ফ্রান্সিসের কাছে অপমানজনক মনে হল। ও হ্যারিকে বলল—রাজা পিটারের সেনাপতিকে গিয়ে বলো যে আমরা ভাইকিং। আনগেভিন আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তার দলের সঙ্গে আমাদেরও যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। হ্যারি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সেনাপতি মান্দোর একজন সৈনিককে বলল—আমরা সেনাপতির সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সেনাপতি মান্দো এখন বিশ্রাম করছেন। সৈন্যটি বলল।

—ঠিক আছে। তুমি মান্দোকে গিয়ে বলো আমরা ভাইকিং। আমরা এখানকার লোক নই। বিশেষ প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। হ্যারি বলল।

—বেশ-বলে দেখছি। সৈন্যটি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সৈন্যটি ফিরে এল। বলল—তোমরাইতো ভাইকিং?

— হ্যাঁ — হ্যারি বলল।

— সেনাপতি তোমাদের দেখা করার অনুমতি দিয়েছেন। সৈন্যটি বলল। ফ্রান্সিস আর হ্যারি উঠে দাঁড়াল। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সৈন্যটার পেছনে পেছনে চলল! যেতে যেতে দেখল— যুদ্ধ শেষ। আহত সৈন্যরা গোঙাচ্ছে। আর্তনাদ করছে। আনগেভিনের জীবিত সব সৈন্যই বন্দী হয়েছে। দুর্গের চত্বরে সারি দিয়ে বসে আছে।

দুর্গের সবচেয়ে ভালো ঘরটাতে পালকের বিছানায় সেনাপতি মান্দো বসে আছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি মান্দোর সামনে এসে দাঁড়াল। মান্দো বলল— শুনলাম তোমরা ভাইকিং— বিদেশি। আনগেভিনের সৈন্যদের হয়ে তোমরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলে কেন?

— নিরুপায় হয়েই আমাদের যুদ্ধে অংশ নিতে হয়েছে। আনগেভিন আমাদের বন্দী করেছিল আমাদের জাহাজ আটক করেছিল। আমাদের ভয় দেখিয়েছিল যে তার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরা যদি রাজা পিটারের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি তাহলে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ধ্বংস করে দেবে। আমাদের জীবন বাঁচাতে জাহাজ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছি, তা নইলে এই যুদ্ধে আমাদের কী লাভ? আমরা যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই। হ্যারি বলল।

—বুঝলাম—মান্দো বলল—কিন্তু উপায় নেই। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছো কাজেই তোমাদের বন্দী হয়েই থাকতে হবে। কাল সকালে রাজা পিটার এখানে আসবেন। তিনি তোমাদের ব্যাপারে যা করতে চান করবেন। আমি কিছু করতে পারবো না।

—বেশ। তাহলে তো আমাদের আনগেভিনের সৈন্যদের মতই বন্দী হয়ে

থাকতে হবে। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। কাল আনগেভিনের বিচার হবে। সঙ্গে তোমাদেরও বিচার হবে। রাজা তৃতীয় পিটার যা বিচার করবেন তাই হবে। মান্দো বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের জায়গায় ফিরে এল। হ্যারির বন্ধুদের জানাল সেনাপতি মান্দোর সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে। সবাই বুঝল রাজা পিটার এখন যা বলবেন তাই হবে।

রাত হল। বন্দীদের খেতে দেওয়া হল। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সবাইকে খেতে হল।

খাওয়া দাওয়ার পর ফ্রান্সিস মাথার পেছনে দুহাত রেখে পাথুরে চত্বরে শুয়ে পড়ল। হ্যারিও আধশোয়া হল। ফ্রান্সিস একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল যে মারিয়া জাহাজেই আছে। এই বন্দী দশা মারিয়া সহ্য করতে পারতো না।

ফ্রান্সিস খোলা আকাশের দিকে তাকাল। ভাঙা চাঁদ। জ্যোৎস্না অনুজ্জ্বল। তারা জ্বলছে। ফ্রান্সিসের ভাবনার শেষ নেই। রাজা পিটার ওদের নিয়ে কী করবেন কে জানে। যদি যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অপরাধে ওদের কয়েদখানায় বন্দী করে রাখে তাহলে বিপদ। জাহাজে মারিয়া রয়েছে—যে বন্ধুরা অস্ত্রশস্ত্র পায় নি বলে যুদ্ধে যোগ দেয় নি তারা রয়েছে। ফ্রান্সিসরা বন্দী হলে ওরা দিশেহারা হবে—যে ভাবে হোক সবারই মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিসের দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

শেষরাতে একটা শির্ শির্ ঠাণ্ডা হাওয়ায় ফ্রান্সিসের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ শীত শীত করতে লাগল।

আর ঘুম আসছে না। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ফ্রান্সিসের বাড়ির কথা মনে হল। কোথায় সাদা ধপ্‌ধপে পালক—নরম বিছানা বালিশ সাজানো ঘর। জানালায় হালকা নীল পর্দা আর কোথায় এই দুর্গের পাথুরে চত্বর। পিঠের হাড়ে ব্যথা হ'য়ে গেছে। মাথার পেছনেও ব্যথা। বাকি রাতটুকু ফ্রান্সিসের আর ঘুম এল না।

সকালে দুর্গে মান্দোর সৈন্যদের মধ্যে সাজো সাজো রব। রাজা পিটারের শৌখিন জাহাজ নাকি আসতে দেখা গেছে। সৈন্যরা সব দুর্গের বিরাট কাঠের সদর দরজার সামনে সার বেঁধে দাঁড়াল। এক সারি সৈন্যের হাতে বর্শা। পেতলের বর্শায় সূর্যের আলো পড়ে ঝলকাচ্ছে।

একটু বেলায় রাজা পিটার একটা সাদা ঘোড়ায় চেপে এলেন। ঘোড়ার গায়ে মাথায় নানা রঙের সাজ। রাজা পিটারের মাথায় মুকুট নেই। পোশাক লাল রঙের জোব্বামত। তাতে সোনা রূপোর সুতোর কাজ করা। রাজা পিটারের বয়েস বেশি নয়। মুখে গোঁফ থুতনিতে অল্প দাড়ি।

রাজা পিটারের পেছনে পেছনে এল রাজার দেহরক্ষীর দল। তাদের পরণে

বিচিত্র রঙদার পোশাক।

রাজা পিটারকে দেখে সৈন্যরা জয়ধ্বনি করল। রাজা সদর দেউড়ি দিয়ে সৈন্যদের মাথা নিচু করে অভিবাদন নিতে নিতে দুর্গে ঢুকে গেলেন। সেই পালকের বিছানা পাতা ঘরে গিয়ে রাজা বসলেন।

একটু পরেই হাত বাঁধা অবস্থায় আনগেভিনকে রাজার কাছে আনা হল। রাজা আনগেভিনকে বললেন—বেশ তো সিসিলিতে ধর্মকর্ম নিয়ে ছিলেন। হঠাৎ মাল্টার রাজা হবার শখ হল কেন?

—আপনার শাসনে সিসিলি জেনোয়ার যে সব লোক এখানে আছে তারা ক্ষুব্ধ। তারাই আপনাকে হারিয়ে মাল্টার রাজা হতে আমাদের ডেকে এনেছে। আনগেভিন বলল।

—এখন রাজা হওয়ার বদলে কয়েদঘরে পচতে হবে। রাজা হেসে বললেন। জেনে রাখুন—মাল্টার উচ্চবংশীয় মানুষেরা কিন্তু আমার বশ্যতা স্বীকার করেছে। তারা চায় আমিই যেন রাজা থাকি আর মাল্টাবাসীদের কল্যাণ করি। একটু থেমে রাজা বললেন এই আনগেভিনকে কয়েদঘরে আটক কর। তার আগে ওর পিঠে কুড়িবার চাবুক মারবে।

আনগেভিনকে নিয়ে সৈন্যরা চলে গেল।

অন্য সৈন্যদের সম্বন্ধে রাজা পিটার আদেশ দিলেন—এখানকার কয়েদঘরে যতজন আঁটে ততজনকে বন্দী করে রাখো। বাকিদের আনজুতে নিয়ে যাও। ওখানকার কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে।

রাজার, বিচার শেষ হল। তখন সেনাপতি মান্দো এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল—একদল বিদেশি আনগেভিনের হ'য়ে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। তাদের কী করা হবে।

—তাদের কাউকে নিয়ে এসো। সব শুনি আগে। রাজা বললেন। মান্দো একজন সৈন্যকে পাঠালো ফ্রান্সিসদের ডেকে আনতে।

কিছুক্ষণ পরে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস এল। দু'জনেই মাথা একটু নুইয়ে নিয়ে শ্রদ্ধা জানাল। রাজা পিটার বললেন—শুনলাম তোমরা ভাইকিং। আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো। হ্যারি বলল—আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি।

—কেন? রাজা পিটার বললেন।

—কারণ আনগেভিনের সৈন্যরা কিছুদিন আগে গভীর রাতে আমাদের জাহাজ দখল করেছিল। আনগেভিন সেন্ট অ্যাঞ্জেলো মানে এই দুর্গ অধিকার করতে আসছিল। আমাদের বলল তার সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই দুর্গ অধিকার করতে আমরা যেন সাহায্য করি। হ্যারি বলল।

—তোমরা অস্বীকার করলেই পারতে। রাজা পিটার বললেন।

—আমরা সে কথা বলেছিলাম। হ্যারি বলল।

—আনগেভিন কী বলল। রাজা পিটার জানতে চাইলেন।

—আনগেভিন বলেছিল মানে আমাদের ভয় দেখিয়েছিল—আমরা যুদ্ধে যোগ না দিলে সে কামান দেগে আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দেবে। হ্যারি বলল।

—সেই ভয়েই তোমরা আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে এসে যুদ্ধ করেছিলে।

—এবার বলো তো তোমরা এই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এসেছ কেন? রাজা পিটার বললেন।

—এ কথার উত্তর আমার বন্ধু ফ্রান্সিস স্পেনীয় ভাষায় দেবে। আবার বন্ধুটি গ্রীক ভাষা জানে না। এই বলে হ্যারি ফ্রান্সিসকে দেখাল। রাজা পিটার এবার স্পেনীয় ভাষায় ফ্রান্সিসকে বললেন—বলো—তোমার কী বলার আছে। ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আমরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাছাড়া কোথাও কোনরকম গুপ্তধন গুপ্ত ঐশ্বর্যের সংবাদ পেলে আমরা তা উদ্ধার করি। সেইজন্যেই এই অঞ্চলে আসা।

—এরকম গুপ্তধন উদ্ধার করতে পেরেছো? রাজা পিটার বললেন। হ্যা বললেন—অনেক ধন-সম্পদ আমার এই বন্ধু উদ্ধার করেছে।

—গুপ্তধন উদ্ধার করে নিজেদের দেশে নিয়ে যাও। এতো একরকম চুরি ডাকাতিই বলা যায়। রাজা পিটার বললেন। ফ্রান্সিস বললেন—আপনি এটুকু বিশ্বাস আমাদের করতে পারেন যে আমরা চোর ডাকাত নই। যত গুপ্তভাণ্ডার খুঁজে বের করেছি সবই যাদের প্রাপ্য তাদেরকেই দিয়েছি। নিজেরা একটা রুপোর মুদ্রাও নিই নি। হ্যারি বলল—আমার বন্ধু ফ্রান্সিস চিন্তা করে বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্তসম্পদ উদ্ধার করেছে।

রাজা পিটার একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—আমাদের এই মাল্টাতেও একটা গুপ্তধন ভাণ্ডারের কথা আমরা জানি। সেই গুপ্তধন ভাণ্ডার আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। তোমরা উদ্ধার করতে পারবে? ফ্রান্সিস বলল—সব ঘটনা জেনে এবং কোথায় থাকতে পারে সেটা সেই জায়গায় গিয়ে জেনে তবেই বলতে পারবো সেই গুপ্তধনভাণ্ডার উদ্ধার করা যাবে কিনা। আপনি আগে ঘটনাটা বলুন।

একটু কেশে নিয়ে রাজা পিটার বলতে লাগলেন—খুব বেশিদিনেব কথা নয়। বছর পঞ্চাশের আগে—এখান থেকে দক্ষিণদিকে আনজু নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ছিলেন চার্লস নামে একজন ভূস্বামী। পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে চার্লস প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কারের অধিকারী হয়েছিলেন। সকলেই একথা জানতো কিন্তু কেউ কখনো চোখে দেখে নি। চার্লসের স্ত্রীও জানতেন না। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। স্ত্রী আগেই মারা যান। চার্লস পিসায় গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। স্বর্ণমুদ্রা অলঙ্কার তিনি কোথায় রেখে গেছেন তাও তিনি কাউকে বলে যান নি।

—চার্লস কি কোন সূত্র রেখে যান নি? ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

—না—কোন সূত্র রেখে যান নি। নানা ভাবে গত পঞ্চাশ বছর ধরেই খোঁজাখুঁজি চলছে। কেউ কোন সূত্র বার করতে পারেনি। রাজা পিটার বললেন।



—তাহলে আমাকে একবার আনজু যেতে হবে। ঐ জায়গায় খোঁজ খবর করে বলতে পারবো চার্লসের ঐ ধনভাণ্ডার উদ্ধার করতে পারবো কি না। ফ্রান্সিস বলল।

—ঠিক আছে। এই ব্যাপারে তোমাদের আমি সমস্ত সুযোগ সুবিধে করে দেব। দেখ—যদি উদ্ধার করতে পারো। রাজা পিটার বললেন।

এই সময় হ্যারি বলল—গ্রীকভাষায় অভিজ্ঞ একজনকে আমাদের চাই রাজা পিটার তার কাছে-বসা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলল—ইনি সাজ্জিও— পাঁচটা ভাষা ইনি অনর্গল বলতে পারেন লিখতেও পারেন। সারা মাল্টাদ্বীকে সাজ্জিওর মত ভাষাভিজ্ঞ বিদ্বান কেউ নেই। ফ্রান্সিস আর হ্যারি সাজ্জিওকে মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। সাজ্জিও এতক্ষণ চুপ করে বিছানার একপাশে বসেছিলেন। এইবার হেসে তিনিও একটু মাথা ঝোঁকালেন। ফ্রান্সিস বলল— প্রয়োজনে আমরা সাজ্জিওর সাহায্য নেব।

সাজ্জিও ফ্রান্সিসদের দেশীয় ভাষায় বললেন—আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের সাহায্য করবো। ফ্রান্সিস আর হ্যারি অবাক। তারা আবার মাথা নুইয়ে সাজ্জিওকে সম্মান জানাল।

এবার ফ্রান্সিস রাজা পিটারকে বলল—আমার বন্ধুরা এখানে বন্দী অবস্থায় রয়েছে। তাদের মুক্তি দিন এই আর্জি জানাচ্ছি।

রাজা পিটার বললেন—এসব পরে ভাববো। আগে চার্লসের গুপ্ত ধনসম্পদ উদ্ধার করো। তারপরে তোমার বন্ধুরা মুক্তি পাবে। রাজা বললেন।

—সমুদ্রতীরে আমাদের জাহাজ রয়েছে। সেখানে আমাদের দেশের রাজকুমারী রয়েছে। কিছু বন্ধুও সেই জাহাজে রয়েছে। তাদের কী ব্যবস্থা করবেন?

রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে ইশারায় ডাকলেন। দু'জনে কী কথা হল। রাজা পিটার বললেন—তোমাদের রাজকন্যা ও বন্ধুদের জাহাজেই বন্দী করা হয়েছে।

ফ্রান্সিস বললেন—মান্যবর রাজা—আনগেভিনের হয়ে লড়াই করতে গিয়ে আমাদের দুই বন্ধু মারা গেছে, একজন আহতও হয়েছে। এই যুদ্ধে আমরা ইচ্ছে করে জড়াই নি। অথচ দুই বন্ধুকে হারিয়েছি। তাই অনুরোধ ঐ জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। এখানে উন্মুক্ত আকাশের নিচে থাকতে গিয়ে হয়তো আরো বন্ধুকে হারাবো। আপনি দয়া করে আমার বন্ধুদের ঐ জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। এতে ওদের শারীরিক ক্ষতি হবে না।

—বুঝলাম—রাজা পিটার মাথা নেড়ে বললেন—কিন্তু তোমরা যারা ধনসম্পদ খুঁজবে তোমরা তো সুযোগ বুঝে বন্দী বন্ধুদের নিয়ে জাহাজ চালিয়ে পালাতেও পারো।

ফ্রান্সিস বুঝল—রাজা পিটারের মনের সন্দেহ কিছুতেই দূর করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল—ঠিক আছে। আমার বন্ধুদের কয়েদঘরে রাখুন। মাথার ওপর একটা ঢাকা তো থাকবে।

—এবার যাতে আমরা আনজু যেতে পারি তার ব্যবস্থা হলে ভালো হয়। হ্যারি বলল। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে কাছে ডাকলেন ফ্রান্সিসদের সাহায্য করার কথা বললেন।

ফ্রান্সিস ও হ্যারি মাথা একটু নুইয়ে রাজা পিটারকে সম্মান জানিয়ে দুর্গের বাইরে এল।

দুর্গের বাইরে এসে দেখল—একটা শস্যটানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেনাপতি মান্দো গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সিসরা কাছে আসতে বলল, এই গাড়োয়ান আপনাদের আনজু নিয়ে যাবে। চার্লস-এর বিরাট অট্টালিকা গীর্জা গ্রন্থাগার দেখতে পাবেন ওখানে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গাড়িতে উঠল। গাড়ি চলল আনজুর দিকে। পথের দুপাশে গাছপালা টিলা ঝর্ণা।

হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস দেখ কী সুন্দব প্রকৃতি।

ফ্রান্সিস বলল—হ্যারি—প্রকৃতি দেখার মত মনের অবস্থা আমার নেই। অনেক চিন্তা মাথায়।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা আনজু পৌঁছল। দু'জনে উঠল গিয়ে এক সরাইখানায়। গাড়ির গাড়োয়ানকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিল।

দু'জনে যখন চার্লস-এর অট্টালিকার সামনে এল তখন সন্ধ্যে হয় হয়। দেয়াল-ঘেরা অট্টালিকা। দেয়ালের মধ্যে প্রধান প্রবেশ পথ। ফ্রান্সিসরা প্রবেশ পথের সামনে এসে দেখল দু'জন পাহারাদার বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসরা একজন পাহারাদারকে বেশ কষ্ট করে বোঝাল যে ওরা চার্লস-এর অট্টালিকা গীর্জা দেখতে এসেছে। একথাও বলল যে ওরা বিদেশি।

প্রহরী একজন ফ্রান্সিসদের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলল। ফ্রান্সিস হ্যারি প্রহরীর

পেছনে পেছনে চলল। ঢুকেই বিরাট হলঘর। হলঘরের মাঝখানে শ্বেতপাথরের গোল টেবিল। চারপাশের দেয়ালে কয়েকজনের ছবি। বোঝা গেল চার্লস ও চার্লসের পূর্বপুরুষদের ছবি। প্রহরী ওদের নিয়ে হলঘরের কোনায় একটা পাথরের ঘরে ঢুকল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকে দেখল একটা কালো কাঠের বাঁকা পায়াওয়ালা চেয়ারে বসে আছেন টাকমাথা একজন প্রৌঢ়। প্রহরী প্রৌঢ়কে কী বলল। প্রৌঢ়টি হেসে গ্রীক ভাষায় বলল—মান্যবর চার্লসের এই অট্টালিকা গীর্জা গ্রন্থাগার এসব আমিই দেখাশুনো করি। আমার নাম গাইদা। হ্যারি ফ্রান্সিসকে কথাটা বুঝিয়ে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বলো যে আমরা চার্লসের গুপ্ত ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে এসেছি। রাজা পিটার আমাদের অনুমতি দিয়েছেন। ওরা কথা বলছে তখনই ঘরে সাজ্জিও ঢুকলেন। হেসে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে সাজ্জিও বললেন — রাজা পিটার আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন। দেখা গেল গাইদা চেয়ার ছেড়ে উঠে সাজ্জিওকে সম্মান জানাল।

সাজ্জিও গাইদাকে বলল—আপনি আপনার কাজ করুন। আমিই এদের সব দেখাচ্ছি। তারপর ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বললেন—চলুন—আমিই আপনাদের সব দেখাচ্ছি।

তিনজনে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে এল। পাথরে তৈরি হলঘরে পাথরের গায়ে কঁদে কুঁদে ফুল লতা পাতার কাজ করা। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে এসে সাজ্জিও বললেন—এই ছবিটা হচ্ছে মান্যবর চার্লসের ছবি। ফ্রান্সিসরা দেখল —এক প্রৌঢ়ের ছবি। সাধারণ পোশাক পরণে। মুখটা হাস্যোজ্জ্বল নয়। কেমন বিষাদময়।

ফ্রান্সিস বলল—সাজ্জিও—একটা কথা বলি। ছবিটা দেখে মাননীয় চার্লসকে কেমন বিষাদগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

সাজ্জিও বললেন—ঠিকই ধরেছেন। এই ছবি আঁকার সময় চার্লসের এক পালিতা কন্যা মারা গিয়েছিল। তারপরই চার্লস তাঁর জাঁকজমকের জীবন ত্যাগ করে প্রায় সাধুর জীবন কাটাতে লাগলেন। একটা গির্জাঘর তৈরি করালেন। সেই গির্জাতেই তিনি যীশুর আরাধনায় বেশি সময় কাটাতেন। গির্জা চালাবার জন্যে একজন ধর্মযাজককে আনতে জেনিভা গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর শেষ ইচ্ছামত এই গীর্জার প্রাঙ্গনেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

—মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ধনসম্পদের কথা কাউকে বলে যাননি এটাই শুনেছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—এটা রহস্যময়ই থেকে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁর ধনসম্পদ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ সেই বিপুল ধনসম্পদের হদিস করতে পারে নি। সাজ্জিও বললেন।

—মনে হয় ভালো করে খুঁজলে কোন না কোন সূত্র পাওয়া যেতই। হ্যারি বলল।

এবার সাজ্জিও হেসে বললেন—তাহলে সত্যি কথাটা বলি। প্রায় এক বছর ধরে মান্যবর চার্লসের অট্টালিকা গ্রন্থাগার গির্জা আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোন সূত্র পাই নি।

ফ্রান্সিস বলল—তাহলে তো আপনি অনেক কিছুই জানেন।

—তা কিছু তো জানিই। যেমন গ্রন্থগারে রক্ষিত সমস্ত গ্রন্থ আমি পড়েছি। বাসস্থান অট্টালিকা গির্জা সব জায়গা খুঁজেছি। কিন্তু সবই ব্যর্থ। সাজ্জিও বলল।

—এই খোঁজাখুঁজি কি নিজের ইচ্ছেয় করেছেন? হ্যারি বলল।

—না—মান্যবর চার্লসের ধনসম্পদের ওপর আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। রাজা পিটারের নির্দেশেই আমাকে খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছিল রাজা পিটার বলেছিলেন মান্যবর চার্লসের গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলো সব পড়ে যদি কোন সূত্র আমি পাই সে জন্যেই আমাকে খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

—আপনি কোন সূত্রই পান নি। হ্যারি বলল।

—না—কিছ্ছু না। সাজ্জিও বললেন।

কথা বলতে বলতে তিনজনে চার্লসের গ্রন্থাগারে এল। পাথরে তৈরি গ্রন্থাগারটি বেশি বড় না। গ্রন্থাগারের প্রহরী সাজ্জিওকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল।

গ্রন্থাগারে ঢুকল তিনজনে। প্রহরী একটা মোটা হলুদ রঙের মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল। ফ্রান্সিসরা দেখল— কাঠের পাটাতনের ওপর চামড়া বাঁধানো গ্রন্থ রাখা। গ্রন্থ বেশি নেই। সব মিলিয়ে আট দশটা হবে।

হ্যারি বলল—সাজ্জিও—গ্রন্থগুলো সবই কি গ্রীকভাষায় লেখা।

—না—। আরবী ভাষাযও আছে। লাতিন ভাষায়ও আছে। সাজ্জিও বললেন।

—গ্রন্থগুলো কী বিষয় নিয়ে লেখা? হ্যারি বলল।

—নানা বিষয়ে—অঙ্ক জ্যোতিষ মানুষের জীবনমৃত্যু এরকম বিভিন্ন বিষয়ে লেখা। সাজ্জিও বললেন। হ্যারি কয়েকটা গ্রন্থের পাতা উল্টে দেখল। আরবী আর গ্রীক ভাষায় লেখা।

হ্যারি বলল—গ্রন্থগুলো থেকে চার্লসের ধনসম্পদের কোন হদিশ পান নি?

—না—তবে পুরোনো গ্রীক ভাষায় লেখা একটা বাইবেল পেয়েছি। গ্রন্থটার নানা জায়গায় দাগ দেওয়া। বোঝা যায় যে মান্যবর চার্লস খুব মনোযোগ দিয়ে ঐ বাইবেলটা পড়তেন। সাজ্জিও বললেন। ফ্রান্সিস গ্রন্থাগারটা ঘুরে দেখল। সাধারণ পাথরের ঘর। মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এমন কিছু নেই।

—চলুন—গির্জাটা দেখবেন। সাজ্জিও বললেন।

গির্জাটা একটু দূরে। গির্জাটা পাথরের। তবে চূড়োটা কাঠের। তাতে ফুল পাতার কাজ।

তিনজনে গির্জায় ঢুকল। ঢুকেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি অবাক হয়ে গেল। দেখল মানুষের মতই যীশুর মূর্তি। এত বড় যীশুর মূর্তি ওরা কখনো দেখেনি। ওক কাঠ কুঁদে কুঁদে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছে। ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর মূর্তি। এত সজীব মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। ক্রুশের গায়ে হাত পা পেরেকে বিদ্ধ। মাথায় কাঁটার মুকুট। মুখটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। ফ্রান্সিস আর হ্যারি দু'জনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

সাজ্জিও বললেন—মূর্তিটা দেখে একটু অবাক হয়েছেন—তাই না।

—হ্যাঁ—সত্যি এত বড় আর এত সজীব মূর্তি আমরা কখনো দেখিনি। হ্যারি বলল।

—মান্যবর চার্লসের নির্দেশেই এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। তিনি শুধু খ্রীস্টভক্তই ছিলেন না। তাঁর শিল্পবোধেরও প্রশংসা করতে হয়। সাজ্জিও বললেন।

তিনজনে বেদীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাজ্জিও বললেন—কাঠের বেদীতে কত কারুকাজ দেখুন। সত্যিই ফ্রান্সিসরা দেখে অবাক হল কত সূক্ষ্ম কাজ কাঠের বেদীটাতে। কাঠ কুঁদে কুঁদে তোলা হয়েছে নকশা। ফুল লতা পাতা পাখি। কাঠের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম কাজ খুব কমই দেখা যায়।

হঠাৎই ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল—ফুল পাখি লতাপাতা যেখানে শেষ হয়েছে তার নিচে বাঁদিকে আর ডানদিকে কিছু যেন কথা কুঁদে তোলা। ফ্রান্সিস বলল—সাজ্জিও লক্ষ্য করেছেন বোধহয় নিচের দিকে কিছু লেখা আছে।

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। প্রাচীন গ্রীকভাষায় লেখা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' থেকে দুটো উদ্ধৃতি। সাজ্জিও বললেন।

—উদ্ধৃতি দুটো কী? হ্যারি জানতে চাইল।

সাজ্জিও বললেন—

—বাঁ দিকের উদ্ধৃতিটি হচ্ছে—"দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনারূপে ক্রুশ বহন যে না করে সে আমার অনুগামী হতে পারে না।"

ডানদিকে আছে—"জীবনটা কেবল খাওয়াপরা নয় তার থেকে আরো অনেক বেশি।"

ফ্রান্সিসরা বুঝল বড় গভীর অর্থময় উধৃতি দুটি। চার্লস সত্যিই একজন চিন্তাশীল মানুষ ছিলেন। শুধু খ্রীস্টভক্তই ছিলেন না।

ওদিকে দুর্গের চত্বরে বন্দী শাঙ্কো বিস্কোরা ভাবছে কী করে ওখান থেকে পালানো যায়। পালিয়ে ওদের জাহাজে যাবে। বরং জাহাজেই বন্দী হয়ে থাকবে। এখানে এই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এভাবে দিনের পর দিন থাকা চলে না। কিন্তু পালাবে ভাবলেই তো হবে না। কীভাবে পালাবে সেটাই আগে ভাবতে হবে। শাঙ্কো বিস্কোর সঙ্গে এই নিয়ে মৃদুস্বরে কথা বলছিল। শাঙ্কো বিপদ আঁচ করলেই যা করে এবারও তাই করেছে। কোমর থেকে বড় ছুরিটা বের করে ঢোলা জামার মধ্যে

ছুরিটা ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছে। প্রয়োজনের সময় বার করবে।

শাঙ্কো তাই বলল—দেখ—হাতে দড়ি কেটে ফেলা যাবে। কিন্তু দুর্গের দেয়াল ডিঙোবে কী করে? পাহারাদার সৈন্যরা তো ঘোরাফেরা করছে। ওদের একটাকে ঘায়েল করে তরোয়াল ছিনিয়ে আনা যায়। কিন্তু এত সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই—অসম্ভব।

—দেখা যাক—রাতের খাবার দেবার সময় কতজন সৈন্য থাকে। বিস্কো বলল।

রাত হয়েছে তখন। চারজন পাহারাদার সৈন্য বন্দীদের খাবার দাবার জল নিয়ে এল। হাত খোলা হবে না। সবার সামনে লম্বাটে পাতা পেতে দেওয়া হল। তাতে আধপোড়া রুটি আর সবরকম আনাজ পত্রের ঝোলমত দেওয়া হল। সঙ্গে একটা করে মুরগীর সেদ্ধ ডিম। হাত বাঁধা অবস্থাতেই সবাই খেতে লাগল। শাঙ্কো বিস্কো দু'জনেরই মনে পড়ল এরকম বন্দী অবস্থায় ফ্রান্সিসের উপদেশ—পেট পুরে খাও—খেতে ভালো না লাগলেও খাও। দু'জনেই পেট পুরে খেল। একজন পাহারাদার কাঠের জালামত জায়গায় জল নিয়ে এসেছিল। সে সবাইকে জল খাওয়াতে লাগল। শাঙ্কো সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখল। মশালের আলোয় দেখল বেশ কিছুটা দূরে সদর দেউড়িতে এখন সৈন্য সংখ্যা কম। যারা খাবার দিতে এসেছিল তারা খাবারের বড় বড় কাঠের এঁটো পাত্রগুলো নিয়ে চলে গেল। রইল শুধু যে পাহারাদারটি জল দিচ্ছিল—সে একা।

শাঙ্কো ফিস ফিস করে ডাকল—বিস্কো। বিস্কো ওর দিকে তাকাল। শাঙ্কো মাথা নিচু করে বলল—আমার পোশাকের মধ্যে থেকে ছোরাটা বের কর। বিস্কো সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কোর ঢোলা গলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছোরাটা তুলে আনল। তারপর নিজের দড়িবাঁধা দু' হাত দিয়ে ছোরাটা ধরে শাঙ্কোর হাতের দড়ি কাটতে লাগল। ছোরার খোঁচা লেগে শাঙ্কোর হাতের কয়েকটা জায়গা কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। জ্বালা করতে লাগল। শাঙ্কো মুখ বুঁজে সহ্য করল। ছোরার ঘষা লেগে একসময় দড়িটা কেটে গেল। খোলা হাতে শাঙ্কো ছোরাটা নিয়ে বিস্কোর হাতের দড়ি কেটে ফেলল। এবার বিস্কো বাকি বন্ধুদের হাতের দড়ি কাটতে লাগল। জল দিচ্ছিল যে পাহারাদারটা সে তখন জলের পাত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শাঙ্কো তখন বিস্কোকে ছোরাটা দিল। তখন সৈন্যটি ওদের সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। বিস্কো অন্ধকারে এক লাফে সৈন্যটার কাঁধে ঝুলে পড়ল। পেছন থেকে ছেঁড়া দড়িটা দিয়ে সৈন্যটার গলায় ফাঁসমত পরাল। তারপর দড়ি টানল। পাহারাদারটি টাল খেয়ে পাথর বাঁধানো চত্বরে পড়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে গেল। শাঙ্কো কিছুক্ষণ চাপাগলায় বলল—ছোরাটা দাও। আমার সঙ্গে এসো।

দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের দেওয়ালের দিকে চলল। সদর দেউড়ির মশালের আলো এত দূর আসে নি। দেয়ালের নানা জায়গায় খোঁদলে মশাল জ্বলছে। শাঙ্কো হামাগুড়ি দিয়ে অমনি একটা জ্বলন্ত মশালের কাছে এল। বিস্কোও

এলো। দু'জনেই ভীষণ হাঁপাচ্ছে তখন। শাঙ্কো একবার দুর্গের দেউড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মশালটা নিয়েই দেয়ালের গায়ে চেপে ধবল। ধোঁয়া বেরোল। মশালটা নিভেও গেল, এবার শাঙ্কো ফিস ফিস করে বিস্কোকে ডেকে বলল—বিস্কো এসো—তোমার কাঁধে উঠে আমি দেয়াল ডিঙোবো।

—পারবে? বিস্কো বলল।

—পারবো। মশাল রাখার আর একটা খোঁদল রয়েছে ওপরে। শিগগিরি এসো। শাঙ্কো বলল। বিস্কো এগিয়ে এসে দেয়াল ঘেঁষে বসল। শাঙ্কো ওর দুকাঁধে দু'পা রেখে দাঁড়াল। দেয়াল ধরে ধরে বিস্কো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের মাথায় শাঙ্কো পৌঁছাতে পারল না। তখনও হাত তিনেক বাকি। শাঙ্কো অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল মশাল রাখার খোঁদলটা একটু উচুঁতে ডানদিকে রয়েছে। শাঙ্কো দেয়ালে শরীর চেপে খোঁদলটায় ডান পাটা রাখল। তখন শাঙ্কো. ভীষণ হাঁপাচ্ছে। নাক মুখ দিয়ে একসঙ্গে শ্বাস টানছে। দেয়ালে শরীর চেপে খোঁদলে পায়ের চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে শাঙ্কো চেপে দেয়ালের মাথায় উঠে বসল। বিস্কো চাপা গলায় বলল—সাবাস্ শাঙ্কো। হাঁপানির ঠ্যালায় তখন শাঙ্কো কথাও বলতে পারছে না। অবশ্য এখন কথা বলার সময়ও নয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—বিস্কো—দেয়ালের ওপাশে একটা ন্যাড়াগাছ দেখেছি আমি। আমি ঐ গাছ বেয়ে বেয়ে নেমে যাবো। আমাদের জাহাজে যাবো। মোটা দড়ি নিয়ে আসবো। ঐ গাছটায় বেঁধে দেয়ালের এপাশে দড়ির অন্য মাথাটা ফেলে দেবো। তোমরা দড়ি বেয়ে বেয়ে দেয়াল ডিঙোবে। তোমরা একজন একজন করে যখন এপাশে দড়ি ধরে নামতে থাকবে তখন দেয়ালের ওপাশে অন্যেরা দড়িটা টান করে ধরে রাখবে। তাহলেই এপারে সহজে নেমে যাবে।

শাঙ্কো এবার অন্ধকারে পা বাড়িয়ে ন্যাড়া গাছটার মগডালে শরীরের ভর রাখলো। তারপর শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাছটার কাণ্ড জড়িয়ে ধরল। দেখল—দুর্গের দেউড়িতে অনেক মশাল জ্বলছে কিন্তু সৈন্যসংখ্যা কম।

শাঙ্কো আস্তে আস্তে গাছটার ডাল ধরে ধরে কাণ্ড বেয়ে মাটিতে নেমে এল। তারপর অন্ধকারেই পাথর ভরা পথটায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাঁপানি তখন ছেড়ে গেছে।

কিছুক্ষণ এমনি করে শুয়ে থাকায় হাঁপানি একটু কমল। এবার শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। ঐ হাঁপধরা অবস্থায় যতটা দ্রুত সম্ভব চলল ওদের জাহাজ যেখানে আছে সেই তীরভূমির দিকে।

যেখানে জাহাজটা ছিল সেখানে শাঙ্কো এল। জাহাজের কাছাকাছি আসতেই দেখল জাহাজ থেকে তীরভূমিতে পাতা পাঠের পাটাতনটা তুলে ফেলা হয়েছে। জাহাজের ডেক-এ একদল সশস্ত্র সৈন্য। দেখেই বুঝল ওরা রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্য। মুস্কিল হল। সোজা পথে দড়ি জোগাড় করা যাবে না। শাঙ্কো

তাই ঠিক করল নোঙরের দড়িটাই নেবে।

শাঙ্কো জলের ধারে এল। আস্তে আস্তে জলে নেমে নিঃশব্দে জল ঠেলে চলল। জাহাজের সামনের দিকে অন্ধকারে এগিয়ে এবার নোঙরের কাছিটা ধরে ডুব দিল। অনেকটা নিচে নেমে ছোরাটা কোমর থেকে খুলল। তারপর ছোরা চেপে ধরে কাছিটা পোঁচ দিয়ে কেটে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে জলের ওপর ভেসে উঠল। এরপর জলের ওপরের কাছিটা কেটে ফেলল। এবার কাছিটা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে নিঃশব্দে সাঁতরাতে সাঁতরাতে তীরে উঠে এল। পেছনে তাকিয়ে দেখল ওদের জাহাজটা তো এখন নোঙরহীন। হাওয়ার ধাক্কায় আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। জাহাজে বাড়তি নোঙর থাকে যে বন্ধুরা জাহাজে বন্দী আছে তারাই নতুন নোঙর লাগাবে। এখন দুর্গ থেকে বন্ধুদের মুক্ত করাই আসল কাজ। নোঙর থেকে কাটা কাছিটা গোল করে পেঁচিয়ে নিয়ে শাঙ্কো অন্ধকারে চলল দুর্গের দিকে।

দুর্গের দেয়ালের কাছাকাছি গাছটার ওপর উঠল। গাছটার মাঝামাঝি কাণ্ডটার সঙ্গে কাছির একটা মুখ ভালো করে গেড়ো দিয়ে বাঁধল। গাছ থেকে নেমে এল। কাছির অন্য মুখটায় একটা পাথর বাঁধল। এবার সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে দুর্গের ভেতরে ছুঁড়ে দিল। শাঙ্কোর ভাগ্য ভাল। পাথরটা ভেতরের চত্বরে বন্দী কারো মাথায় পড়ল না। পড়ল চত্বরের ওপর। শব্দ হল। তবে খুব জোর শব্দ নয়। বিস্কো অন্ধকারে শব্দটা লক্ষ্য করে এগিয়ে এল। পাথর বাঁধা কাছিটা দেখল। বুঝল শাঙ্কোই ছুঁড়েছে দড়ির মুখটা। বিস্কো বন্ধুদের ফিস ফিস করে বলল—শাঙ্কো কাছি ঝুলিয়ে দিয়েছে। একে একে পালাও। বন্ধুদের একজন কাছিটার কাছে এল। কাছিটা টেনে দেখে বুঝল কাছিটা দেয়ালের ওপাশের গাছটার সঙ্গে বেশ শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। বন্ধু যখন দেয়ালের কাছে গিয়ে কাছি দিয়ে বেয়ে উঠছে নিচে বিস্কো ওরা কয়েকজন কাছিটা টান টান করে টেনে ধরে রাখল। বন্ধুটি দেয়ালের মাথায় বসল। তারপর টান টান কাছিটা ধরে ধরে এগিয়ে গেল। শাঙ্কো এসে বন্ধুটিকে জড়িয়ে ধরল। মুক্তি!

এবার বিস্কো সব বন্ধুকে একে একে দেয়ালের ওপাশে পার করে দিল। তারপর আনগেভিনের সৈন্যরা কাছি টেনে ধ'রে বিস্কোকে পার করাল। এরপর নিজেরা দেয়ালে উঠে পার হতে লাগল।

বিস্কো দেয়ালের ওপর উঠে দেখেছিল দেউড়ির দিকে তাকিয়ে। সৈন্যরা দু'তিনজন জেগে আছে। তবে পাহারা দিচ্ছে না। গল্পগুজব করছে। মশাল জ্বলছে। এদিকে কারো দৃষ্টি নেই।

বিস্কো পার হতেই ভাইকিংরা এবার ছুটল জাহাজ যে দিকে বাঁধা আছে সেদিকে। অন্ধকারে ছুটে চলল সবাই।

সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখল নোঙরহীন ওদের জাহাজটা বেশ দূরে ভেসে গেছে। শাঙ্কো বলে উঠল—সবাই সাঁতরে চলো। সমুদ্রের সঙ্গে ভাইকিংদের নাড়ির টান।

ওদের কাছে এই দূরত্বটুকু সাঁতরে যাওয়া কিছুই না।

আস্তে আস্তে জলে নামল সবাই। শাঙ্কোর হুঁশিয়ারি শোনা গেল—কোন শব্দ নয়। ভাইকিংরা নিঃশব্দে সাঁতরে চলল ওদের জাহাজের দিকে।

জাহাজের কাছাকাছি এসে বিস্কো একটু গলা চড়িয়ে বলল—আমরা রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করবো না। ওদের ধরে ধরে জলে ফেলে দেব।

জাহাজের হালের কাছে এসে জড়ো হল সবাই। হালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে প্রথমে শাঙ্কো উঠল। ডেক-এ নেমে এল না। হালের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে প্রায় সবাই উঠে এল। দেখল ডেক-এ চার পাঁচজন রাজা পিটারের সৈন্য ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তবে তরোয়াল কোমরে গোঁজা।



মুহূর্তে শাঙ্কো ছুটে এসে একজন পাহারাদার সৈন্যকে রেলিঙের দিকে ঠেলে নিয়ে এক ধাক্কায় জলে ফেলে দিল। শাঙ্কোর দেখাদেখি আর সবাইও তখন ছুটে এসে বাকি পাহারাদার সৈন্যদের ঠেলে জলে ফেলে দিল।

এতে একটু হৈ চৈ হল। নিচের কেবিনঘরের অস্ত্রঘরের পাহারাদার সৈন্যরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ডেক-এ উঠে এল। তাদেরও একই দশা হল। শুধু একজন পাহারাদার সৈন্য তরোয়াল চালিয়ে শাঙ্কোর কাঁধে ঘা মারতে পেরেছিল। শাঙ্কো আঘাতের কষ্টের মধ্যেও বলে উঠল—ওকে মেরোনা—জলে ফেলে দাও। সবাই তাই করল। ওকে দোলাতে দোলাতে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এ সময় নিচের কেবিনঘর থেকে বাকি বন্ধুরা উঠে এল ডেক-এ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। মারিয়া ডেক-এ উঠে এল। ওর আশা ছিল হয় তো ফ্রান্সিস হ্যারিও মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু দেখল মুক্ত ভাইকিংদের মধ্যে ফ্রান্সিস আর হ্যারি নেই।

ওদিকে ভেন শাঙ্কোর চিকিৎসা করতে লাগল। মারিয়াও শাঙ্কোর শুশ্রূষায় লেগে পড়ল। বিস্কো শাঙ্কোর কেবিনঘরে এল। দেখল—শাঙ্কোর কাঁধ থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। শাঙ্কো এখন অনেকটা ভালো। ভেন আর মারিয়া শাঙ্কোর পাশে বসে আছে।

বিস্কো বলল—শাঙ্কো তুমি যেভাবে আমাদের মুক্ত করলে তা প্রশংসনীয়। শাঙ্কো হেসে বলল—এসবই আমার ফ্রান্সিসের কাছ থেকে শেখা। ফ্রান্সিস বলে—বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। কার্যকরী কোন পন্থা বের করতে হয়, তারপর সেটা কাজে লাগাও।

—ঠিক তাই—বিস্কো বলল—কিন্তু আমি ভাবছি পালিয়ে তো এলাম এবার ফ্রান্সিস আর হ্যারির না কোন বিপদ হয়। মারিয়া বলল—বিপদ আর কী হতে পারে। বড় জোর ওদের দু'জনকে বন্দী করে রাখতে পারে। তবে দু'জন তো, ফ্রান্সিস ঠিক হ্যারিকে নিয়ে পালাতে পারবে। ওদের জন্য ভেবো না। এখন আমরা কী করবো সে কথা ভাবো। শাঙ্কো বলল—আমি নোঙরের কাছি কেটে নিয়ে গেছি। আমাদের জাহাজ এখন নোঙরহীন। বিস্কো বলল—নতুন নোঙর কাছির ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু আমাদের জাহাজটা কোথায় রাখবো? শাঙ্কো বলল—বেশ কিছুটা পূবে সমুদ্রতীরে চলো। দেখা যাক—জাহাজ লুকিয়ে রাখার কোন জায়গা পাই কিনা।

বিস্কো বলল—ভোর হবার আগেই আমাদের এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। রাজা পিটারের জাহাজগুলো থেকে বেশ দূরে। আমাদের জাহাজ যেন ওরা দেখতে না পায়। ওরা সকালেই জেনে যাবে যে আমরা পালিয়েছি। আমরা যে সব পাহারাদারকে জলে ফেলে দিয়েছি তাদের কাছেও আমাদের জাহাজের খবর পাবে তখন আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে কামানের গোলা ছুঁড়লেই আমরা বিপদে পড়ে যাবো। কাজেই এক্ষুনি এই তল্লাট ছেড়ে পালাতে হবে। বন্ধুদেরও এই কথা বলেছি। বিস্কো এবার ডেক-এ উঠে এল। বন্ধুদের ডেকে-এর কাছে আসতে বলল। তারপর বলল—এক্ষুনি একদল দাঁড়ঘরে চলে যাও। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একদল ভাইকিং দাঁড়ঘরে চলে গেল। অন্যদল পাল খুলে দিতে চলল। এবার বিস্কো জাহাজচালক ফ্রেজারকে বলল—জাহাজ পূবদিকে চালাও। ফ্রেজার হুইল ঘোরাল। বিস্কো পেড্রোকে বলল—তোমার জায়গায় উঠে যাও। লক্ষ্য রাখো তীরে কোন ঘন জঙ্গলঘেরা জায়গা পাও কিনা। পেলেই বলবে। পেড্রো মাস্তুল বেয়ে নিজের নজরদারির জায়গায় চলে গেল।

জাহাজ পুবমুখো চলল। বেশ দ্রুতই চলল।

রাত শেষ হয়ে এল। পূবদিকের আকাশ লাল হয়ে উঠল। সূর্য উঠতে দেরি নেই। পেড্রো মাস্তুলের ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল—তীরে একটা জংলা জায়গা দেখা যাচ্ছে। রেলিং ধরে বিস্কো আর মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। বিস্কো দেখল ওখানে একটা খাঁড়ি মত। অনায়াসে জাহাজ খাঁড়িতে ঢোকানো যাবে। খাঁড়ির দুপাশে গভীর জঙ্গল। বাইরে থেকে জাহাজটাকে দেখা যাবে না।

বিস্কো গিয়ে ফ্রেজারকে বলল—জাহাজ খাঁড়িটায় ঢুকিয়ে দাও। ওখানেই

থাকবে জাহাজটা। ওখানেই আমরা ফ্রান্সিস আর হ্যারির জন্যে অপেক্ষা করবো।

জাহাজটা বেশ দ্রুতই খাঁড়িটায় ঢুকে পড়ল। তখনই সূর্য উঠল। ভোরের নিস্তেজ আলো ছড়ালো সমুদ্রের জলে। জঙ্গলটার মাথায়।

শাঙ্কোরা সারাদিন শুয়ে বসে কাটাল।

বিকেলে শাঙ্কো ভাবল—কোথায় এলাম একটু দেখে আসি।

শাঙ্কো জাহাজের পাটাতন দুটোর কাছে এল। এক ভাইকিং বন্ধুকে বলল—পাটাতনটা পাতবো চলো।

বন্ধুটি বলল—এসব জংলা জায়গা। জাহাজ থেকে নামা কি ঠিক হবে?

—আরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে চলে আসবো। এখন তো আমাদের ফ্রান্সিস আর হ্যারির জন্যে প্রতীক্ষা করা ছাড়া কোন কাজ নেই। এসো। শাঙ্কো বলল।

শাঙ্কো আর বন্ধুটি মিলে জাহাজ থেকে দুটো পাটাতন ফেলল। পাটাতন দুটো পড়ল তীরের ঝোপঝাড়ের ওপর। বন্ধুটি বলল—তোমার একা নামা ঠিক হবে না। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

শাঙ্কো আর বন্ধুটি পাতা পাটাতন দিয়ে তীরের ঝোপজঙ্গলের মধ্যে নামল। শাঙ্কো ঝোপঝাড় দু'হাতে সরিয়ে হেঁটে চলল। পেছনে বন্ধুটিও শাঙ্কোর দেখাদেখি ঝোপজঙ্গল দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ হেঁটে এগোতেই দেখল এখানে ঝোপজঙ্গল কম। বিরাট বিরাট সব গাছ।

শাঙ্কো চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে তখনই নজরে পড়ল একটা পায়ে চলা পথ উত্তরদিকের জঙ্গলে ঢুকে গেছে। শাঙ্কো আশ্চর্য হল। এরকম জায়গায় তাহলে লোকজন যাওয়া আসা করে। শাঙ্কোর বন্ধুটিও তখন অবাক। বলল—শাঙ্কো, মনে হচ্ছে এখানে লোকবসতি আছে।

—ভাবছি রাস্তাটা ধরে যাবো কিনা। শাঙ্কো বলল। বন্ধুটি চারদিকে তাকিয়ে বলল—শাঙ্কো—দেখ অন্ধকার নেমে আসছে। আর না এগিয়ে চলো জাহাজে ফিরে যাই।

—তুই একটা ভীতুর ডিম। তুই চলে যা। আমি একাই যাবো। শাঙ্কো বলল।

—না-না। বন্ধুটি বলল—শাঙ্কো জীবনের ঝুঁকি নিও না। ফিরে চলো। বন্ধুটি শাঙ্কোকে বারবার সাবধান হতে বলল। কিন্তু শাঙ্কো কথা শুনলো না। পায়েচলা পথটা ধরে এগোতে লাগল। অগত্যা বন্ধুটিও শাঙ্কোর পেছনে পেছনে চলল। একটু এগোতেই জঙ্গল শুরু হল। জঙ্গল খুব ঘন নয়। ছাড়া ছাড়া গাছপালা।

সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। পাখপাখালি বাসায় ফিরেছে। পাখির ডাকে এলাকাটা ভরে উঠেছে।

কিছুটা এগিয়ে গেল দু'জনে। হঠাৎ শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকটা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা পাথরের বাড়ি। বন্ধুটি বলল—শাঙ্কো কী হল? শাঙ্কো

নিঃশব্দে আঙ্গুল তুলে পাথরের বাড়িটা দেখাল। বন্ধুটিও অবাক হল। এই জঙ্গলে পাথরের বাড়ি? শাঙ্কো বলল—তুমি এখানে থাকো। আমি আড়াল থেকে দেখে আসি এটা পোড়ো বাড়ি না লোকজন থাকে। বন্ধুটি দাঁড়িয়ে রইল।

শাঙ্কো গাছপালার আড়ালে আড়ালে বাড়িটার কাছে গেল। কান পাতল। অস্পষ্ট কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। শাঙ্কো বুঝল বাড়িটায় লোকজন আছে। এরা কারা? বাড়িটা পাথরের। মাথায় পাথরের ছাদ। দরজা জানালা ভাঙা। পাথরের কাল্‌চে দেয়াল এখানে ওখানে ধ্বসে পড়েছে। একটা জানালা দিয়ে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে।

আর একবার ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে শাঙ্কো বন্ধুর কাছে ফিরে এল। বলল—যতটা পারলাম দেখলাম। এখানে কিছু লোক রয়েছে। তারা কারা বুঝতে পারলাম না। চলো—আর কিছু দেখার নেই।

দু'জনে ফিরে চলল। কিছুটা গিয়ে ওরা পায়েচলা পথ ছেড়ে ডানদিকের ঝোপঝাড়ে ঢুকল। গাছ ঝোপঝাড় পার হয়ে ওরা খাঁড়ির ধারে এল। দেখল ওদের জাহাজটা বেশ কিছুটা উত্তরদিকে জলে ভাসছে।

দু'জনে তীর ধরে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তীরে এল যেখানে ওদের জাহাজটা রয়েছে।

পাতা পাটাতন দিয়ে দু'জনে যখন জাহাজে উঠল তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

বিস্কো আর কয়েকজন ভাইকিং ছুটে এল। বিস্কো বলল—শাঙ্কো তোমাদের জন্যে আমাদের খুব ভাবনা হয়েছিল। কোথায় গিয়েছিলে?

—জাহাজ থেকে নেমে একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। শাঙ্কো বলল।

—কী দেখলে? শুধু ঝোপজঙ্গল? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ ঝোপজঙ্গলের মধ্যে একটা পাথরের বাড়ি। শাঙ্কো বলল।

—বলো কি? এই ঝোপজঙ্গলের মধ্যে বাড়ি? তবে পোড়ো বাড়ি থাকতেও পারে। বিস্কো বলল।

—পোড়ো বাড়ি নয়। লোকজনও রয়েছে। শাঙ্কো বলল।

—আশ্চর্য! কারা থাকে ওখানে? বিস্কো বলল।

—সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। শাঙ্কো বলল।

—বোধহয় চোর ডাকাতের দল। বিস্কো বলল।

—উঁহু—চোর ডাকাতরা অত গলা তুলে খোশগল্প করে না। শাঙ্কো বলল।

—কোন ভাষায় ওরা কথা বলছিল? একজন ভাইকিং জানতে চাইল?

—ওরা এখানে প্রচলিত গ্রীক ভাষাতেই কথা বলছিল। শাঙ্কো বলল।

—ভাগ্যিস তোমাদের ওরা দেখতে পায় নি। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ আমরা গাছের আড়াল থেকে সব দেখে শুনে দ্রুত চলে এসেছি। শাঙ্কো বলল।

—তাহলে ওরা কারা তা তো বোঝা গেল না।

—ওরা এই দেশেরই লোক এটা বোঝা গেল। এখন এরা আমাদের সম্পর্কে বা আমাদের জাহাজ সম্পর্কে কিছু জানে কিনা জানি না। এরা আমাদের শত্রু বা মিত্র তাও জানার উপায় নেই। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। আমরা কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে যাবো না। বিস্কো বলল।

—দেখা যাক—আমাদের আবার কোন বিপদ হয় কি না। শাঙ্কো বলল।

ভাইকিংদের রাতের খাওয়া শেষ হল। সবাই জাহাজের ডেক-এ কেবিনঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। শাঙ্কো, জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। লোকজন থাকে—ওখানে যারা থাকে তারা কারা এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে শাঙ্কোর দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

তখন শেষ রাত। চাঁদের ম্লান আলোয় দেখা গেল একদল সৈন্য তীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর পাতা কাঠের পাটাতন দিয়ে হেঁটে ফ্রান্সিসদের জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। কোনরকম শব্দ না করে চারজন সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে অস্ত্রঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল যাতে ভাইকিংরা কেউ অস্ত্র হাতে না পায়।

এবার সৈন্যদের সর্দার ডেক-এ ঘুমিয়ে থাকা ভাইকিংদের ঘুম ভাঙাতে বলল। সৈন্যরা ভাইকিংদের একে একে তরোয়ালের খোঁচা দিয়ে জাগাতে লাগল। এই ভাইকিংদের মধ্যে শাঙ্কো ঘুমিয়ে ছিল। তরোয়ালের খোঁচায় ঘুম ভেঙে সৈন্যদের দেখল। সৈন্যদের মধ্যে সৈন্যদের সর্দারকেও দেখল। গালে চিবুকে সামান্য দাড়িওয়ালা সর্দারকে দেখেই চিনল। বুঝল এরা আনগেভিনের সৈন্য। এরাই যুদ্ধে হেরে এসে জঙ্গলের মধ্যে পাথরের বাড়িটায় আশ্রয় নিয়েছে।

শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। সর্দারের কাছে গেল। বলল—তুমিই তো আনগেভিনের সৈন্যদের সর্দার?

—তাহলে চিনতে পেরেছো। সর্দার হেসে বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু আমাদের এভাবে বন্দী করা হচ্ছে কেন? শাঙ্কো জানতে চাইল।

—কারণ আমরা তোমাদের সাহায্য চাই। সর্দার বলল।

—একবার তো লড়াইয়ের সময় সাহায্য করেছি। আবার কীসের সাহায্য? শাঙ্কো বলল।

—আমরা আমাদের জাহাজটা পিটারের সৈন্যদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসবো। সর্দার বলল।

—আমরা আর তোমাদের সাহায্য করবো না। এসব তোমাদের সমস্যা। তোমরা নিজেরাই মিটিয়ে নাও। আমরা এখন দেশের দিকে জাহাজ চালাবো। শাঙ্কো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল।

—না—আমাদের সঙ্গে যোগ দিন জাহাজ উদ্ধার করতে সাহায্য করতে। তারপর দেশে ফিরা যাবেন তার আগে নয়।

—আমরা তোমাদের সাহায্য করবো না। শাঙ্কো বলল।

—এটাই তোমাদের শেষ কথা? সর্দার বলল।

—হ্যাঁ—শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোমাদের বন্দী করে নিয়ে যাবো। আমাদের আস্তানায় তোমরা বন্দী থাকবে। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে—আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে নিই।

—বেশ। কথা বলো।

ততক্ষণে যারা জাহাজের কেবিনঘরে ছিল তাদেরও বন্দী করে আনা হয়েছে। সবাই ডেক-এর ধারে ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সর্দারের সৈন্যরা সবাইকে খোলা তরোয়াল হাতে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মারিয়া একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো বিস্কোকে ডাকল। বিস্কো কাছে এল। শাঙ্কো সর্দারের সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সব বলল। তারপর বলল—এখন কী করা যায়?

—আনগেভিনের জন্যে আমরা যুদ্ধ করতে যাবো কেন? বিস্কো বলল।

—তাহলে কি আমরা বন্দী হয়েই থাকবো? শাঙ্কো বলল।

—তাই থাকবো। বিস্কো বলল।

শাঙ্কো সর্দারের কাছে ফিরে এল। বলল—আমরা বন্দী থাকবো।

—বেশ। সর্দার গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে হাত বেঁধে আমাদের আস্তানায় নিয়ে চলো।

—সবাইকে নয়। আমাদের দেশের রাজকুমারীকে এই জাহাজেই রাখতে হবে। বিস্কো বলল।

—না—সর্দার গলা চড়িয়ে বলল—সবাইকে আমাদের আস্তানায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে।

মারিয়া শাঙ্কোর কাছে এল। বলল—আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি অনায়াসেই ওখানে থাকতে পারবো।

—বেশ। শাঙ্কো বলল।

তখন ভোর হয়েছে। জঙ্গলের পাখিগুলো ডাকতে শুরু করেছে। রোদ পড়ল সমুদ্রে জঙ্গলের মাথায়।

সর্দারের সৈন্যরা ফ্রান্সিসদের জাহাজের মালখানা থেকে দড়ি জোগাড় করল। ছোট ছোট করে দড়ি কেটে নিয়ে ভাইকিংদের হাত বাঁধলো। শুধু মারিয়ার হাত বাঁধা হল না।

সবাইকে তক্তার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে তীরে আনা হল। ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবাই চলল। সর্দারের সৈন্যরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিয়ে ভাইকিংদের নিয়ে চলল।

কিছুদূর এসে পায়েচলা পথটা দেখা গেল। সেই পথ দিয়ে উত্তরমুখে চলল

সবাই।

যেতে যেতে শাঙ্কো বলল—ঐ পাথরের বাড়িটায় দরজা জানালা নেই। ওদের হাত বেঁধে রাখা হবে। ভাববার কিছু নেই। ছোরা দিয়ে দড়ি কেটে মুক্ত হওয়া যাবে। তারপর ভাঙা দরজা দিয়ে পালানো যাবে। নিজেদের জাহাজে ফিরে আসা যাবে। কারণ তখন কোন পাহারাদার থাকবে না। আনগেভিনের সব সৈন্যই জাহাজ দখল করতে যাবে।

সবাই ভাঙা পাথরের বাড়ির সামনে এল। বাড়িতে ঢুকল সবাই। শাঙ্কো তখন বুঝল ও বাড়িটা ছোট ভেবেছিল। আসাল বাড়িটা বেশ বড়।

সর্দার শাঙ্কোদের নিয়ে এল একটা বেশ বড় ঘরের কাছে। শাঙ্কো দেখল ঘরটার কাঠের দরজা অটুট আছে। সর্দার দরজাটা খুলে দিল। শাঙ্কোদের ঢোকানো হল সেই ঘরটায়।

ঘরের ভেতর ঢুকে শাঙ্কো দেখল—ঘরটার কোন জানালা নেই। ওপরে ঘুলঘুলিমত। ওটা দিয়েই আলো হাওয়া আসছে।

শাঙ্কো হতাশ হল। এখান থেকে কী করে পালাবো? শাঙ্কো এবার বুঝতে পারল ফ্রান্সিস আর হ্যারি কাছে না থাকলে ওরা কতটা অসহায়।

বিছানা বলতে শুক্‌নো ঘাসপাতা মেঝেটায় বিছোনো। ভাইকিংরা কেউ বসল কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। রাতের ঘুমটা হয় নি। এখন ঘুমোনো যাবে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরটার দরজা খুলে গেল। সর্দার ঢুকল। হেসে বলল—এখানকার এক মস্তবড় জমিদারের প্রাসাদ ছিল এটা। কোন প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে গেলে খাজনা না দিতে পারলে এই ঘরে তাদের বন্দী করে রাখা হত। এটাকে কয়েদঘরও বলতে পারো।

—এসব শুনে আমাদের লাভ? বিস্কো বলল।

—লাভ এই যে তোমরা এমন একটা ঘর থেকে কোনদিনই পালাতে পারবে না—এটা জানানোর জন্যেই এত কথা বলা। সর্দার বলল।

—ঠিক আছে। আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা কর। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ সকালের খাবার তৈরি হচ্ছে। তোমাদের জাহাজ থেকে আটা ময়দা এসব আনা হয়েছে। একটু পরেই খেতে দেওয়া হবে। সর্দার বলল।

সর্দার এবার বলল—আমাদের জাহাজ উদ্ধারের কাজে তোমরা সাহায্য করতে পারতে। এই বন্দী দশা তোমরা ইচ্ছে করেই মেনে নিলে।

—ঠিক তাই—তোমাদের আমরা কোনমতেই সাহায্য করবো না। তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা বন্ধুকে হারিয়েছি। আর না। শাঙ্কো বলল।

সর্দার আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সকালের খাবার দেওয়া হল। পোড়া পোড়া রুটি আর আনাজের ঝোল। শাঙ্কোরা তাই খেতে লাগল।

দু'জন সৈন্য একটা জলের পীপে এনে ঘরের কোনায় রাখল। খাবার খেয়ে জল খেল সবাই। সৈন্যরা চলে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

মারিয়া ঘরের এক কোনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল। এবার একটু গলা চড়িয়ে ডাকল—শাঙ্কো। শাঙ্কো তাড়াতাড়ি মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী আপনার কি কষ্ট হচ্ছে।

—না—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না—মারিয়া বলল—আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না।

—কিছু বলবেন? শাঙ্কো জিজ্ঞেস করল।

—হ্যাঁ মারিয়া বলতে লাগল—এই আনগেভিনের সৈন্যদের সঙ্গে জাহাজ উদ্ধারে সাহায্য করার জন্যে তুমি যেতে রাজি হলে না কেন?

—এই সৈন্যদের সর্দারকে বিশ্বাস করলে আমাদের বিপদই বাড়তো শুধু। ওদের যুদ্ধ জাহাজ দখল হলে ওরা প্রথমেই আমাদের হত্যা করতো। কারণ ওদের কাছে তখন আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—সেটা আমিও ভেবেছি। সেক্ষেত্রে লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে সমুদ্রের পারে উঠবে। তারপর হেঁটে আমাদের জাহাজে গিয়ে উঠবে। মারিয়া বলল। একটু ভেবে নিয়ে শাঙ্কো বলল—আমরা লড়াইয়ে নামলে আবার হয়তো বন্ধুদের কাউকে না কাউকে হারাবো।

—জানি সেটা হতে পারে। কিন্তু যদি তোমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই কর তাহলে আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ওদিকে রাজা পিটারের পাহারাদার সৈন্য বেশি থাকবে না। জাহাজ পাহারার কাজে অল্প সৈন্যই থাকবে। তাদের হারিয়ে দেওয়া খুবই সহজ হবে। আনগেভিনের সৈন্যরা থাকবে তোমরা থাকবে—লড়াইয়ে জেতা কঠিন হবে না। মারিয়া বলল।

—তাহলে এখন আমরা কী করবো? বিস্কো বলল।

—সর্দারকে ডেকে বল—আমরা তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো উঠে দাঁড়াল। একটু গলা চড়িয়ে বলল— ভাইসব—আনগেভিনের সর্দার আমাদের সাহায্য চেয়েছে—আমরা সর্দারকে সাহায্য করবো। ভাইকিংদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। একজন ভাইকিং বলল—শাঙ্কো হঠাৎ মত পালটালে কেন?

—অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম—এখন এটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শাঙ্কো বলল।

—রাজকুমারী এই প্রস্তাবটা দিয়েছেন। বিস্কো বলল।

গুঞ্জন থেমে গেল। রাজকুমারী বলেছেন। কাজেই মেনে নিতেই হবে। আর কেউ কোন কথা বলল না।

শাঙ্কো উঠে দরজার কাছে এল। আঙ্গুল ঠুকে দরজায় শব্দ করল। শাঙ্কো বলল,

তোমাদের সর্দারকে একবার আসতে বলো। খুব দরকার। দরজা বন্ধ হল।

কিছুক্ষণ পরেই সর্দার দরজা দিয়ে ঢুকল। শাঙ্কোদের কাছে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল—তোমরা কী বলতে চাও?

—আমরা আমাদের আগেকার মত পাল্টেছি। আমবা জাহাজ উদ্ধারের কাজে তোমাদের সাহায্য করবো। শাঙ্কো বলল।

—এই তো একটা কাজের মত কাজ। তোমরা দুঃসাহসী তোমরা সঙ্গে থাকলে আমরা লড়াইয়ে জিতবই। সর্দার বলল।

—কিন্তু শর্ত রইল—লড়াই শেষ হলেই আমরা আমাদের জাহাজে ফিরে আসবো। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। এতে আমার কোন আপত্তি নেই। সর্দার বলল।

—তোমরা জাহাজ উদ্ধার করতে কবে যাবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—আজ রাতেই। সময় মত তোমাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে।

—কিন্তু আমাদের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে আমাদের জাহাজে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন যাও। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসো।

—তোমরা কীভাবে জাহাজ দখল করতে চাও? শাঙ্কো বলল।

—তোমাদের জাহাজটা নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু ভেবে দেখলাম জাহাজ নিয়ে গেলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে। আমরা সমুদ্রের জলে সাঁতার কেটে যাবো। সর্দার বলল।

—তাহলে শিরস্ত্রাণ বর্ম পরে যাওয়া যাবে না। শাঙ্কো বলল।

—কেন বলো তো? সর্দার বলল।

—জলে অত ভারি জিনিস পরে সাঁতার কাটতে অসুবিধে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বো। শত্রুপক্ষের জাহাজে উঠে লড়াই করবো কী করে? কাজেই শুধু তরোয়াল নিয়ে আমরা যাবো। শাঙ্কো বলল।

—ঠিকই বলেছো। একটুক্ষণ ভেবে সর্দার বলল।

—আমরা তৈরি থাকবো। তুমি ডাকলেই রওনা হবো। তার আগে আমাদের রাজকুমারীকে আমাদের জাহাজে পৌঁছে দাও। দু'জন বন্ধু সঙ্গে যাবে। তারা তিনজনেই আমাদের জাহাজে থাকবে। শাঙ্কো বলল।

—বেশ। তাহলে তৈরি থেকো। সর্দার বলল। তারপর একজন পাহারাওয়ালাকে হাতের ইশারায় ডেকে বলল—এদের ভালো ঘরটায় নিয়ে যাও। তারপর রাজকুমারী আর দু'জন বন্ধুকে তাদের জাহাজে রেখে এসো।

—বেশ। পাহারাদার শাঙ্কোদের দিকে এসে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—সবাই ওঠো। তোমাদের অন্য ঘরে যেতে হবে। সর্দার তখন চলে গেছে।

ভাইকিংরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। পাহারাদার বলল—রাজকুমারী, এদিকে আসুন। মারিয়া এগিয়ে এল। পাহারাদার বলল—যে দু'জন রাজকুমারীর সঙ্গে

জাহাজে যাবে সেই দু'জনও এগিয়ে এসো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—বিস্কো আর পেড্রো এগিয়ে এসো।

বিস্কো এগিয়ে এসে বলল—না শাঙ্কো—আমি লড়াইয়ে যাবো।

—পাগলামি করো না বিস্কো। তুমি রাজকুমারীর কাছে আমাদের জাহাজে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত মনে লড়াইয়ে যেতে পারবো। বিস্কো ভুলে যেও না আমরা এখনও বন্দী। বিস্কো আর কোন কথা বলল না। পেড্রো এগিয়ে এল। বিস্কোকে বলল—বিস্কো—রাজকুমারীকে ডাকো।

মারিয়াকে আর ডাকতে হল না। মারিয়া বিস্কোর কাছে এসে বলল—চলো।

বিস্কো মারিয়া আর পেড্রোকে নিয়ে কয়েদঘরের বাইরে এল। সেই পাহারাদারটি দাঁড়িয়ে ছিল। পাহারাদার ওদের দেখে হাঁটতে শুরু করল। মারিয়া বিস্কো পেড্রো পাহারাদারের পেছনে পেছনে চলল।

তখন দুপুর হয়েছে। পাহারাদার মারিয়াদের নিয়ে পায়েচলা পথটা ধরল। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে চলল।

একসময় পাহারাদার ডানদিকে ঘুরল। এখানে সেই পায়েচলা পথটা নেই। ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা খাঁড়িটার সামনে এল। দেখল ওদের জাহাজটা শান্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলছে।

পাটাতন পাতাই ছিল। মারিয়ারা পাটাতনের ওপর দিয়ে গিয়ে জাহাজে উঠল। পাহারাদারটি চলে গেল। ঝোপঝাড় গাছের মধ্যে ওকে আর দেখা গেল না।

মারিয়া জাহাজে উঠেই বলল—বিস্কো—আগে খাবারদাবারের ব্যবস্থা কর। খিদেয় পেট জ্বলছে। পেড্রো বলল—রাজকুমারী আপনি শুয়ে বসে বিশ্রাম করুন। আমিই রান্না চাপাচ্ছি।

—তুমি পারবে? মারিয়া বলল।

—আমার বেশির ভাগ সময়ই তো কাটে মাস্তুলের মাথায়। তবু একবার গন্ধ পেলে আমি ঠিক বলে দেব আজকে কী রান্না হচ্ছে। পেড্রো বলল।

—তাই নাকি? মারিয়া এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও পেড্রোর এই গুণ শুনে হেসে ফেলল। পেড্রো হেসে বলল—রাজকুমারী আপনি খুশির হাসি হাসলে আমরা যে কি খুশি হই তা বলে বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আপনার বিষণ্ণ চিন্তাকুল মুখ দেখলে আমরা সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই। কথাটা শুনে মারিয়া আবার হাসল।

—আপনি আপনার কেবিনঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। কথাটা বলে পেড্রো চলল রসুইঘরের দিকে।

ওদিকে ভাঙা ঘরটায় এসে শাঙ্কোরা দেখল ঘরে শুকনো ঘাসপাতা দড়ি দিয়ে নিপুণভাবে বেঁধে বিছানামত করা হয়েছে। তাতেই সৈন্যরা শুয়ে বসে আছে। ঘরটা বেশ বড়। ওপরে ছাদটা এখনও ভেঙে পড়েনি। অনেক খোলামেলা ঘর।

শাঙ্কোরা জায়গা করে নিয়ে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

এখন কিছুই করার নেই। শুধু রাতের জন্যে প্রতীক্ষা।

রাত হল। রাতের খাওয়া তাড়াতাড়িই দেওয়া হল। এঘরে আসার সময় দু'জন পাহারাদার শাঙ্কোদের হাতে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছিল। খোলা হাতেই শাঙ্কোরা রাতের খাবার খেয়ে নিল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। সর্দারের সৈন্যরা শাঙ্কোরা সবাই একে একে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমুলো না কেউ।

রাত গভীর হল।

তখনই সর্দার এল। সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই সর্দারের নির্দেশে অস্ত্রঘরে চলল। সবাই তরোয়াল নিয়ে কোমরে গুঁজল। কাউকে বর্ম শিরস্ত্রাণ পরতে দেওয়া হল না। পাথরের বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল সবাই। পায়েচলা পথটা ধরে চলল।

চাঁদের আলো উজ্জ্বল নয়। বনজঙ্গলের মাথার ফাঁক দিয়ে জ্যোছনা পড়েছে এখানে ওখানে। সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া আসছে। হাঁটতে হাঁটতে শাঙ্কো ওদের দেশীয় ভাষায় গলা চড়িয়ে বলল—এ লড়াই আমাদের লড়াই নয়। পাকেচক্রে এই লড়াইয়ে আমরা জড়িয়ে গেছি। আমরা কাউকে আগ বাড়িয়ে হত্যা করবো না। তবে জীবন বিপন্ন হলে আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা করতেই হবে। আমরা যথাসাধ্য সাবধানে লড়াই করবো যাতে আমরা অক্ষত থাকতে পারি। অপরপক্ষ আমাদের শত্রু নয়। কাজেই জীবন বিপন্ন করে আমরা লড়তে যাবো কেন? আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা—আত্মরক্ষা। শাঙ্কোর কথা বুঝতে না পেরে সর্দার বলল—তোমার বন্ধুদের কী বললে?

—এই—কীভাবে লড়তে হবে। শত্রুপক্ষ বর্ম শিরস্ত্রাণ পরে লড়াই করবে। কাজেই সাবধানে লড়াই করতে হবে। এসব শাঙ্কো বলল।

—সে তো ঠিকই। সর্দার বলল।

সর্দারের সঙ্গে কথা হল না আর। সবাই নিশ্চুপ হেঁটে চলেছে ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।

সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া বইছে। সমুদ্রের শব্দ আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল।

একসময় সমুদ্রের তীরে পৌঁছল সবাই। অল্প জোছনায় দেখল আনগেভিনের জাহাজটা বেশ দূরে সমুদ্রের জলে ভাসছে। কখনও কখনও কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জাহাজটা।

সর্দার বলল—আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে আরো কিছুদুর যাবো। যতটা সম্ভব জাহাজটার কাছাকাছি যাবো। তারপর জলে নেমে সাঁতরে গিয়ে জাহাজে উঠব।

এখানে সমুদ্রের সৈকতে ছোট মাপের বালিয়াড়ি অনেক দূর চলে গেছে। সবাই উঁচু তীর থেকে বালিয়াড়িতে নেমে এল। চলল বালিয়াড়ি দিয়ে।

কারো মুখে কথা নেই। একটানা সমুদ্রের বাতাস শোঁ শোঁ শব্দ তুলে ছুটে

আসছে।

একসময় ওরা জাহাজটার কাছাকাছি এল। —সাঁতরে গিয়ে জাহাজে উঠতে হবে। সর্দার বলল—কোন শব্দ যেন না হয়।

সর্দারের সৈন্যরা ভাইকিংরা জলে নামল। জলে কোনরকম শব্দ না তুলে সবাই সাঁতরে চলল জাহাজটার দিকে।

দূরত্বটা খুব কম নয়। সর্দারের সৈন্যরা হাঁপিয়ে গেল। ভাইকিংরা সমুদ্রের সঙ্গে আজন্ম পরিচিত। সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটা ওদের ছোটবেলা থেকে অভ্যেস।

কয়েকটা নীলচে কুয়াশার আস্তরণ পার হয়ে শাঙ্কোরা সবার আগে জাহাজের কাছে পৌঁছল। দেখল—কেবিনে জানলার সিঁড়ির মাথায় একটা কাচে ঢাকা লণ্ঠন। জাহাজের আর কোথাও আলো নেই।

এবার জাহাজে উঠল। শাঙ্কো জাহাজের হালের কাছে এল। দেখল কিছু দড়িদড়া ঝুলছে। শাঙ্কো হালের খাঁজে পা রেখে উঠে পড়ল। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় শাঙ্কো হাত দিয়ে ঝুলন্ত দড়িদড়া দেখাল।

এবার সবাই দড়ি ধরে ধরে জাহাজে উঠে পড়তে লাগল। হালের দিক থেকে সবাই ডেক-এর কাছে এল। দেখল পনেরো কুড়িজন রাজা পিটারের সৈন্য ডেক-এ ঘুমিয়ে আছে।

সর্দার দু'তিনজন সৈন্যকে কানের কাছে বলল—সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামো। অস্ত্রঘরের সামনে গিয়ে পাহারা দাও যাতে কেউ অস্ত্র আনতে না পারে। সৈন্য ক'জন চলে গেল।

বোঝা গেল—এই জাহাজে বেশি পাহারাদার সৈন্য রাখা হয় নি।

সর্দার হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে বলে উঠল—সব কটাকে হত্যা কর। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেশীয় ভাষায় বলে উঠল—কাউকে হত্যা করো না। জলে ছুঁড়ে ফেল।

রাজা পিটারের সৈন্যদের ঘুম ভেঙে গেল। ডেক-এ যারা ঘুমিয়েছিল তারা ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। নিরস্ত্র তাদের ওপর সর্দারের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যরা অসহায় অবস্থায় মারা যেতে লাগল। আর্ত চিৎকার গোঙানি শোনা যেতে লাগল।

শাঙ্কোরা ধরে ধরে কয়েকজন সৈন্যকে জলে ছুঁড়ে ফেলল।

রাজা পিটারের সৈন্যদের কয়েকজন সিঁড়ি বেয়ে অস্ত্রঘরের কাছে ছুটে এল। দেখল—সর্দারের সৈন্যরা অস্ত্রাগার পাহারা দিচ্ছে খোলা তরোয়াল হাতে। ওরা বুঝল যে প্রাণ সংশয়। তাড়াতাড়ি ওপরে ডেক-এ উঠে এল। ততক্ষণে কেবিনঘর থেকে রাজা পিটারের সৈন্যরা ডেক-এ উঠে এল। উঠেই পড়ল আক্রমণের মুখে। সর্দারের সৈন্যরা ওদের ওপর ঝাঁটিয়ে পড়ল। এলোপাথারি তরোয়াল চালাতে লাগল। রাজা পিটারের সৈন্যরা অসহায় অবস্থায় মারা যেতে লাগল।



ওদিকে ভাইকিংরা রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যদের ধরে ধরে জলে নিক্ষেপ করতে লাগল। যুদ্ধটা হল এক তরফা। নিরস্ত্র সৈন্যদের সঙ্গে সশস্ত্র সৈন্যদের লড়াই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা পিটারের সৈন্যরা হার স্বীকার করল। ওরা দু'হাত ওপরে তুলে ডেক-এর একপাশে দাঁড়াল।

সর্দার চিৎকার করে বলে উঠল—এই ক'টাকেও হত্যা কর। রাজা পিটারের সৈন্যদের মুখ শুকিয়ে গেল। ওরা বুঝল—আর বাঁচার আশা নেই।

তখনই শাঙ্কো এক লাফে রাজা পিটারের সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সর্দারের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখেছি। এখন এই সৈন্যরা যারা আত্মসমর্পণ করেছে তাদের হত্যা করতে চাও। আমরা তা হতে দেব না। যদি রাজা পিটারের নিরস্ত্র সৈন্যদের আক্রমণ করো তবে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবো। সাহস থাকে এগিয়ে এসো।

সর্দার বুঝল—আবার এক লড়াইয়ে নামতে হবে। তাতে বিপদই বাড়বে। জাহাজ দখল করতেই ওরা এসেছিল সেটা তো হয়ে গেছে। সর্দার বলল—ঠিক আছে এদের কয়েদঘরে নিয়ে রাখো।

সর্দারের সৈন্যরা এগিয়ে এল। রাজা পিটারের সৈন্যদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর নিয়ে চলল নিচে নামার সিঁড়ির দিকে। রাজা পিটারের যে সৈন্যরা বেঁচেছিল তাদের সবাইকে কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

এবার সর্দার আস্তে আস্তে শাঙ্কোদের কাছে এল। দেখে বলল—তোমরা এই জাহাজেই থাকবে। আরো কিছু লোক জোগাড় করে সৈন্যসংখ্যা বাড়াবো। তারপর সেন্ট অ্যাঞ্জেলা দুর্গ অধিকার করবো। আনগেভিনকে মুক্ত করবো। তোমরা আমাদের হয়ে লড়াই করবে।

—যদি লড়াই না করি? শাঙ্কো বলল।

—তাহলে তোমাদের কয়েদঘরে আটকে রাখা হবে। সর্দার বলল।

শাঙ্কো, সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে ওদের দেশের ভাষায় বলে উঠল—ভাইসব—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো। জলদি।

ভাইকিংরা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে তরোয়াল গুঁজে রেলিঙ ডিঙিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। সবশেষে দলে শাঙ্কো ছিল। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—তীরের দিকে চলো। জাহাজের সর্দার আর সৈন্যরা বোকার মত তাকিয়ে রইল।

শাঙ্কো সাঁতার কাটতে লাগল। তখনই সূর্য উঠল। গাঢ় কমলা রং সূর্যের। সমুদ্রের ঢেউ-ওঠা জলে সূর্য প্রথমেই সবটা উঠল না। নিচের দিকে একটা ফোঁটামত জলের মধ্যে আটকে রইল। একটু পরে সেটা ওপরে উঠে সূর্যের সঙ্গে মিশে গেল।

শাঙ্কোরা সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

সমুদ্রতীরে যখন শাঙ্কোরা পৌঁছল তখন সবাই হাঁপাচ্ছে। জল থেকে উঠে অপরিসর সৈকতে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল—এবার আমাদের জাহাজের দিকে চলো।

অপরিসর সৈকতভূমি দিয়ে শাঙ্কোরা হেঁটে চলল। কিছুটা গেল। আর সৈকতভূমি নেই। শাঙ্কোরা তীরে উঠল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ওরা ওদের জাহাজের দিকে লক্ষ্য রেখে চলল।

একসময় শাঙ্কোরা ঝোপজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ওদের জাহাজের কাছে এল। পাতা পাটাতন দিয়ে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠল।

মারিয়া আর বিস্কো ছুটে এল। পেছনে পেড্রো। সবাই ধ্বনি তুলল-ও-হো-হো।

শাঙ্কোরা কেবিনঘরে চলে গেল। ভেজা পোশাক ছাড়তে।

শুকনো পোশাক পরে শাঙ্কো ডেক-এ উঠে এল। মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—এখন কী করবে?

—আমরা জাহাজটা চালিয়ে খাঁড়ির আরো ভেতরে চলে যাব। জাহাজ লুকিয়ে রাখবো। তারপর ফ্রান্সিসদের জন্যে অপেক্ষা করবো।

শাঙ্কো সবাইর দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল—সবাই হাত লাগাও। পাল তুলে দাও। দাঁড়ঘরে দাঁড় টানতে যাও। আমরা এই খাঁড়ির আরো ভেতরে চলে যাবো যাতে আমাদের জাহাজ কারো নজরে না পড়ে।

পাল তোলা হল। দাঁড় বাওয়া চলল। জাহাজ খাঁড়ির আরো ভেতরে ভেসে চলল।

একসময় খাঁড়ির দু'ধারের গভীর বনের গাছপালা দু'পাশ থেকে ঝুঁকে পড়েছে দেখা গেল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে পেড্রোকে বলল—পেড্রো মাস্তুলে উঠে দেখ তো জাহাজটা বনজঙ্গলের আড়ালে পড়েছে কি না।

পেড্রো দ্রুত মাস্তুল বেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গেল। চারপাশ দেখে নেমে এল। একটু হাঁপিয়ে বলল—আমাদের জাহাজটা দু'পাশের জঙ্গলে একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। কারো নজরে পড়বে না।

জাহাজটা ওখানেই নোঙর ফেলল। এবার ফ্রান্সিসদের জন্যে প্রতীক্ষা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি ফিরে এলেই জাহাজ ছাড়া হবে ওদের দেশের দিকে।

এখন শুধুই প্রতীক্ষা। এখন আলগেভিন আর রাজা পিটারের সৈন্যরা ওদের খোঁজ পাবে না।

ওদিকে গির্জাটা ভালো করে দেখে ফ্রান্সিস হ্যারি সান্জিও গির্জার বাইরে এল। সান্জিও বললেন—রাজা পিটার আমাদের চার্লসের প্রাসাদেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

—ভালোই হয়েছে। এতে আমাদের খোঁজাখুঁজির কাজ ভালোভাবেই চলবে। ফ্রান্সিস বলল।

তিনদিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা চার্লসের প্রাসাদেই রইল। অঢেল সুস্বাদু খাবার। বড় পালঙ্কের শয্যায় শোয়া। ফ্রান্সিসদের সময় ভালোভাবেই কাটতে লাগল। কিন্তু ফ্রান্সিসের নজর নেই এইসব বিলাসবহুল জীবনের প্রতি। ও সর্বক্ষণ নিজের চিন্তায় বিভোর। ওর দৃঢ় বিশ্বাস চার্লস কোথাও না কোথাও গুপ্ত ধনসম্পদের সূত্র রেখে গেছেন। ওরা সেই সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না। ফ্রান্সিস প্রাসাদের সর্বত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু সূত্র হিসেবে কাজে লাগে এমন কিছুই খুঁজে পেল না।

গ্রন্থাগারের প্রাচীন গ্রন্থগুলো শুধু—পাতা উল্টে-ই দেখল ফ্রান্সিস। গ্রীক আরবী ভাষায় লেখা সেসব গ্রন্থ ও কী বুঝবে। শুধু প্রাচীন গ্রীক ভাষায় লেখা বাইবেলটার পাতা উল্টে ভালো করে দেখেছে—অনেক জায়গায় দাগ দেওয়া। বোঝাই যাচ্ছে—চার্লস খুব মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়েছেন। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে অনেকে মনে শান্তি পান। হয়তো চার্ললও মনের শান্তি পেয়েছেন। সাজ্জিও চার্লসের শেষ দিককার জীবনের কথা বলেছেন। গির্জায় প্রার্থনা করেই সময় কাটতো তাঁর। নিশ্চয়ই যীশুর বাণীর মধ্যে তিনি সান্ত্বনা পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। পালিতা কন্যার মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল।

গির্জাটায় ফ্রান্সিস হ্যারি ঘুরে বেড়িয়ে দেখছিল। গির্জাটার পাথুরে দেওয়ালে কোথাও কোথাও কুঁদে কুঁদে ফুল পাতা পাখির ছবি তোলা হয়েছে। সবচেয়ে জমকালো সুন্দর কাঠের বেদীটা। ঐ বেদীতেই বসানো যীশুর মূর্তি। বেদীতে সূক্ষ্ম নক্শার কাজ।

ফ্রান্সিস কাঠ কুঁদে তোলা বেদীর নক্শাগুলো ভালো করে দেখছিল। সাধারণ নক্শা যেমন হয়। ফুল পাতা পাখি লতাগাছ। দেখতে দেখতে সেই লেখাটায় চোখ পড়ল। বাইবেল থেকে উধৃতি। সাজ্জিও পড়ে অর্থটা বলেছিলেন। বড় গভীর অর্থ উপদেশটির। ডানদিকেও আর একটি উধৃতি। উধৃতি দুটো দেখতে দেখতে হঠাৎ ফ্রান্সিসের মনে হল উধৃতি দু'টোর মাঝখানে লতাফুল পাতা দিয়ে যেন দু'টো চোখ খোদাই করা হয়েছে। ফ্রান্সিস মাথা নিচু করে কাছে গিয়ে দেখল সত্যিই একজোড়া চোখ। ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখাল। হ্যারিও মুখ নিচু করে কাছ থেকে ভালো করে দেখে বলল—ফ্রান্সিস তোমার অনুমান ঠিক। একজোড়া চোখ খোদাই করা হয়েছে। এমনিতে দেখলে ফুল পাতালতা মনে হবে। ভালো করে দেখলে তবেই বোঝা যাবে।

ফ্রান্সিস বলল—দাঁড়াও—সাজ্জিওকে ডেকে আনি। ফ্রান্সিস চলে গেল। একটু পরে সাজ্জিওকে নিয়ে ফিরে এল।

সাজ্জিও বেদীর কাছে আসতে আসতে বলল—

—আপনারা ভুল দেখেছেন। আমি অনেকদিন এই নকশাগুলো দেখেছি। একজোড়া চোখ আমি কোনদিন দেখিনি।

—তবু—আজকে এই জায়গাটা ভালো করে দেখুন। বলে ফ্রান্সিস আঙ্গুল দিয়ে

সেই জায়গাটা দেখাল। সাজ্জিও খুব কাছে গিয়ে দেখতে দেখতে বলল— আশ্চর্য! সত্যিই একজোড়া চোখ খোদাই করা হয়েছে। কিন্তু এই চোখের সঙ্গে চার্লসের ধনসম্পদের সম্বন্ধ।

—নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে—ফ্রান্সিস বলল—এবার আপনি বলুন তো এই সব কিছুই কি চার্লসের নির্দেশেই তৈরি হয়েছে?

—হ্যাঁ—চার্লসের তত্ত্বাবধানেই এই গির্জার সব কিছু নির্মিত হয়েছে। সাজ্জিও বললেন। ফ্রান্সিস বলল—এবার বলুন তো এই চোখ জোড়াকে কেন্দ্র করে কি কোন উধৃতি লেখা আছে। সাজ্জিও ভালো করে চোখ জোড়াটা দেখলেন। বললেন —না—কিছু লেখা নেই।

—ঠিক আছে—ফ্রান্সিস বলল—মানুষের চোখ নিয়ে বাইবেলে কোন বাণী আছে?

—থাকতে পারে বৈ কি। সাজ্জিও বললেন।

—তেমন কোন বাণী কি আপনার মনে আসছে? ফ্রান্সিস বলল। সাজ্জিও চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে বলে উঠলেন—একটি বাণী আছে।

—সেটা কী? ফ্রান্সিস জানতে চাইল। সাজ্জিও বললেন—বাণীটির অর্থ হল —"তোমার চোখই হল অন্তর আত্মার প্রদীপ। তোমার চোখের দৃষ্টি যদি নির্মল হয় তবে তোমার সমস্ত সত্তা দীপ্তিময় হবে।" সাজ্জিওর কথাটা শেষ হতেই ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলে উঠল—সাজ্জিও হ্যারি—এই বেদীর মধ্যেই আছে চার্লসের গুপ্ত ধনসম্পদ।

সাজ্জিও বলে উঠলেন—এটা আপনার কেন মনে হল?

—দেখুন সাজ্জিও—ফ্রান্সিস বলতে লাগল—আমার প্রথম থেকেই নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল—চার্লস প্রতিষ্ঠিত এই গির্জা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চার্লস তাঁর ধনসম্পদ গোপনে রেখেছেন। তিনি তার জন্যে এই গির্জাকেই বেছে নিয়েছেন। সূত্র রেখেছেন বাইবেলের তৃতীয় উধৃতির মধ্যে। সেটা তিনি এখানে লেখান নি। যাঁরা প্রকৃত যীশুভক্ত তাঁদের কারো না কারো নজরে এই চোখ দুটো পড়বেই। সঙ্গে সঙ্গে যীশুর উপদেশবাণীও মনে পড়বে। খোদাই করা জোড়া চোখের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারবেন। এতদিন সেটা কেউ বোঝেন নি। আজ আমরা বুঝলাম।

—তাহ'লে তো বেদী ভেঙে দেখতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। রাজা পিটারও রাজি হবেন না। সাজ্জিও বললেন।

—বেদী ভাঙা হোক এটা চার্লসও চান নি। কাজেই তিনি সহজ পথটাই রেখেছেন।—এই খোদাই করা চোখ জোড়া। ফ্রান্সিস বলল। তারপর দুটো আঙুল চোখ জোড়ায় রেখে একটু চাপ দিল। চোখ জোড়া খসে পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা চোখের ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাল। অন্ধকার। কিছুই নজরে পড়ছে না।

—কিছু দেখতে পাচ্ছেন? সাজ্জিও বললেন।

—অন্ধকারটা একটু সয়ে আসার সময় দিন। ফ্রান্সিস বলল।

সময় বয়ে চলল। ফ্রান্সিস তাকিয়েই আছে। আস্তে আস্তে ভেতরের অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতে ফ্রান্সিস আবছা একটা সোনার রত্নখচিত হারের অংশ দেখতে পেল। চোখ সরিয়ে ফ্রান্সিস বলে উঠল—সান্ডিও—আমার অনুমান নির্ভুল। আপনি তাকিয়ে দেখুন। সান্ডিও চোখের মত ফোকরটায় চোখ রাখলেন। অন্ধকারটা সয়ে আসতে তিনিও সেই রত্নখচিত হারের একাংশ দেখতে পেলেন। চোখ সরিয়ে এনে সান্ডিও বললেন—ঠিক। রত্নখচিত সোনার হার। কিন্তু শুধু একটা হারই কি চার্লসের সব ধনসম্পদ।

—না—আরো আছে। এই কথা বলে ফ্রান্সিস দুটো চোখের ফোকরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটু টান দিতেই একটা লম্বাটে কাঠের অংশ উঠে এল। লম্বাটে ফোকর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনিমুক্তোখচিত সোনার অলঙ্কার সোনার চাকতি বেরিয়ে এসে গির্জার মেঝেয় পড়তে লাগল। সান্ডিও এই দেখে হতবাক হয়ে সেই অলঙ্কার সোনার চাকতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে ফ্রান্সিসকে বললেন—ফ্রান্সিস—আপনার অসাধারণ অনুমানশক্তির কী বলে প্রশংসা করবো বুঝতে পারছি না।

—ওসবের প্রয়োজন নেই। আপনি এখন এখানে পাহারায় থাকুন। আমরা যাচ্ছি। গাইদাকে দিয়ে রাজা পিটারের কাছে চার্লসের গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারের কথা জানাচ্ছি। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি আস্তে আস্তে গির্জার দরজার দিকে চলল। ওরাতো এরকম ধনসম্পদ উদ্ধার আগেও করেছে। ওরা অভ্যস্ত। তাই সান্ডিওর মত ওরা আশ্চর্য হয়ে যায় নি।

চার্লসের প্রাসাদে এল দু'জনে। গাইদার ঘরে ঢুকে দেখল গাইদা কী লিখছে। হ্যারি বলল—গাইদা এখন সব কাজ রেখে একটা অত্যন্ত দরকারি কথা শুনুন। চার্লসের ধনসম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। কথাটা শুনে গাইদা হাঁ মুখ করে ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—কী? বিশ্বাস হচ্ছে না?

—অ্যাঁ—না—না—মানে—গাইদা আর কথা বলতে পারল না।

—গির্জায় যান। নিজের চোখেই সব দেখুন। তারপর রাজা পিটারকে সংবাদ পাঠান। এখন এটাই আপনার কাজ। হ্যারি বলল।

গাইদা আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটল ঘরের বাইরে। তারপর গির্জাটার দিকে।

গির্জায় ঢুকে দেখল বেদীর কাছে সান্ডিও বোকার মত দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে মেঝেয় পড়ে আছে বহু মূল্যবান কিছু অলঙ্কার সোনার চাকতি স্বর্ণমুদ্রা। গাইদা হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সান্ডিও এবার বললেন—আপনি যান। প্রথমে কয়েকজন পাহারাদার সৈন্যকে এখানে পাঠান। তারপর মহামান্য রাজা

পিটারকে সংবাদ পাঠান যে চার্লসের ধনসম্পদ ফ্রান্সিস আবিষ্কার করেছেন। তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব এখানে চলে আসেন।

তখন বিকেল। রাজা পিটার আর সেনাপতি মান্দো ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হলেন। সাঙ্কিও গির্জার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজা পিটার আর মান্দো ঘোড়া থেকে নামলেন। সাঙ্কিও তাঁদের গীর্জার মধ্যে নিয়ে এলেন। সাঙ্কিওর নির্দেশে পাহারাদার সৈন্যরা বেদীর ফোকর থেকে সব হীরে মুক্তো বসানো বহু মূল্যবান গয়নাগাটি সোনার মুদ্রা আর চাকতি বের করে বেদীর ওপর সাজিয়ে রেখেছিল।

রাজা পিটার বেদীর ওপর রাখা সব স্বর্ণসম্পদ অবাক চোখে দেখতে লাগলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করা যাবে।

সাঙ্কিও তখন মৃদুস্বরে রাজা পিটারকে বুঝিয়ে বললেন—কী করে যীশুর একটা উপদেশকে ভিত্তি করে ফ্রান্সিস গুপ্ত স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছে। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন—যান—ফ্রান্সিসকে ডেকে আনুন।

একটু পরে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রান্সিস এল। রাজা পিটার হেসে ফ্রান্সিসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। ফ্রান্সিস হেসে রাজা পিটারের হাত ধরলেন। রাজা পিটার বললেন—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কী বলে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না।

—তার দরকার নেই মহামান্য রাজা—হ্যারি বলল—ফ্রান্সিস এর আগেও অনেক গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করেছে।

—তোমরা চিন্তা করে পরিশ্রম করে এই স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছো। গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কিছু অংশ তো তোমাদের প্রাপ্য হয়। রাজা পিটার বললেন।

—একটি স্বর্ণমুদ্রাও আমরা নেব না। এই ধনসম্পদ আপনার দেশের মানুষের। ফ্রান্সিস বলল।

—তবু বলো—তোমরা কী চাও? রাজা পিটার বললেন। —আমি আমার বন্ধুদের মুক্তি চাই। ফ্রান্সিস বলল। রাজা হেসে বললেন—তোমার অনুরোধের আগেই তোমার বন্ধুরা নিজেরাই দুর্গের দেয়াল ডিঙিয়ে পালিয়েছে।

—সে কি। কেউ মারা যায় নি তো? হ্যারি বলল। রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন—আর সব খবর মান্দো বলবেন। মান্দো বলল—আপনার বন্ধুরা গভীর রাতে দুর্গ থেকে পালিয়েছে। এই সংবাদ আমরা ভোরবেলা পেয়েছিলাম। ধরেই নিয়েছিলাম সবাই নিশ্চয়ই আপনাদের জাহাজেই আশ্রয় নিয়েছে। আমরা সমুদ্রতীরে ছুটে গেলাম। কিন্তু কোথাও আপনাদের জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই। আপনার বন্ধুরা আমাদের পাহারাদারদের সঙ্গে লড়াই করে নি। সবাইকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কাজেই তাদের মারা যাওয়া বা আহত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হল যে শাঙ্কোরা পালিয়েছে। বুদ্ধিমানের মত কোন লড়াইয়ে

নামে নি।

ফ্রান্সিস বলল—মাননীয় রাজা—আমরা ঠিক জানি আমাদের বন্ধুরা সমুদ্রের কাছাকাছি কোথাও আছে। ওরা অপেক্ষা করছে আমি চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করতে পেরেছি কিনা এটা জানতে।

—হতে পারে। রাজা বললেন।

ফ্রান্সিস বলল—আপনাদের সম্পদ তো উদ্ধার হল। আমরা এবার সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গের দিকে যাবো। সমুদ্রতীরে খোঁজাখুঁজি করতে হবে।

হ্যারি বলল—মাননীয় রাজা আমাদের জন্যে যদি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন তাহ'লে খুবই উপকার হয়।

রাজা পিটার সেনাপতি মান্দোকে বললেন গাড়ির কথা।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি গির্জার দরজার দিকে চলল। সাজ্জিও ওদের পেছনে পেছনে এলেন। দরজার বাইরে আস্তে এগিয়ে এসে ফ্রান্সিসের হাত দুটো ধরলেন। বললেন—এত মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করলেন অথচ সম্পদের কিছুই দাবি করলেন না— এতে আমি অবাক হয়ে গেছি। মানুষ যখন যে ভাবে হোক ধনী হতে চায় আপনি তখন এত নির্লিপ্ত। এরকম মানুষ আমি দেখিনি। ফ্রান্সিস হেসে বলল—সাজ্জিও—আমি মুখ্খুসুখ্খু মানুষ। বাইবেল পড়ি নি। তবে কখনো সখনো বাইবেল পড়া শুনেছি। প্রভু যীশুর একটা উপদেশ আমার খুব ভালো লাগে।

—কোন উপদেশটা? সাজ্জিও বললেন।

—সেই উপদেশটা—সূচের ফুটো দিয়ে বরং উট চলে যাবে তবু ধনীরা স্বর্গে ঈশ্বরের রাজ্যে যেতে পারবে না।

—সাবাস ফ্রান্সিস—সাজ্জিও বলে উঠলেন—আপনি যীশুর উপদেশ নিজের জীবনেও মেনেছেন ঠিক চার্লসের মত।

—ঠিক। তাই আমার বরাবর মনে হয়েছে—চার্লসের স্বর্ণ সম্পদ রয়েছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত এই গির্জার কোথাও। ফ্রান্সিস বলল। তারপর সাজ্জিওর হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল।

বেশ জমকালো একটা দুঘোড়ায় টানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। বোঝাই যাচ্ছে—রাজপরিবারের গাড়ি।

গাড়িতে চড়ে ফ্রান্সিস আর হ্যারি অ্যাঞ্জেলো দুর্গে যখন এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত।

ওরা সেই রাতটা দুর্গেই কাটাল। দুর্গাধ্যক্ষ ওদের খুব আদর যত্ন করল। ততক্ষণে সারা মাল্টাই জেনে গেছে চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধারের কাহিনী আর ফ্রান্সিসের কথা।

পরদিন। নিজেদের ঘরেই তখন ফ্রান্সিস আর হ্যারি সকালের খাবার খাচ্ছে। গোল রুটি আর সব্জির ঝোল। তখনই একজন খ্রীস্টান সাধু দোরগোড়ায় এসে

দাঁড়াল। মুখে দাড়ি গোঁফ। সাধু বলল, 'আর্ত ক্ষুধার্ত. হ্যারি বলল—নিশ্চয়ই আসুন। যারা খাবার দিয়েছিল সেই সৈন্যদের হ্যারি আরো খাবার দিতে বলল।

তিনজনেই খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল—হ্যারি এখন আমাদের জাহাজের খোঁজ পাবো কী করে।

—চলো—সমুদ্রতীরে যাই। খোঁজখবর করি। হ্যারি বলল।

—তাই চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসে বলল। সাধুটি তখনও বসে আছে। ফ্রান্সিস বলল—তা সাধুবাবা—আপনার খাওয়া তো হয়েছে। এবার কী করবেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবো। সাধু গম্ভীর মুখে বলল।

—কোথায়? হ্যারি বলল।

—আপনাদের জাহাজে। সাধু বলল একই ভঙ্গীতে।

—এ্যাঁ? হ্যারি তো চমকে উঠল। ফ্রান্সিসও। সাধুবাবা বলছে কি।

—আপনি কী করে আমাদের জাহাজের কথা জানলেন। হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—সেটা পরে জানবেন—সাধু বলল—যদি নিজেদের জাহাজে যেতে চান তাহলে এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন।

—বেশ চলুন। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। হ্যারিও তৈরি।

—ঠিক তখনই দুর্গাধ্যক্ষ ঘরে ঢুকল। হেসে বলল—

—আপনাদের ঘুমুতে কোন অসুবিধা হয় নি তো?

—না না। ফ্রান্সিস বলল।

—সকালের খাবার খেয়েছেন তো? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—হ্যাঁ। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ একটু বেড়াবোটেরাবো। ফ্রান্সিস্ বলল।

—এখন বাইরে যাবেন? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—সঙ্গে লোক দেব? দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

—না-না। ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারি বলল চলো। এবার সাধুকে দেখিয়ে হ্যারি দুর্গাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করল—

—ইনি কে?

—তা তো জানি না। উনি গত কয়েকদিন ধরেই এখানে সকালে সন্ধ্যেয় আসছেন। খেয়েটেয়ে চলে যান। দুর্গাধ্যক্ষ বলল।

ফ্রান্সিস হ্যারি আর কোন কথা বলল না। দুর্গের বাইরে চলে এল। পেছনে সেই সাধু। সাধুকে হ্যারি জিজ্ঞেস করল এবার কোন দিকে যাবো? সাধু হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। আরে? এতো বিস্কোর গলা। বিস্কো নিজেই আবার গোঁফ দাড়ি-টান দিয়ে খুলে ফেলল। ফ্রান্সিসকে হ্যারিকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হাসতে হাসতে বলল—এই সাধুর বেশ নিয়েছিলে কেন? বিস্কো বলল—প্রতিদিন দুবেলা দুর্গে

আসতাম তোমাদের খোঁজ নিতে। খোঁজ মানে তোমাদের কথা কাউকে জিজ্ঞেস করতাম না। শুধু দুর্গের ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। সাধুর বেশে। কাজেই কেউ কিছু বলতো না।

—আর আমাদের ভয় নেই। ফ্রান্সিস চার্লসের স্বর্ণসম্পদ উদ্ধার করেছে। হ্যারি বলল।

—তাই দুর্গাধ্যক্ষের এত আদর আপ্যায়নের ঘটা। বিস্কো বলল।

—কেন? তোমরা এই খবর পাও নি? ফ্রান্সিস বলল।

—না তাই তো এই বেশ ধরে আসতাম। বিস্কো বলল।

এবার বিস্কো ফ্রান্সিস আর হ্যারিকে নিয়ে একটা বনভূমিতে ঢুকল। বেশ ঘন বন। গাছগাছালির জটলা। তারই মধ্যে দিয়ে ওরা চলল।

বনের শেষে দেখল সমুদ্রের খাঁড়ি। ওদের জাহাজে সেই খাঁড়িতে ভাসছে। তীর থেকেই বিস্কো চিৎকার করতে লাগল—ভাইসব—ফ্রান্সিস, হ্যারি ফিরে এসেছে। ফ্রান্সিস চার্লসের গুপ্ত স্বর্ণভাণ্ডার উদ্ধার করেছে। রাজা পিটার আর আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

বিস্কোর চিৎকার করে কথা বলা জাহাজের বন্ধুরা শুনল। সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল রেলিঙ ধরে। তার মধ্যে মারিয়াও আছে।

জাহাজ থেকে একটা নৌকা জলে ভাসানো হল। দাঁড় বাইতে বাইতে নৌকা পারের কাছে নিয়ে এল শাঙ্কো। ফ্রান্সিসরা নৌকায় উঠল। নৌকো গিয়ে জাহাজে লাগল। দড়ির মই ফেলা হল। ফ্রান্সিসরা মই বেয়ে ডেক-এ উঠে এল। জাহাজে ফ্রান্সিসকে নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো—।

মারিয়া হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল মারিয়ার চোখ মুখ কেমন শুকিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া তোমার শরীর ভালো আছে তো?

—বেশ ভালো। আমার জন্যে ভেবো না মারিয়া হেসে বলল।

—না— মারিয়া—তোমার শরীর ভালো নেই। তুমি যদি বলো তাহ'লে আর কোথাও আমরা নামবো না। জাহাজ চালিয়ে সোজা দেশে ফিরে যাবো। ফ্রান্সিস বলল।

—ওসব পরে ভেবো। এখন খাবে চলো। মারিয়া বলল।

—রাজকুমারী—আমরা আনজুতে রাজার হালে ছিলাম। আমাদের কোন কষ্ট হয় নি। হ্যারি হেসে বলল।

ফ্রান্সিস বলল—মারিয়া এবারও আমার হাত খালি। মূল্যবান কিছুই আনতে পারিনি।

—তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। মারিয়া বলল। জাহাজে আবার ধ্বনি উঠল—ও—হো—হো।

রূপোর চাবি

রূপোর চাবি

পরিষ্কার আকাশ। বাতাসও বেগবান। ফ্রান্সিসদের জাহাজ দ্রুতগতিতে চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে। জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। কাজেই দাঁড় টানতে হচ্ছে না। ভাইকিংরা ডেকের এখানে-ওখানে শুয়ে বসে আছে। গোল হয়ে বসে ছক্কা-পাঞ্জা খেলছে। আর একদল বসে নিজেদের মধ্যে দেশবাড়ির গল্প করছে। সকলের মধ্যেই বেশ একটা ছুটির মেজাজ।

ফ্রান্সিসের কেবিনঘরে ফ্রান্সিস বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। মারিয়া সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ করছে বিছানায় বসে।

হ্যারি কেবিনঘরে ঢুকল। ওকে দেখে ফ্রান্সিস উঠে বসল। হ্যারি বিছানায় বসতে বসতে বলল, ফ্রান্সিস, এবার কী করবে?

—তোমরা সবাই তো দেশে ফেরার জন্যে আকুল। কাজেই ফ্রেজারকে বলেছি উত্তরমুখো চালাও। ফ্রান্সিস বলল।

সে তো হলো, হ্যারি বলল, কিন্তু কোথায় এলাম, আমাদের দেশই বা কত দূরে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মারিয়া বলল, দেখ হ্যারি, আমার যা জ্ঞানগম্যি তাতে বুঝেছি আমরা জিব্রালটার প্রণালী পার হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছি।

—সেটা বুঝলে কী করে? ফ্রান্সিস বলল।

—খুব সহজে। লক্ষ্য করলে বুঝবে গত ক'দিন জাহাজের দুলুনি খুব বেড়ে গেছে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলটা অনেক শান্ত। তাই জাহাজের দুলুনি খুব বেশি ছিল না। মারিয়া বলল।

—তাহলে রাজকুমারী, আমরা কি স্পেনের কাছাকাছি এসেছি? হ্যারি বলল।

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। তবে এই এলাকায় কোনো দ্বীপ নেই। ডাঙা পেলেই বুঝবো কোনো দ্বীপ নয়, স্পেনে এসেছি। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস বলল, একবার চলো তো ফ্রেজারের কাছে যাই। ও কী বলে শুনি।

হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

মারিয়া ওর সেলাই-ফোঁড়াইয়ের জিনিসপত্র একটা চামড়ার থলিতে রাখতে রাখতে বলল, আমিও যাবো। সূর্যাস্ত দেখবো।

তিনজনে একটু পরেই ডেক-এ উঠে এল। চলল জাহাজচালক ফ্রেজারের কাছে। ফ্রেজার হুইলে হাত রেখে সামনে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফ্রান্সিস বলল, ফ্রেজার, আমরা কোথায় এলাম সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারছো?

—আমরা ভূমধ্যসাগর থেকে বেরিয়ে এসেছি এটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ডাঙার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। ফ্রেজার বলল।

—এখন তো তাহলে শুধু জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। হ্যারি বলল।

—হ্যাঁ। ফ্রেজার বলল, উত্তর দিকটা ঠিক রেখে জাহাজ চালিয়ে যাওয়া। হ্যারি বলল।

ফ্রেজারের সঙ্গে কথা বলে তিনজনে ফিরে এসে রেলিং ধরে দাঁড়াল। পশ্চিম দিকে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের আলোর গভীর কমলা রঙ মাঝ আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই রং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও রইল। তারপর আস্তে আস্তে রঙ মুছে গেল। সন্ধ্যা নেমে এল।

সেদিন ভোর ভোর সময়ে নজরদার পেড্রোর চড়া গলা শোনা গেল, ডাঙা, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। যে ভাইকিংরা ডেকে শুয়েছিল তারা উঠে বসল। একজন ছুটল ফ্রান্সিস হ্যারিকে খবর দিতে।

একটু পরেই ফ্রান্সিস আর হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। পেছনে মারিয়াও এল। ওরা রেলিং ধরে দাঁড়াল। ভোরের নরম রোদে উত্তর দিকে দেখা গেল একটা বন্দর। বেশ কয়েকটা জাহাজ নোঙর করে আছে। জাহাজগুলোতে নানা রঙের বিভিন্ন দেশের পতাকা উড়ছে।

ফ্রান্সিস বলল, হ্যারি, আমরা বন্দরে জাহাজ ভেড়াবো না। এখানেই নোঙর করবো। শুধু শাঙ্কো নৌকোয় চড়ে বন্দরে যাবে। এটা কোন দেশের কোন বন্দর, লোকজন কেমন—এসব জেনে আসবে।

ফ্রান্সিসরা কথা বলছে, তখনই দুই রাঁধুনি ভাইকিং ফ্রান্সিসদের কাছে এল। বলল, খাদ্য আর জল ফুরিয়ে এসেছে। এই বন্দর থেকেই খাদ্য আর জল নিতে হবে। নইলে কখন ঝড়বৃষ্টিতে জাহাজ কোনদিকে চলে যাবে। আবার কোনো বন্দর পাওয়া যাবে কিনা কে জানে।

ফ্রান্সিস একটু ভেবে বলল, কথাটা ঠিক। তখন অনেক ভাইকিং বন্ধু ফ্রান্সিসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে ডাকল। বলল, শাঙ্কো, তুমি একা নৌকোয় চড়ে বন্দরে যাও। সব জেনে এসো। যথেষ্ট খাদ্য আর জল পাবো কিনা সেটাও জেনে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো তৈরি হয়ে নিল। দড়ির মই বেয়ে নৌকোয় নেমে নৌকো ছেড়ে দিল। শাঙ্কো শুধু ছোরাটা জামার নিচে নিয়েছে। তরোয়াল নিতে ফ্রান্সিস মানা করেছে। তাই তরোয়াল নেয়নি।

ততক্ষণে ঘরঘর শব্দে নোঙর ফেলা হয়েছে। ফ্রান্সিসদের জাহাজ থেমে রইল। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে লাগল।

রেলিং ধরে ফ্রান্সিসরা অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে দূরে শাঙ্কোর নৌকো আসছে দেখা গেল। ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শাঙ্কোর নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবতে লাগল, আমাদের বিপদ হতে পারে এমন কিছু হলে শাঙ্কো নিশ্চয়ই নৌকোয় উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্কেত করবে। কিন্তু দেখা গেল শাঙ্কো আস্তে আস্তে ঢেউয়ের ধাক্কা বাঁচিয়ে নৌকো চালিয়ে আসছে।

জাহাজে নৌকো বেঁধে শাঙ্কো দড়ির মই বেয়ে ডেকে উঠে এল। ভাইকিং বন্ধুরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে শাঙ্কো বলল, এটা স্পেনের দক্ষিণ ভাগ। বন্দরটার নাম ক্যামেরিনাল। এখানকার রাজার নাম গার্সিয়া। এখানে যথেষ্ট খাদ্য আর জল পেতে কোনো অসুবিধে নেই। রাজার যোদ্ধারা কেউ কেউ আমাকে দেখেছে। বুঝেছে আমি বিদেশী। তবু কিছু বলেনি।

এবার ফ্রান্সিস বলল, শাঙ্কো তুমি বিস্কো আর রাঁধুনি বন্ধুদের নিয়ে যাও। খাদ্য-জল আনার জন্যে বস্তা-পীপে সব নাও। সঙ্গে যে নৌকোটা নেবে সেটাতেই থাকবে এসব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কোরা একটা নৌকোয় চড়ে অন্য একটা নৌকো দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে ক্যামেরিনাল বন্দরের দিকে চলল।

দুপুরের একটু আগেই শাঙ্কোরা ফিরে এল। খাদ্য-জল সব রসুইঘরের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। ফ্রান্সিস মনে মনে বলল, যাক—কয়েক মাসের জন্যে নিশ্চিন্ত।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ভাইকিং বন্ধুরা ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, ফ্রান্সিস, এখানে পড়ে থেকে শুধু দেরিই হবে। জাহাজ বিকেলেই ছেড়ে দিতে বলো।

ফ্রান্সিস বলল, ঠিক আছে। ফ্রেজারকে গিয়ে বলো আমি বলেছি বিকেলে জাহাজ ছেড়ে দিতে।

বন্ধুরা খুশিতে ছুটল ফ্রেজারকে কথাটা বলতে।

সূর্যাস্ত হবার আগেই জাহাজের নোঙর তোলা হলো। ভাইকিংরা পালের দড়িদড়া ঠিক করল। জোর বাতাসে পালগুলো ফুলে উঠল। জাহাজ পূর্ণবেগে বড় বড় ঢেউ ভেঙে চলল।

তীরভূমির কাছ দিয়েই জাহাজ চলল।

দু' দিন পরেই জাহাজ এল কাদিজ বন্দরে। এখন ফ্রান্সিসরা অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওরা কাদিজ বন্দরের জাহাজঘাটায় জাহাজ নোঙর করল। কাদিজ বেশ বড় বন্দর। অনেক জাহাজ জাহাজঘাটায় নোঙর করে আছে।

ফ্রান্সিস ডেক-এ দাঁড়িয়েছিল। বিস্কো ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল, এই কাদিজ বন্দর বেশ বড়। এখানে জাহাজ মেরামতি করা যাবে। দু'দিন থেকে আমাদের জাহাজের মেরামতির কাজটা সেরে নাও। এখনও এই জাহাজে চড়ে আমাদের অনেকদূর যেতে হবে।

বেশ তাই করো, ফ্রান্সিস বলল।

দু'দিন মেরামতির কাজটাজ চলল। সেদিন সন্ধেবেলা মারিয়া বলল—চলো কাদিজ নগরবন্দরটা দেখে আসিঋ

—অচেনা অজানা জায়গা—এখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? ফ্রান্সিস বলল।

—আমরা তো একটু ঘোরাঘুরি করবো। তারপর রাত বেশি হওয়ার আগেই চলে আসবো। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে চলো। দিনরাত শুধু সমুদ্রের জল দেখে দেখে তোমার একঘেয়ে লাগারই কথা। চলো শাঙ্কোকেও নিয়ে যাবো। তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি শাঙ্কোকে ডাকতে যাচ্ছি।

মারিয়া ওর ভাঙা আয়নাটা নিয়ে বসল। নিজের মুখ দেখে বুঝল—ওর মুখের দুধে আলতার রং এখন তামাটে হয়ে গেছে। মাথার চুলও জট পাকাচ্ছে। মারিয়া আয়না রেখে চলল পোশাক বের করতে। নিজের গাউনটা বের করল আবার ফ্রান্সিসের পোশাকটাও বড় চামড়ার বাক্স থেকে বের করল। গাউনটা পরল। গাউনটা একটু ঢিলে লাগল। বুঝল ওর জাহাজী জীবন ওর শরীর রোগা করে দিয়েছে। কিন্তু এসব ভেবে আর কী হবে। মারিয়া চুল আঁচড়াতে বসল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোকে নিয়ে কেবিন ঘরে এল। মারিয়ার সাজের বহর দেখে মুখ টিপে হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। এই সাজ পোশাক নিয়ে রসিকতা করলে মারিয়া মনে দুঃখ পাবে। ফ্রান্সিস চুপ করে রইল।

মারিয়ার সাজগোজ শেষ হল। এবার মারিয়া ফ্রান্সিসের নতুন পোশাকটা বের করল। বলল—এই পোশাকটা পর। ফ্রান্সিস বলল—কী পাগলামো! আমরা কি নাচের আসরে যাচ্ছি নাকি?

—না—তোমাকে আজ নতুন পোশাক পরতে হবে। মারিয়া বলল। ফ্রান্সিস বলল—কি কাণ্ড!

—না কোনও কথা শুনবো না—তোমাকে পরতেই হবে। মারিয়া বলল।

—ঠিক আছে। তুমি যখন অত করে বলছো। পোশাকটা দাও। ফ্রান্সিস বলল।

মারিয়া ফ্রান্সিসের পোশাকটা দিল। ফ্রান্সিস নিজের পোশাকের ওপরেই নতুন পোশাকটা পরল। মারিয়া ভাঙা আয়নাটা ফ্রান্সিসের মুখের সামনে ধরল। বলল—দ্যাখো—তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। ফ্রান্সিস আয়নাটায় মুখ দেখল।

—মুণ্ডু। ফ্রান্সিস মারিয়াকে আয়নাটা ফিরিয়ে দিল। এবার শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস তাহলে আমিও নতুন পোশাকটা পরে আসি।

—বেশ তো—ফ্রান্সিস বলল।

মোটামুটি একটু ফিটফাট হয়ে ফ্রান্সিস, মারিয়া আর শাঙ্কো জাহাজ থেকে নেমে এল।

ওরা দেখল রাস্তায় লোকজনের খুব একটা ভিড় নেই। ফ্রান্সিসরা একটু এগিয়েই একটা ছোট দুর্গ দেখল। দুর্গ ঘিরে পাথরের দেয়াল। তার বাইরে পরিখা। দুর্গের সদর দরজায় ওরা এল। চার পাঁচজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। কাঠের বিরাট দরজা বন্ধ।

ওরা দুর্গটার চারদিকে একবার ঘুরে এল। ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। দু'তিন জায়গায়। জোরে কয়েকটা ধাক্কা দিলে ওখানকার পাথুরে দেয়াল সবটা না হলেও কিছু অংশে ধ্বস নামবে। দেয়ালের ঐ জায়গাগুলো সুরক্ষিত নয়।

সদর দেউড়ির সামনে পরিখার ওপর কাঠের সেতু। ফ্রান্সিস বলল—চলো একটু খোঁজ-খবর নেওয়া যাক। সেতু পার হয়ে ওরা সদর দরজার কাছে এল।

তখনই একজন লম্বা মত সৈন্য চড়া গলায় বলে উঠল—তোমরা কারা! ওখানেই থাকো। দরজার কাছে আসবে না। ফ্রান্সিস বলল—আমরা জাতিতে ভাইকিং। জাহাজে দেশ-বিদেশ বেড়িয়ে বেড়ানোই আমাদের কাজ। আমরা দুর্গটা দেখছি।

—তা দেখো তবে পাহারাদার সৈন্যদের ফাঁকি দিয়ে দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করবে না। সেরকম কিছু করতে গেলে মৃত্যু নিশ্চিত। লম্বামত লোকটা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল ঐ লম্বামত লোকটিই দলনেতা। ফ্রান্সিস একটু এগিয়ে দলনেতার কাছে গেল। বলল—এই দুর্গটা কার? কে থাকে এই দুর্গে?

—এই দুর্গে থাকেন এখানকার আলতোয়াইফ—মানে রাজা গার্সিয়ারের প্রতিনিধি। দলনেতা বলল।

—ও। ফ্রান্সিস মুখে শব্দ করল।

দুর্গ দেখার পর এলো সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকায়। বেশ ভিড়। গাড়ি ঘোড়া চলছে।

ফ্রান্সিস বলল—চলো কিছু খাওয়া যাক। একটা খাবার দোকানে ওরা ঢুকল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দোকানটি। দোকানদার ফ্রান্সিসদের দেখে এগিয়ে এল। হেসে বলল—আসুন—আসুন। ফ্রান্সিসরা বসল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে বলল—বলো কী খাবে?

মারিয়া বলল—মিষ্টি পিঠে আর পাউরুটি কেটে দিন। দোকানদার বলল—দুধ থেকে একটা বিশেষ মিষ্টি আমরা তৈরি করি। আপনাদের দেব? অনেক লোক আমাদের এই বিশেষ খাবারটি খেতে আসে।

—দিন তাহলে। শাঙ্কো বলল।

কিছু পরে কাঠের লম্বা টেবিলে পাতা পেতে খেতে দেওয়া হল। ফ্রান্সিসরা খেতে লাগল। মারিয়া খেতে খেতে দোকানদারকে বলল—সত্যি আপনার এই খাবারটা বেশ খাওয়ার মত। আরো দুটো দিন। আমাদের তিনজনকেই। খাবার দেওয়া হল। খাবার খেয়ে তিনজনই খুশি।

খেতে খেতে ফ্রান্সিস দোকানিকে ডাকল। দোকানি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলল—এখানে দেখবার মত কী আছে?

—দুর্গটা দেখেছেন? দোকানদার বলল।

—হ্যাঁ দেখেছি। তবে বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। ফ্রান্সিস বলল।

—বছরে মাত্র দু'দিন বাইরের লোকেরা দুর্গের ভেতরে ঢুকে দেখার অনুমতি পায়। দোকানদার বলল।

—আর কী আছে? দেখবার মত? ফ্রান্সিস বলল।

—উত্তরের দিকে মাইল কয়েক দূরে আছে একটা বিরাট হ্রদ। এখন অন্ধকারে তো ভালো করে দেখতে পারবেন না। দোকান থেকে বেরিয়ে ফ্রান্সিস বলল—চলো

হ্রদটা দেখে আসি। ওরা একসময় হ্রদটার কাছে এল। চাঁদের আলো অনুজ্জ্বল। হ্রদের জল অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্রদের জলের ওপর নীলচে কুয়াশা ছড়িয়ে আছে। তাই ওপার দেখা যাচ্ছে না। চারপাশের ঝুঁকে পড়া গাছগাছালির গায়ে মাথায় কুয়াশামাখা চাঁদের নিস্প্রভ আলো—এতেই হ্রদের সৌন্দর্য বেড়ে গেছে।

এবার ফেরা। রাত বেড়েছে। ফ্রান্সিসরা ফিরে আসতে লাগল। একটা মোড়ে এল তিনজনে। ফ্রান্সিস বলল—ডানদিকের রাস্তা দিয়ে যেতে গেলে দুর্গটা ঘুরে যেতে হবে। তাতে পরিশ্রম বেশি সময়ও নষ্ট। বাঁ রাস্তাটা দিয়ে গেলেই রাস্তাটা যেভাবে গেছে দেখছি—তাতে এই রাস্তা দিয়ে গেলেই অল্পসময়ের মধ্যে জাহাজঘাটায় পৌঁছতে পারবো।

—কিন্তু এই রাস্তাটা বনের মধ্যে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই অন্ধকারে বনের মধ্যে দিয়ে যাবো? শাঙ্কো বলল।

—তাতে কী হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। শাঙ্কো আর আপত্তি করল না। রাস্তা কিছুদূর এসে বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। ফ্রান্সিসরা বনে ঢুকল। এখন রাস্তাটা পায়ে চলা পথের মত সরু।

অন্ধকারেই সরু রাস্তাটায় পা টিপে টিপে চলল ওরা। অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ ফ্রান্সিস বুঝল ওরা পায়ে চলা পথটা হারিয়ে ফেলেছে। ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ওরা যাচ্ছে। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—দাঁড়াও। শাঙ্কো আর মারিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস বলল—

—সমস্যায় পড়লাম। আমরা পথ হারিয়েছি। কোনদিকে জাহাজঘাটা বুঝতে পারছি না।

—কী করবে এখন? শাঙ্কো বলল।

—চলো যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই যাই। দেখা যাক কোথায় গিয়ে পৌঁছুই। ফ্রান্সিস বলল।

তারপর তিনজনেই অন্ধকারে চলল।

হঠাৎ ঝোপেঝাড়ে শব্দ তুলে তিন চারজন লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের পরনে কানঢাকা জোব্বামত পোশাকে। কোমরের ফেট্টিতে তরোয়াল গোঁজা।

একজন এগিয়ে এসে বলল—তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছো?

—আমরা জাতিতে ভাইকিং বিদেশী। আমরা জাহাজে চড়ে এখানে এসেছি। এই বনের মধ্যে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি জাহাজটায় পৌঁছবো এই ভেবেই এই রাস্তায় এসেছি।

—তাহলে তোমরা জাহাজঘাটায় যাবে। সৈন্যটি বলল।

—হ্যাঁ। কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা পথ হারিয়েছি। ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ—তোমরা জাহাজঘাটার উল্টোদিকে যাচ্ছিলে। যাকগে—তোমরা এখানকার আলতোয়াইদের গুপ্তচর। আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে এসেছো। ফ্রান্সিস বুঝল—ভীষণ বিপদ। ও বলে উঠল—আমাদের সঙ্গে আমাদের

দেশের রাজকুমারী আছেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গুপ্তসংবাদ সংগ্রহে আসবো এত বোকা আমরা নই।

—যাক গে—তোমাদের বন্দী করা হল। আমাদের বিদ্রোহী নেতা খাতিব কাল রাতে আসবেন। উনি যদি বলেন তোমাদের ছেড়ে দিতে তাহলে তোমরা ছাড়া পাবে। এখন বন্দী থাকতে হবে। সৈন্যটি ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের আসতে বলল।

ফ্রান্সিসরা সৈন্যদের পাহারায় চলল। ঝোপঝাড় জঙ্গল দু' হাতে সরিয়ে ফ্রান্সিসরা চলল। শাঙ্কো ফ্রান্সিসের কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলল—ফ্রান্সিস আমরা এই অন্ধকারে পালাতে পারি।

—মারিয়া রয়েছে। পালাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবো। তখন বিপদ বাড়বে। তার চেয়ে চলো—কয়েদখানা তো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। কয়েদঘরে আটক থাকা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। চিন্তা মারিয়াকে নিয়ে। ওর তো অত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

সবাই ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলল। বনের বেশ ভেতরে ঢুকল যোদ্ধারা। তখনই অন্ধকারে দেখা গেল একটা পাথরের বাড়ি। বেশ বড়। ভাঙা বাড়ি।

যোদ্ধারা বাড়ির দরজার কাছে গেল। অন্ধকারে দেখা গেল ভাঙা পাথরের দরজা। সবাই ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়। ফ্রান্সিস ওপরে তাকিয়ে দেখল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তারায় ভরা আকাশ। ছাদ বলে কিছু নেই।

ফ্রান্সিস দেখল অনেক যোদ্ধা। শুয়ে বসে আছে। সঙ্গের যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসদের বলল—তোমরা এ ঘরে থাকবে। তোমাদের হাত পা বাঁধা হল না। পালাবার চেষ্টা করলে মরবে।

ফ্রান্সিস ঘরটার কোনায় দেয়াল ঘেঁষে বসল। মারিয়া শাঙ্কোও বসল—এখন কী করবে?

—বন্দী জীবন মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এখন দেখা যাক বিদ্রোহী নেতা খাতিব এসে আমাদের কী করে। এখন কিছু করা যাবে না। ফ্রান্সিস বলল।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে যোদ্ধাদের মধ্যে তিন-চারজন যোদ্ধা এসে দাঁড়াল। যোদ্ধারা সব উঠে বসল। আগত যোদ্ধাদের হাতে বড় বড় কাঁচা পাতা। একজন যোদ্ধা সকলের সামনে পাতা পেতে দিল। যোদ্ধাকে অন্য যোদ্ধাটি একটা বড় ঝুড়ি থেকে প্রত্যেক চারটে করে কাটা রুটি দিল। অন্য যোদ্ধাটি কাঠের বড় পাত্র থেকে পাখির মাংস ঝোল দিতে লাগল।

খাওয়া শুরু হল। ফ্রান্সিস বরাবর যা বলে তাই বলল—পেটপুরে খাও। ভাল না লাগলেও খাও। এতেই শরীর ভাল থাকবে। সব সময় নিজেকে তৈরি রাখো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হল। একজন যোদ্ধা এঁটো পাতাগুলো নিয়ে গেল। ঘরের বাঁ কোনায় জলের জালাটা থেকে কাঠের গ্লাস দিয়ে জল তুলে তুলে খেল সবাই।

একজন দু'জন করে আস্তে আস্তে সবাই শুয়ে পড়ল। মেঝেয় লম্বা লম্বা শুকনো

ঘাস পাতা। তার ওপরে শোয়া।

ফ্রান্সিস ঘুমোতে পারল না। অনেক চিন্তা মাথায়। কী করে অক্ষত শরীরে পালানো যায় তার উপায় ভাবতে লাগল। ফ্রান্সিস দু'হাতের তেলোতে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকাল। ঘরটার ছাদ বলে তো কিছু নেই। কালো আকাশে অজস্র তারার ভিড়। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফ্রান্সিসের দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ল। কতদুরে সেই দেশ বাড়ি। পাখির পালকে তৈরি শুভ্র বিছানা। নরম বালিশ। আঃ কী আরাম। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে উঠে বসল। মারিয়া তখনও ঘুমোয় নি। মারিয়াও উঠে বসল। বলল—কী হল ফ্রান্সিস?—কিছু না—আজে বাজে চিন্তা। ফ্রান্সিস বলল।

—আর রাত করো না। ঘুমিয়ে পড়ো। মারিয়া বলল।

ফ্রান্সিস শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে। ততক্ষণে মারিয়াও শুয়ে পড়েছে। ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফ্রান্সিসরা সকালের খাবার খেল। দুপুরেও খেল। সন্ধে হল। রাত নামল। রাত বাড়তে লাগল।

বেশ রাতে বিদ্রোহী নেতা খাতিব এল। সঙ্গে আট-দশজন যোদ্ধা। ওরা পাশের ঘরটায় গিয়ে বসল।

তখনই দলপতির সেই যোদ্ধাটি ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—খাতিব তোমাদের ডাকছেন।

—বেশ চলো। ফ্রান্সিস উঠে বসল। শাঙ্কো বলল—তুমি একা যাবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—তোমরা ঘুমোও। ফ্রান্সিস বলল।

ঘরের পাথরের দেয়ালের খাঁজে মশাল জ্বলছে। সেই আলোয় দেখে দেখে ফ্রান্সিস পাশের ঘরে এল। দলনেতা ওকে খাতিবের কাছে নিয়ে এল। খাতিব ফ্রান্সিসকে বসতে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিস বসল। খাতিব বলল—শুনলাম তোমরা ভাইকিং?

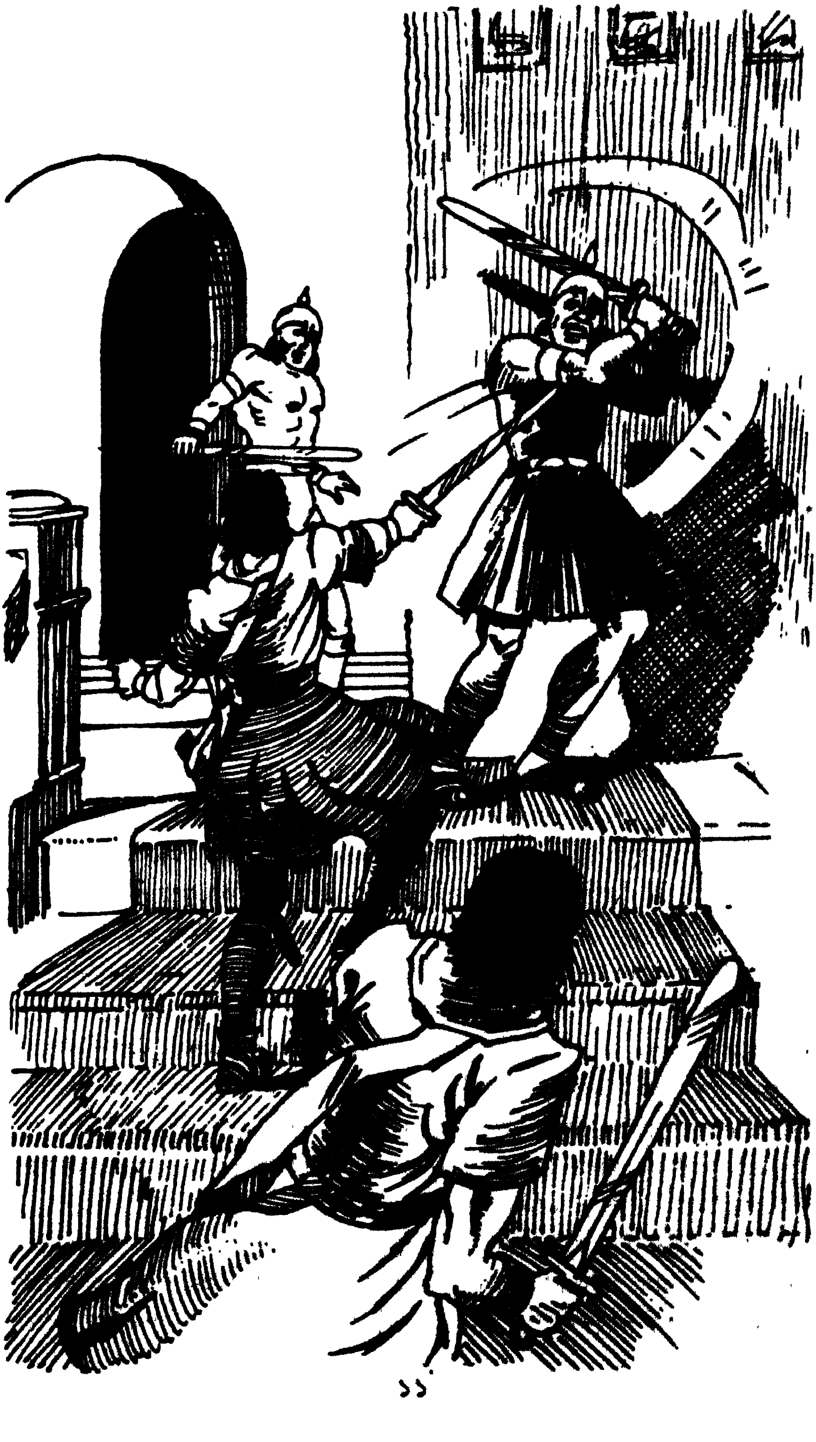
—হ্যাঁ দেশে দেশে জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াই। কোনো ঝুট ঝামেলায় আমরা থাকি না। আমরা কাউকে অবিশ্বাস করি না। আমরা মনে করি সব মানুষই আমাদের বন্ধু।

—শুধু জাহাজে ঘুরে বেড়াও? খাতিব বলল।

—হ্যাঁ। তবে একটা কাজ করি। যদি কোন দেশে দ্বীপে গুপ্তধন থাকে বুদ্ধি খাটিয়ে তা উদ্ধার করি। ফ্রান্সিস বলল।

—তারপর খুঁজে পাওয়া গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাও। খাতিব বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আপনার মত অনেকেই আমাদের এরকম সন্দেহ করেছে। আমরা কিছু মনে করি নি। নিঃস্বার্থভাবে আমরা পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধার করি আর যাদের সেই গুপ্তধন প্রাপ্য তাদের হাতেই দিই। এটা মানুষ সহজে বিশ্বাস করে না। তারা আমাদের অবিশ্বাস



করে। তাই বলে আমরা কোনো মানুষকে বিশ্বাস করব না? আমরা সবাইকে বিশ্বাস করি। এতে কিন্তু আমরা কখনো খুব ঠকি নি।

—ঠিক আছে—খাতিব বলল—তোমার সঙ্গে কারা আছে?

—আমার একজন বন্ধু আর আমাদের দেশের রাজকুমারী। ফ্রান্সিস বলল।

—সে কি! রাজকুমারী রাজপ্রাসাদের আরাম আয়েস ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে এলেন কেন? খাতিব জিজ্ঞেস করল।

—আমি রাজকুমারীর স্বামী। আমি যেখানে যাবো তিনিও সেখানে যাবেন। যত কষ্টকর জীবনই হোক—আমি তা মেনে নি, বলে উনিও মেনে নেন। ফ্রান্সিস বলল।

—হুঁ। তোমার সঙ্গী আর কেউ নেই? খাতিব জিজ্ঞেস করল।

—আছে। আমার পঁচিশ জন বন্ধু এখানকার কাদিজ জাহাজঘাটায় আমাদের জাহাজে আছে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি যা বললে সে সব সত্যি কিনা—আমরা খোঁজ করে দেখবো। ততদিন এখানেই বন্দী থাকতে হবে। খাতিব বলল।

এবার ফ্রান্সিস বলল—আমার সঙ্গে রাজকুমারী রয়েছেন। তিনি এই বন্দীদশায় অসুস্থ হয়ে পড়বেন। রাজকুমারীকে অন্য কোথাও রাখুন।

—দেখছি সে সব। এখন তোমরা এখানেই থাকবে। খাতিব বলল।

ফ্রান্সিস শাঙ্কোদের কাছে চলে এল।

শাঙ্কো বলল—ফ্রান্সিস—কী কথা হল?

—আমাদের এখন মুক্তি দেওয়া হবে না। এখানেই বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আমাদের খোঁজখবর নিয়ে তবে আমাদের মুক্তি দেবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তাহলে তো এখন এই বন্দী জীবনই চলবে। শাঙ্কো বলল।

—হ্যাঁ। মারিয়াকে অন্য কোথাও রাখার জন্যে অনুরোধ করলাম। খাতিব অনুরোধ রাখল না। মারিয়াকে এভাবেই থাকতে হবে। ফ্রান্সিস বলল।

সন্ধেবেলা খাতিব এল। খাতিব ফ্রান্সিসদের পাশের ঘরে রইল।

রাত গভীর হল। সবাই ঘুমিয়ে আছে। ফ্রান্সিসও ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দ চারদিক। শুধু কখনও কখনও রাতজাগা পাখির ডাক। হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা খোলা দরজা দিয়ে চিৎকার করতে করতে ঢুকল। নিরস্ত্র খাতিবের যোদ্ধাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খাতিবের যোদ্ধারা ঘরের কোনায় জড়ো করে রাখা তরোয়াল বর্শা নেবার জন্যে ছুটে গেল। তারা অনেকেই অস্ত্রাঘাতে মেঝেয় পড়ে গেল। দু'চারজন কোনরকমে তরোয়াল বর্শা হাতে নিয়ে লড়াইয়ে নামল।

ফ্রান্সিস বুঝল এই লড়াইয়ের সময়ই পালান ভাল। কারো নজরে পড়বে না। ফ্রান্সিস শাঙ্কো আর মারিয়াকে বলল—পাশের ঘরে ঢুকে পালাতে হবে। চলো।

অন্ধকারে ওরা পাশের ঘরে এল। সেখানেও লড়াই চলছে। ফ্রান্সিসরা ঘরটা

থেকে ভাঙা দরজা পার হয়ে ছুটল। কিন্তু কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়তে হল। খোলা তরোয়াল হাতে আলতোয়াইফের সৈন্যরা এগিয়ে এল। বোঝা গেল সারা বাড়িটাই ওরা ঘিরে ফেলেছে।

একটা গাছের তলায় ফ্রান্সিসদের আনা হল। দেখা গেল আগে থেকেই কয়েকজন খাতিবের যোদ্ধাকে ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিসদেরও হাত বেঁধে ওখানে রাখা হল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা মারিয়ার হাত বাঁধতে গিয়ে বেশ আশ্চর্য হল। মেয়েটি কে? ওখানে এল কী করে? ওরা মারিয়াকে কিছু বলল না। হাতও বাঁধল না।

ততক্ষণে লড়াই শেষ। বিদ্রোহী খাতিবের যোদ্ধারা হেরে গেল। অনেক যোদ্ধা মারা গেল। অনেক বন্দী হল। খাতিবও বন্দী হল।

ভোর হল। সূর্য উঠল। বনের ডালপাতার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল রোদের আকাশ দেখা গেল।

আলতোয়াইফের সৈন্যরা বন্দীদের সারি দিয়ে দাঁড় করাল। তারপর হুকুম দিল—এবার চলো।

বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বন্দীরা চলল। পেছনে সৈন্যরা। সৈন্যদের দলপতি গলা চড়িয়ে বলে উঠল—কেউ পালাবার চেষ্টা করবে না। পালাতে গেলে মরবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বন্দীরা বনের বাইরে এল। দেখল আলতোয়াইফের ছোট দুর্গটার কাছে এল।

পরিখা পার হয়ে বন্দীদের দুর্গের বিরাট কাঠের দরজার সামনে আনা হল। ঘর্ ঘর্ শব্দে দরজা খুলে গেল। বন্দীরা ঢুকল। পেছনে সৈন্যরা।

দুটো টানা পাথরের ঘর। বোঝাই গেল কয়েদখানা। কাছে আসতে দেখা গেল কয়েকজন সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তরোয়াল খোলা নয়। কোষবদ্ধ।

কয়েদখানার লোহার দরজা—ঢাং ঢং শব্দে খোলা হল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। দেখল—ঘরটায় জানলা বলে কিছু নেই। ছাদটার কোনায় ছাদ একটু ভাঙা। খোঁদলমত। ওখান দিয়েই আলো হাওয়া আসছে।

এই সকালেও দেয়ালের খাঁজে রাখা মশাল জ্বলছে। তাতে অন্ধকার ভাবটা কেটেছে। মেঝের বিছানা বলে কিছু নেই। কাঠের পাটাতন পরপর পাতা। এটাই বিছানা।

ফ্রান্সিস দরজার কাছাকাছি বসল। মারিয়া শাঙ্কোও বসল। একটু হাঁপাতে হাঁপোতে মারিয়া বলল—আমার জন্যেই তোমাদের এত ভোগান্তি। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—এ সব ভাববেন না। এতে আপনার মন খারাপ হবে। সহ্যক্ষমতা কমে যাবে। দেখা যাক—আমরা মুক্তি পাই কি না। এখন শুধু মুক্তির কথা ভাবতে হবে। ফ্রান্সিস কী ভাবতে ভাবতে বলল—শাঙ্কো—আমরা যখন দুর্গটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন কোনদিকের পাথরের দেয়ালের একটা জায়গা বেশ ভাঙা ছিল দেখেছিলাম। শাঙ্কো একটু ভেবে বলল—দক্ষিণ দিককার

দেয়ালটার মাঝামাঝি পাথরের পাটাগুলো খসে পড়েছে। সবটা নয়। তবে পাথরের পাটাগুলো আলগা হয়ে গেছে।

—ঠিক—ঠিক বলেছো শাঙ্কো। এখন আমার মনে পড়ছে। ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস চারদিকে ভালো করে দেখল। বুঝল এখান থেকে পালাতে হলে দরজা দিয়েই পালাতে হবে। ফ্রান্সিসের নজরে পড়ল দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে খাতিব বসে আছে। দু'চোখ বোঁজা। ফ্রান্সিস উঠে আস্তে আস্তে খাতিবের কাছে এল। গলা নামিয়ে বলল—খাতিব—আপনারা সাহায্য করলে আমরা এই কয়েদঘর থেকে পালাতে পারি। খাতিব চোখ খুলল। বলল—কী ভাবে?

—পাহারাদাররা যখন খাবার নিয়ে দুপুরবেলা আসবে তখন ওরা কীভাবে খেতে দেয় সেটা লক্ষ্য করতে হবে। তখনই আমি ঠিক করবো—কখন কীভাবে পালাবো।

—বেশ—উপায় ভাবুন। খাতিব বলল। ফ্রান্সিস নিজের জায়গায় চলে এল। অপেক্ষা করতে লাগল কখন দুপুরের খাবার খেতে দেয়।

দুপুরে সৈন্যরা তিনজন খাবারের ঝুড়ি হাতে আর কাঠের গামলায় ঝোল নিয়ে এল। পাহারাদার দু'জন দরজার কাছে খোলা তরোয়াল নিয়ে দাঁড়াল। দরজা খোলা হল। সৈন্যরা খাবার নিয়ে ঢুকল।

খেতে খেতে ফ্রান্সিস নিম্নস্বরে বলল—শাঙ্কো—তিনজন ঢোকে। দু'জন পাহারায় থাকে। রাতে খাবার দেবার সময় তুমি একজন পাহারাদারকে কাবু করবে আমি অন্যটাকে ধরবো। যারা খাবার দেবে তাদের সামলাবে খাতিবের যোদ্ধারা।

সন্ধের একটু পরে ফ্রান্সিস খাতিবের কাছে গেল। বলল—পরিকল্পনা ছকে ফেলেছি।

—কী পরিকল্পনা করলেন?

—খাবার দিতে তিনজন সৈন্য ঘরের মধ্যে ঢোকে। তাদের আপনারা আটকাবেন। তাদের যেভাবেই হোক এই ঘরেই বন্ধ করে রাখা হবে। ততক্ষণ আমি আর আমার বন্ধু দু'জন পহারাদারকে আহত করবো যাতে আমাদের পেছনে ছুটতে না পারে। এ সবের মধ্যেই আপনাদের আমাদের পালাতে হবে।

খাতিব মাথা ওঠানামা করে বলল— পরিকল্পনা খুবই ভালো আর কার্যকরী। দাঁড়ান আমাদের যোদ্ধাদের বলছি।

খাতিব উঠে দাঁড়াল। বলল—সবাই শোন। খাতিবের সৈন্যরা এগিয়ে এল। খাতিব বলল—রাতে যখন তিনজন সৈন্য খাবার দিতে আসবে তখন তোমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের কোমরে গোঁজা তরোয়াল কেড়ে নেবে। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে এসে দরজার লোহার হুড়কো টেনে দেবে যাতে সৈন্য তিনজন পালাতে না পারে। এবার সবাই তৈরি থেকো।

রাত হল। তিনজন সৈন্য খাবার নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়াল। দু'জন পাহারাদারের একজন দরজা খুলে দিল। ঢং শব্দ তুলে দরজা খুলে গেল।

তিনজন খাবার নিয়ে ঢুকল। তখনই খাতিবের কয়েকজন যোদ্ধা সৈন্য তিনজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের খাবারের ঝুড়ি কাঠের গামলা সব ছিটকে গেল। ওরা কাঠের মেঝের ওপর উবু হয়ে পড়ল। খাতিবের যোদ্ধারা তিনজন সৈন্যের কোমর থেকে ঝোলানো তরোয়াল খাপ থেকে খুলে ফেলে যোদ্ধাদের একজন বলল—কেউ কোনরকম শব্দ করবে না।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খোলা তরোয়াল হাতে দু'জন সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একজনের কাঁধে—এক রদ্দা কষাল। ওর হাত থেকে তরোয়াল খসে পড়ল। শাঙ্কো অন্যটার পেটে ঢুঁ মারল। সেই সৈন্যটি দু'হাত উঁচু করে চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল।

ফ্রান্সিস মারিয়াকে ডাকতে যাবে তখনই পেছন ফিরে দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস মারিয়ার ডান হাত ধরে বলে উঠল—শাঙ্কো—ছোট দক্ষিণের দেয়ালের দিকে।

তিনজনে অন্ধকার মাঠে নেমে এল। তারপর ছুটল দক্ষিণদিকের দেয়ালের দিকে। খাতিব আর যোদ্ধারাও সে দিকেই ছুটল।

ফ্রান্সিস ভাঙা দেওয়ালের জায়গায় এল। লাথি মেরে কয়েকটা আলগা পাথরের পাটা ভাঙল। এখন পার হওয়া সহজ হল।

ফ্রান্সিসরা দেয়াল পার হয়ে বাইরে অন্ধকার রাস্তায় এল। ফ্রান্সিসদের দেখাদেখি খাতিব আর খাতিবের যোদ্ধারাও ভাঙা দেয়াল পার হল। তখনই দুর্গে হৈ হৈ চিৎকার শোনা গেল। আলতোয়াইফের সৈন্যরা চিৎকার করতে লাগল—কয়েদী পালাচ্ছে। সাবধান। ধরো সবাইকে। অন্ধকার মাঠে সৈন্যরা মশাল হাতে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। ফ্রান্সিসরা কোনদিক দিয়ে পালিয়েছে সৈন্যরা অন্ধকারে তা দেখতে পায় নি।

এবার ফ্রান্সিসরা একটু সমস্যায় পড়ল। জাহাজঘাটা কোনদিকে? ফ্রান্সিস খাতিবের এক যোদ্ধাকে থামাল। বলল—জাহাজঘাটটা কোনদিকে। যোদ্ধাটি ডানহাত দক্ষিণের দিকে তুলে বলল—ঐদিকে।

ফ্রান্সিসরা দক্ষিণমুখো ছুটল। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—মারিয়া ছুটতে পারবে তো?

—কিছ্ছু ভেবো না। তোমাদের মত ছুটতে না পারলেও আমি আমার মত ছুটবো।

ফ্রান্সিসরা হাঁপাতে হাঁপাতে জাহাজঘাটায় পৌঁছল।

পাটাতনের ওপর দিয়ে ছুটে ওরা জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমেই ছুটে গেল নোঙরের কাছে। পেছনে শাঙ্কো। দু'জনে নোঙরের দড়ি টেনে টেনে তুলল। জাহাজ হাওয়ার ধাক্কায় ঘুরে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে জাহাজ থেকে পাতা পাটাতনটা তুলে ফেলল। জাহাজটা ঘুরে গেল।

ওদিকে মারিয়ার ডাকাডাকিতে হ্যারি বিস্কোরা জাহাজের ডেক-এ উঠে এল।

হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ভাইকিং বন্ধুরা উঠে আসতে লাগল। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর শাঙ্কোকে ঘিরে দাঁড়াল। ধ্বনি তুলল—ও—হো—হো।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, আমাদের এক্ষুনি এই বন্দর থেকে পালাতে হবে। পাল খুলে দাও দাঁড়িরা দাঁড় ঘরে যাও। জাহাজ যত জোরে পারো চালাও।

ভাইকিং বন্ধুরা কাজে নেমে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যে জাহাজ মাঝ সমুদ্রে চলে এল।

তখনই পুবদিকে গভীর কমলা রঙের সূর্য উঠল। আলো ছড়ালো সমুদ্রে জাহাজে।

জাহাজ চলল।

দিন তিনেকের মাথায় ফ্রান্সিসদের জাহাজ এল হুয়েনভা বন্দরে। কাদিজ বন্দরেই এই হুয়েনভা বন্দরের নাম ওরা জেনে এসেছিল। ওরা নিশ্চিন্ত মনেই ওদের জাহাজ বন্দরে ভেড়াল। তখন সকাল। জাহাজ থেকে কাঠের তক্তা তীর পর্যন্ত পাতা হলো। কয়েকজন ভাইকিং বন্ধু বন্দর শহরটা দেখতে নেমে গেল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার সময় হয়ে গেল তখনও বন্ধুরা ফিরল না। আরো সময় গেল। দুপুর পেরিয়ে বিকেলের মুখোমুখি সময় তখন। ফ্রান্সিসরা কেউ তখনও খেল না।

বিকেলের দিকে দেখা গেল বন্ধুদের বন্দী করে একদল যোদ্ধা ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে আসছে। কেন ওর বন্ধুদের বন্দী করা হয়েছে, ফ্রান্সিস তার কোনো কারণই বুঝতে পারল না। মাথায় শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, হাতে খোলা তরোয়াল, যোদ্ধারা ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। ফ্রান্সিস, হ্যারি এগিয়ে গেল। যোদ্ধাদের দলনেতা সবার আগে ছিল। একটু লম্বামতো। মুখে দাড়ি-গোঁফ। দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল লোকটা চড়া মেজাজের মানুষ।

হ্যারি বলল, কী ব্যাপার বলুন তো?

দলনেতা বলল, শুনলাম তোমরা ভাইকিং। ক্যামেরিনাল বন্দর হয়ে এখানে এই হুয়েনভা বন্দরে এসেছো।

হ্যারি বলল, হ্যাঁ।

তোমরা জানো কি এই অঞ্চলের রাজা হচ্ছেন ফার্নান্দো? দলনেতা বলল।

—সেটা আমরা কী করে জানবো? হ্যারি বলল।

—ক্যামেরিনাল অঞ্চলে এখন রাজত্ব করছে ফার্নান্দোর ভাই গার্সিয়া।

—হ্যাঁ, শুনেছি। হ্যারি বলল।

—ফার্নান্দো আর গার্সিয়ার মধ্যে ভীষণ রেষারেষি।

—ও। হ্যারি মুখে শব্দ করল।

যে কোনোদিন দুই ভাইয়ে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে।

—আমরা এসব কিছুই জানি না। হ্যারি বলল।

—তোমরা সব জানো। দলনেতা চিৎকার করে বলে উঠল।

—না, আমরা জানি না। ফ্রান্সিস বলল।

দলনেতা আবার চিৎকার করে বলে উঠল, তোমরা গার্সিয়ার গুপ্তচর। গার্সিয়া তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে গোপনে সব খবর নিতে—আমাদের ক'টা যুদ্ধজাহাজ, সৈন্যসংখ্যা কত, কোন কোন জায়গা আমরা সুরক্ষিত রেখেছি, কোনগুলি আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা।

ফ্রান্সিস বুঝল, খুবই বিপদে পড়েছে ওরা। এই দলনেতাকে কিছু বলে লাভ নেই। দলনেতা আগেই স্থির করে ফেলেছে ফ্রান্সিসদের বন্দী করে রাখবে। কাজেই দলনেতার এখন যা মনের অবস্থা, ফ্রান্সিসরা এসব ব্যাপারে যে জড়িত নয় সেটা কিছুতেই বোঝানো যাবে না। তবু ফ্রান্সিস হাল ছাড়ল না। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল। বলল, দেখুন, আমরা বিদেশী। আপনাদের কোনো ব্যাপারেই আমরা জড়িয়ে নেই। জড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও নেই।

—আমি বিশ্বাস করি না। দলনেতা বলল।

—গুপ্তচরবৃত্তি করে আমাদের কী লাভ বলুন! হ্যারি বলল।

—গার্সিয়া তোমাদের অনেক স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছে। দলনেতা বলল।

—বেশ, আপনারা জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে দেখুন। ফ্রান্সিস বলল।

—সে সব পরে হবে। এখন তোমাদের সবাইকে বন্দী করা হলো। দলনেতা বলল। তারপর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই জাহাজের কোথাও থেকে দড়ি নিয়ে আয়। টুকরো করে দড়ি কেটে সকলের হাত বাঁধ। তারপর কয়েদখানায় নিয়ে চল।

ফ্রান্সিস বলল, আমাদের কয়েদখানায় না রেখে এই জাহাজেই বন্দী করে রাখতে পারেন। আপনাদের যোদ্ধারা পাহারায় থাকবে।

—না না, তোমাদের সবাইকে কয়েদখানায় থাকতে হবে। দলনেতা মাথা নেড়ে বলল।

—তাহলে একটা অনুরোধ, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দেশের রাজকুমারী। তিনি কয়েদখানার অত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। তাঁকে এই জাহাজেই বন্দী করে রাখুন। ফ্রান্সিস বলল।

দলনেতা বলল, সেসব রাজা ফার্নান্দোকে বলো।

—রাজা ফার্নান্দোকে কোথায় পাবো? ফ্রান্সিস বলল।

রাজা সেভিল্লায় আছেন। দলনেতা বলল।

সেভিল্লা কোথায়? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—এই হুয়েনভা থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে। দলনেতা বলল।

—তাহলে কি আজ রাতে আমাদের সেভিল্লায় নিয়ে যাওয়া হবে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

—না, কাল সকালে রওনা হবো আমরা। দলনেতা বলল।

এবার ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে হ্যারি আর শাঙ্কোর কাছে সরে এল। নিজেদের দেশীয় ভাষায় বলল, আমি পালাচ্ছি। কেউ লড়াইয়ে নামবে না। সময়-সুযোগমতো সব করবো। তোমরা এগিয়ে এসে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াও।

ফ্রান্সিসের বন্ধুরা আস্তে আস্তে এসে ফ্রান্সিসকে আড়াল করে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডেক-এ বসে পড়ল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা এসেই গড়িয়ে গিয়ে মাস্তুলের পেছনে চলে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে একটুক্ষণ দাঁড়াল। তারপর ডেক-এর ওপর শুয়ে পড়ে দ্রুত গড়িয়ে সিঁড়িঘরের পেছনে চলে এল। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা আর ওকে দেখতে পাবে না। ফ্রান্সিস দ্রুত পায়ে ছুটে গিয়ে হালের কাছে এল। হাল জড়িয়ে ধরে হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে জলের কাছে নেমে এল। তারপর হাল ধরে জলের মধ্যে আস্তে নিজের শরীরটা ডুবিয়ে দিল। জলে কোনো শব্দ হলো না।

ওদিকে ভাইকিং বন্ধুরা গজরাতে লাগল। ওরা এভাবে কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে বন্দীদশা মেনে নিতে পারছিল না। হ্যারি দেশীয় ভাষায় বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিস পালিয়েছে। ও বলে গেছে আমরা যেন লড়াই না করি। সব মেনে নিই। হ্যারি থামল। তারপর বলল, ফ্রান্সিস মুক্ত। এখন আমাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফ্রান্সিস আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেই। ভাইকিং বন্ধুরা একটু শান্ত হলো।

ফার্নান্দোর সৈন্যরা ভাইকিংদের হাত বাঁধার জন্যে দড়ি যোগাড় করে নিয়ে এল। এবার হ্যারি দলনেতার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখুন, আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসছে না দেখে আমরা কেউ এখনও পর্যন্ত খাইনি। আগে আমাদের খেতে দিন। তারপর যেখানে নিয়ে যেতে চান নিয়ে যাবেন।

একটু ভেবে নিয়ে দলনেতা বলল, বেশ, খেয়ে নাও। আমার সৈন্যরা পাহারায় থাকবে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলেই মরবে।

ভাইকিংরা সিঁড়ির দিকে চলল। সৈন্যরাও পেছনে পেছনে চলল। ভাইকিংরা খেতে গেল। সৈন্যরা পাহারায় রইল।

খেতে খেতে মারিয়া বলল, হ্যারি, আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট।

হ্যারি হেসে বলল, কী যে বলেন। আপনি না থাকলেও এই রাজা ফার্নান্দোর যোদ্ধারা আমাদের বন্দী করতো। যাকগে, আপনি এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।

খাওয়াদাওয়া সেরে হ্যারি ডেক-এ উঠে এল। দেখল দলনেতা আরো সৈন্য আনিয়েছে। ভাইকিংরা ডেক-এ উঠে আসতে লাগল। সবাইকে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো। তারপর তাদেব দু' হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা হতে লাগল। সবার হাত বাঁধা হলো শুধু মারিয়ার হাত বাঁধা হলো না।

দলনেতা গলা চড়িয়ে ভাইকিংদের বলল, সবাই জাহাজঘাটায় গিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারিরা একে একে পাটাতনের ওপর দিয়ে নেমে এল। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরাও নেমে এল। হ্যারিদের ঘিরে দাঁড়াল।

দলনেতা হাত তুলে পুবদিক দেখিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, চলো। হ্যারিরা হাঁটতে শুরু করল। সৈন্যরাও ওদের দু' পাশ থেকে ঘিরে হাঁটতে লাগল।

তখন সন্ধে হয়েছে। হুয়েনভা বন্দরের রাস্তায় লোকজনের তেমন ভিড় নেই। রাস্তার এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। দু' পাশের বাড়িঘরেও আলো দেখা যাচ্ছে। বন্দী হ্যারিদের দেখে পথচলতি অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল ওদের।

একসময় বাড়িঘর শেষ হলো। ডানদিকে একটা প্রান্তর। সেটা পার হয়ে হ্যারিরা একটা পাথরের বাড়ির কাছে এল। বাড়িটা তেমন বড় না। দরজার কাছে মশাল জ্বলছে। হ্যারি মশালের আলোয় দেখল লোহার দরজা। তাতে তালা ঝুলছে। বুঝল আবার কয়েদঘরের বন্দীজীবন।

লোহার দরজা ঠং ঠং শব্দে খোলা হলো। হ্যারিদের ঠেলে ঠেলে ঢোকানো হলো। ঘরের মধ্যে দেয়ালের খাঁজে দুটো মশাল আটকানো। মশাল দুটো জ্বলছে। হ্যারি চারদিকে তাকাল। কয়েদঘর যেমন হয় তেমনি ঘর। ছাদের কাছে দু'দিকে দুটো ঘুলঘুলির মতো। মেঝেয় পুরু করে শুকনো ঘাসের বিছানা। হ্যারি দেখল আগে থেকেই বন্দী হয়ে আছে জনা দশেক লোক।

হ্যারি মারিয়াকে বলল, রাজকুমারী, আমার সঙ্গে আসুন। ঘরের এক কোনায় হ্যারি এল। মারিয়াকে বসতে বলল। নিজেও বসল। হ্যারির শরীর বরাবরই দুর্বল। ক্লান্তিতে সে বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল। বাঁধা হাত রাখল কপালের ওপর। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল, এ তো কষ্টের শুরু। কপালে আরও দুর্ভোগ আছে। তবে সান্ত্বনা একটাই, ফ্রান্সিস মুক্ত। ও আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবে।

—হ্যাঁ, এখন ওটাই একমাত্র ভরসা। হ্যারি বলল।

ওদিকে ফ্রান্সিস সাঁতার কেটে সমুদ্রতীরে এল। পেছল পাথরে সাবধানে পা রেখে রেখে তীরে উঠে এল। ভেজা পোশাক নিয়েই একটা বড় পাথরের চাইয়ের ওপর বসল। ওখান থেকে ওদের জাহাজ-ডেক, মানুষজন দেখা যাবে।

রাত হলো। ফ্রান্সিস তখনও বসে আছে। তাকিয়ে আছে ওদের জাহাজের দিকে। জাহাজের কাচঢাকা আলোয় দেখল হ্যারিদের সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো। তারপর হ্যারিরা হাত বাঁধা অবস্থায় জাহাজ থেকে নেমে এল। সামনে-পেছনে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা।

ফ্রান্সিস পাথরটা থেকে উঠে দাঁড়াল। চলল বড় রাস্তার দিকে। ঝোপঝাড় । গাছগাছালি বাড়িঘর পার হয়ে সদর রাস্তায় এল। রাস্তায় এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখল হ্যারিরা চলেছে। দেখল মারিয়ার হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়। ফ্রান্সিস এই ভেবে আশ্বস্ত হলো যে মারিয়ার বেশি কষ্ট হবে না।

ফ্রান্সিস হ্যারিদের পেছনে কিছু দূরে থেকে হাঁটতে লাগল। হ্যারিদের কয়েদঘরে ঢোকানো পর্যন্ত সবই ফ্রান্সিস দেখল। এবার চিন্তা—কী করে বন্ধুদের মুক্ত করা

যায়।

—এখন তো কিছু করার নেই। ফ্রান্সিস বেশ দুর্বল বোধ করতে লাগল। সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি।

ফ্রান্সিস জাহাজঘাটার দিকে চলল। জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখল ওদের জাহাজটায় আলো জ্বালা হয়নি। ও খুব সাবধানে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। আশপাশের জাহাজগুলো থেকে আলো পড়েছে ওদের জাহাজে। সেই সামান্য আলোতে দেখল ডেক-এ কোনো পাহারাদার সৈন্য নেই। ফ্রান্সিস হাঁফ ছাড়ল। ও নিজের কেবিনঘরে নেমে এল। ভেজা পোশাক পালটাল। তারপর রসুইঘরে এল।

রসুইঘরের টেবিলে ঢাকনা দেওয়া পাত্রগুলোর ঢাকনা খুলে দেখতে লাগল ফ্রান্সিস। মশলা নুন এসব রাখা। হঠাৎ দেখল টেবিলের ধারে রাখা একটা ঢাকা দেওয়া বড় পাত্র। ফ্রান্সিস ঢাকনা খুলল। দেখল রুটি মাংস আলুভাজা পরিপাটি রাখা। রাঁধুনি ভাইকিং বন্ধুটি জানতো ফ্রান্সিস পালিয়েছে। ফ্রান্সিস অভুক্ত থাকবে। এই জাহাজে ও নিশ্চয়ই আসবে। তাই রাঁধুনি বন্ধুটি সব খাবার সাজিয়ে রেখে গেছে। একে ক্ষুধার্ত, সামনেই খাবার আর রাঁধুনি বন্ধুটির ভালোবাসা—ফ্রান্সিস আবেগে চোখ বুঁজল। মনে মনে গভীর ভালোবাসা জানাল বন্ধুটিকে। তারপর খেতে বসল। গোগ্রাসে খেতে লাগল সে। খিদে যা পেয়েছে!

ভোর হলো। হ্যারির ঘুম ভেঙে গেল। ও উঠে বসল। দেখল বন্ধুরাও কেউ কেউ ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। মারিয়া তখনও ঘুমে। হ্যারি মারিয়ার ঘুম ভাঙাল না। ভালোমতো ঘুম আর বিশ্রাম রাজকুমারীর এখন অবশ্য প্রয়োজন।

বেলা হলো। ঢং ঢঙাস্ শব্দে কয়েদঘরের লোহার দরজা খুলে গেল। সকালের খাবার নিয়ে ঢুকল পাহারাদার সৈন্যরা। বন্দীদের হাতে বাঁধা দড়ি খুলে দেওয়া হলো। লম্বাটে সবুজ পাতায় গোল করে কাটা রুটি, আনাজের তরকারি আর মাংসের ঝোল। হ্যারি একটু অবাকই হলো—সকালের খাবারে এত কিছু! হ্যারিরা খাচ্ছে তখনই শুনল একজন পাহারাদার সৈন্য বলল, একটু পরেই তোমাদের সেভিল্লো নিয়ে যাওয়া হবে। পথে তেমন খাবার নাও জুটতে পারে। কাজেই যতটা পারো পেট পুরে খেয়ে নাও।

একটু বেলা হতেই ঢং ঢাং শব্দে কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। দলনেতা ভেতরে ঢুকল। গলা চড়িয়ে বলল, সবাই বেরিয়ে এসো। সবাইকে হেঁটে সেভিল্লা যেতে হবে। বাইরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, চলো সবাই।

দু'জন ভাইকিং বন্ধু ঘাড় নাড়ল। একজন বলল, এখান থেকে আমরা যাবো না। এখানেই থাকবো। ফ্রান্সিস এখানে আছে। ওর সাহায্যেই আমরা মুক্ত হবো।

হ্যারি বলল, জেনো, ফ্রান্সিস সবসময় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। এখনই

বাইরে গেলে দেখবে ফ্রান্সিস বড় রাস্তায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সেভিল্লো যাওয়ার পথে ফ্রান্সিস আত্মগোপন করে ঠিক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। হ্যারি থামল। পরে বলল, ফ্রান্সিস বলে গেছে আমরা যেন দলনেতার কথামতো চলি। এখন দলনেতার কথামতো সেভিল্লো যেতেই হবে। তার কথা না মানলে আমরাই বিপদে পড়বো।

সব বন্দী বাইরে এল। সার বেঁধে দাঁড়াল। দেখা গেল চারটে ঘোড়া আনা হয়েছে। হাতের খোলা তরোয়াল কোষবদ্ধ করে দলনেতা একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। তিনজন সৈন্য বাকি তিনটে ঘোড়ায় উঠে বসল। দলনেতা তার সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা চারজন এই গুপ্তচরদের পাহারা দিয়ে সেভিল্লো নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা হুয়েনভা বন্দরে খুঁজে বের কর রাজা গার্সিয়ার গুপ্তচরদের। ধরতে পারলেই কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। আমি ফিরে এসে যা করার করবো।

দলনেতা ঘোড়া চালিয়ে একটু এগিয়ে গেল। তারপর হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার পেছনে পেছনে এসো। হ্যারিরা এগিয়ে এল। তখনই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হ্যারিদের দেখতে দেখতে দলনেতা বলল, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল সে-ই তোমাদের নেতা। তাকে তো দেখছি না।

হ্যারি বলল, আমরা সবাই তো আছি। আপনি কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না।

দলপতি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, সে নিশ্চয়ই চালাকি করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। চিন্তা নেই—আমরা ঠিক খুঁজে বের করবো। এবার চলো সবাই।

দলনেতা ঘোড়া চালাল। হ্যারিরা পেছনে পেছনে চলল। সবার পেছনে চলল তিনটি ঘোড়ায় তিনজন সৈন্য।

হুয়েনভা বন্দর শহর ছাড়িয়ে হ্যারিরা একটা টানা রাস্তায় পড়ল। বালি আর পাথরের টুকরো ছড়ানো রাস্তাটা বেশ চওড়া। এই রাস্তাটাই বোধহয় সেভিল্লা গেছে।

বেলা বাড়তে লাগল। রোদের তেজও বাড়তে লাগল। হ্যারিদের সবচেয়ে কষ্ট দিতে লাগল মাঝেমধ্যে ছুটে আসা জোর বাতাস। সঙ্গে ধুলোবালি উড়ে এসে গায়ে-মাথায় পড়ছে। এজন্যে ওদের চোখ-মুখ হাত দিয়ে ঢাকতে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এভাবেই হ্যারিদের হাঁটতে হচ্ছে সেভিল্লার দিকে।

বেলা বাড়তে লাগল। রোদের তেজও বাড়তে লাগল। হ্যারিরা কাহিল হয়ে পড়ল। সেই সকালে খেয়েছে। তারপর এখনো পর্যন্ত এককোঁটা জলও খেতে পায়নি। সবচেয়ে কষ্ট হতে লাগল মারিয়ার। দু'হাত খোলা থাকলে কি হবে, এতক্ষণ হাঁটা, রোদের তেজ, ধুলো ওড়ানো দমকা হাওয়া—এত সব মারিয়া সহ্য

করতে পারছিল না। বেশ দুর্বল পায়ে সে হাঁটছিল। হ্যারি মারিয়ার কষ্ট বুঝতে পারল। কিন্তু মারিয়াকে কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। হ্যারি ভাবল, এক পাত্র জল খেতে পেলে মারিয়া আর বন্ধুদের কষ্ট একটু কমবে। সে দ্রুতপায়ে হেঁটে দলনেতার কাছে এল। বলল, আমাদের জলতৃষ্ণা পেয়েছে, জলের ব্যবস্থা করুন।

দলনেতা বলল, আর কিছুক্ষণ হাঁটলেই একটা গ্রাম পাওয়া যাবে। সেখানে ইঁদারা আছে। পেটভরে জল খেও।

হ্যারি কিছু বলল না। ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, সামনেই একটা গ্রামে ইঁদারা আছে। জল পাওয়া যাবে।

হ্যারিরা হাঁটতে লাগল। হাঁটার গতি অনেকটা কমে গেছে। হ্যারি মারিয়াকে বলল, রাজকুমারী, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি।

মারিয়া হেসে বলল, ফ্রান্সিসও কি কম কষ্ট সহ্য করছে! ওর কথা ভেবেই আমি সব কষ্ট সহ্য করছি।

কিছুটা এগিয়েই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি ঘরদোর। পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে গ্রাম। দলনেতার নির্দেশে হ্যারিরা গ্রামে ঢুকল। গ্রামটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড় ইঁদারা। গ্রামের বৌ-ঝিরা দড়ি বাঁধা কাঠের পাত্র ডুবিয়ে জল তুলছে। হ্যারিদের দেখে ওরা সরে দাঁড়াল। বিস্কো ইঁদারার ধারে গেল। কিন্তু দু'হাত তো বাঁধা। জল তুলবে কী করে! মারিয়া এগিয়ে এল। কাঠের পাত্র ইঁদারায় ডুবিয়ে জল তুলতে লাগল। তৃষ্ণার্ত ভাইকিংরা দু'হাত পেতে অঞ্জলির মতো জল ধরে খেতে লাগল। গায়ে-মাথায় জল ছিটোতে লাগল। সাত-আট পাত্র জল তুলতেই মারিয়া হাঁপাতে লাগল। কয়েকজন ভাইকিং বাঁধা দু'হাত তুলে দলপতিকে বলল, আমাদের হাত খুলে দিন। রাজকুমারী একা সবাইকে জল খাওয়াতে পারবেন না। দলপতি দু'জন সৈন্যকে ইঙ্গিত করল। সৈন্য দুজন ঘোড়া থেকে নেমে ইঁদারার ধারে এল। কাঠের পাত্রে জল তুলে ভাইকিংদের জল খাওয়াল। নিজেরাও খেল।

আবার পথ চলা শুরু হলো। ছোট ছোট নুড়িপাথর আর ধুলোভর্তি রাস্তা। মাঝে মাঝেই দমকা হাওয়া বইতে লাগল। ধুলো উড়তে লাগল। হ্যারিদের তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে হচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। হ্যারিদের মাঝে মাঝেই এরকম দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে বলেই চলার গতি কমে যাচ্ছে। এভাবেই চলল হ্যারিরা।

হ্যারিরা একটা জায়গায় এল। বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়া পাথরের চাই, ডান দিকে সবুজ ঘাসে-ঢাকা উপত্যকা মতো। হ্যারিরা কিছু বোঝবার আগেই একজন ভাইকিং বন্ধু চিৎকার করে বলে উঠল, আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি। কথাটা শেষ করেই বন্ধুটি দল থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ছুটল ডান দিকের উপত্যকার ওপর দিয়ে।

দলপতি সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুর দিকে ঘোড়া ছোটাল। এতটা পথ হেঁটে হেঁটে ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত বন্ধুটি বাঁধা দু'হাত নিয়ে বেশি দূর যেতে পারল না। দলপতি ঘোড়া

ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলল। তরোয়াল কোষমুক্ত করে মুহূর্তে ঢুকিয়ে দিল বন্ধুটির পিঠে। বন্ধুটি মুখে একটা শব্দ করল। তারপর ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গেল। ভাইকিংদের চোখের সামনে। ওরা প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না কী করবে। পরক্ষণেই শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো। সঙ্গে সঙ্গে ভাইকিং বন্ধুরাও চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো। প্রথমে শাঙ্কো ছুটে চলল দলপতির দিকে। পেছনে আরো কয়েকজন। হ্যারি বুঝল ভীষণ বিপদ। হ্যারি চিৎকার করে বলল, শাঙ্কো মাথা গরম করো না। কথা শোনো। বাঁধা হাত নিয়ে লড়াই হয় না। এভাবে লড়াইয়ে নামলে আমরা কেউ বাঁচবো না। ফিরে এসো।

ঘোড়ায় বসা দলপতিকে শাঙ্কো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, আপনি আমাদের বন্ধুকে মারলেন কেন? ও তো ধরা পড়তই। তবে কেন ওকে মেরে ফেললেন?

দলপতি বলল, এইরকম মৃত্যু দেখে আর কেউ পালাতে যাবে না।

শাঙ্কো আর অন্য বন্ধুরা মৃত বন্ধুটির কাছে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। তার মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেলল। অন্য বন্ধুদের চোখেও জল এল। ততক্ষণে হ্যারি ছুটে এসেছে। মৃত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারিও কেঁদে ফেলল। জলে-ভেজা চোখে দলপতির দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের নিরস্ত্র বন্ধুটিকে এভাবে হত্যা করলেন কেন? ও তো আপনাদের কাউকে আক্রমণ করেনি।

দলপতি বলল, ওসব বলে লাভ নেই। কাউকে পালাতে দেখলেই মেরে ফেলবো। চলো সব, দলে ঢোকো।

—না, বন্ধুটির শেষকৃত্য না করে আমরা যাবো না। হ্যারি বলল।

দলপতি খোলা তরোয়াল শূন্যে ঘুরিয়ে বলল, সবাই দলে যাও। আজ সন্ধের আগেই আমাদের সেভিল্লে পৌঁছতে হবে।

হ্যারি চেঁচিয়ে বলল, না, আমাদের মৃত বন্ধুকে ফেলে আমরা যাবো না।

সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

দলপতি ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, আমি যা বলবো তাই মানতে হবে। নইলে সবকটাকে মেরে ফেলবো।

শাঙ্কো, বিস্কো ছুটে দলনেতার সামনে এল। শাঙ্কো চিৎকার করে বলল, মারুন আমাদের।

সব ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

দলপতি বেশ ঘাবড়ে গেল। বুঝল, এরা এত ক্রুদ্ধ হয়েছে যে মরবে জেনেও খালি হাতে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে ইতস্তত করবে না। তারা মাত্র চারজন। কেউই রেহাই পাবে না।

দলপতি ডান হাত ওঠাল। ভাইকিংদের চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ হলো। দলনেতা বলল, তোমরা কী চাও?

হ্যারি বলল, আমরা আমাদের মৃত বন্ধুর শেষকৃত্য করে তবে যাবো।

—তার মানে বন্ধুকে কবর দিয়ে যাবে, এই তো? দলপতি বলল।

—হাঁ। তার আগে আমরা এখান থেকে নড়বো না। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে, কোথায় কবর দেবে দেখ। দলনেতা বলল।

ভাইকিং বন্ধুরা এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল এমন জায়গা যেখানে মাটি না খুঁড়েও পাথর চেপে সাজিয়ে কবর দেওয়া যায়। ভাইকিংরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল।

দলনেতা চিৎকার করে বলে উঠল, কেউ পালাবার চেষ্টা করলে বন্ধুর দশা হবে।

একজন ভাইকিং হ্যারিকে ডেকে বলল, হ্যারি, এই জায়গাটা দেখ তো। হ্যারি সেদিকে গেল। দেখল জায়গাটা ছোটি গুহার মতো। হ্যারি ভেবে দেখল এখানে কবর দেওয়া যেতে পারে। সে শাঙ্কোদের বলল সে কথা। শাঙ্কোরা পাঁচ ছ'জন মিলে গেল বন্ধুর মৃতদেহের কাছে। দেহটা কাঁধে করে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে গুহার কিছুটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। হাতে হাতে পাথরের বড় বড় টুকরো এনে মৃতদেহের ওপর চাপিয়ে দিল। বন্ধুর কবরের দিকে তাকিয়ে অনেকেই কেঁদে ফেলল। এই বিদেশে এক অপরিচিত পরিবেশে ওরা এক বন্ধুকে হারাল। তখনই হ্যারি শুনল ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, হ্যারি, তোমরা কোনো কিছুর প্রতিবাদ করো না। হ্যারি বুঝল ঐ ঝুঁকে পড়া পাথরের চাঙড়ের ওপাশ থেকেই কথাটা ভেসে এল। হ্যারি চিৎকার করে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, ভাইসব, ফ্রান্সিস আমাদের কাছাকাছিই আছে। কোনো ভয় নেই। ভাইকিং বন্ধুরা ধ্বনি তুলল, ও-হো-হো। দলপতি হ্যারির কথা কিছুই বুঝল না। ওরা কেন ধ্বনি তুলল তাও বুঝল না।

ফ্রান্সিস আবার চাপাস্বরে বলল—বন্ধুর মৃত্যুতে আমিও শোকাহত। কেঁদেছি। এখন তোমাদের উত্তেজিত হওয়া চলবে না। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করে বুদ্ধি দিয়ে সব ভাবতে হবে। তারপর পালাতে হবে।

ওদিকে কয়েদঘর থেকে বেরিয়ে হ্যারিরা এখন রাজা ফার্নান্দোর দলপতি ও তিনজন সৈন্যের পাহারায় সেভিল্লোর দিকে যাত্রা শুরু করল, তখন থেকেই কিছুটা দূরত্ব রেখে ফ্রান্সিসও ওদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

রাস্তায় সেভিল্লো থেকে আসা লোকজন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে আসছে দেখা গেল। এদিক থেকেও লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে।

রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা আসার পর ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল একটি লোক হ্যারিদের থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হেঁটে চলেছে। লোকটি কখনো হ্যারিদের দলের কাছে যাচ্ছে না বা ওদের পার হয়েও যাচ্ছে না। ফ্রান্সিস বুঝল লোকটি ওর মতোই এই বন্দী দলকে অনুসরণ করছে। লোকটির পরনে চাষীর পোশাক। গায়ে ঢোলাহাতা জামা। ফ্রান্সিস বুঝল ঐ লোকটির কোনো বন্ধু বা আত্মীয় এই বন্দীদের মধ্যে রয়েছে। একবার ভাবল লোকটির সঙ্গে পরিচিত হবে। জানবে সে এই বন্দীদের

পেছনে পেছনে যাচ্ছে কেন। পরক্ষণেই ফ্রান্সিস ভাবল আরো কিছুদূর যাই। দেখি ও আমার মতোই বন্দীদের অনুসরণ করছে কিনা।

বন্দীর দল চলেছে। নিরাপদ দূরত্ব রেখে ফ্রান্সিসও চলেছে।

হ্যারিরা থেমে যে গ্রাম থেকে জল খেল, ফ্রান্সিসও সেখানে জল খেল। ও কিছুটা জলে মাথা ভেজাল, হাতমুখ ধুল। কাঁধে গলায় যখন জল ছিটিয়ে দিচ্ছে তখনই দেখল সেই সাদা ঢোলাহাতা জামাপরা লোকটা ইঁদারার ধারে এল। ফ্রান্সিস এবার ভালো করে লোকটাকে দেখল। লোকটা বয়েসে ফ্রান্সিসের চেয়ে ছোট। ফ্রান্সিস জল তোলার পাত্রটা লোকটির হাতে দিয়ে বলল, যা গরম, কিছুতেই তেষ্টা মিটছে না। লোকটি বলল, ঠিকই বলেছেন। চড়া রোদ, ধুলোবালির ঝাপটা, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস আর কোনো কথা বলল না। তৃষ্ণার্ত লোকটা আগে জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাক। লোকটা প্রথমে পাত্রের জল সমস্তটাই মাথায়-ঘাড়ে ঢালল। আবার জল তুলল। কপাল-মুখ ধুয়ে ঢক ঢক করে জল খেল। আবার জল তুলে খেল। সবটা জল খেতে পারল না। জামার বোতাম খুলে গলায় বুকে জলটা ছিটিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস এবার বলল, তুমিও কি সেভিল্লা যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। লোকটি বলল। তারপরে ফ্রান্সিসকে আর ওর পোশাক দেখে বলল, মনে হচ্ছে তুমি বিদেশী।

—হ্যাঁ। বলল ফ্রান্সিস।

—তোমাদের দেশ কোথায়? লোকটি জিজ্ঞেস করল।

—আমরা ভাইকিং। ফ্রান্সিস বলল।

—বলো কি! তোমাদের জাহাজ চালানোর দক্ষতার কথা, বীরত্বের নানা কাহিনী আমরা শুনেছি।

ফ্রান্সিস বলল, চলো রাস্তায় নামি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।

বেশ, চলো। লোকটি বলল।

দু'জনে রাস্তায় এল। ফ্রান্সিস দেখল হ্যারিরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল, ভাই, একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও। কথাটা বলে ফ্রান্সিস জোরে হাঁটতে লাগল। লোকটিও ফ্রান্সিসের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে লাগল।

একটু পরেই দু'জনে বন্দীর দলের কাছাকাছি এল। ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই বেশ হাঁপাচ্ছে তখন।

আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে লোকটি বলল, দেশ ছেড়ে এই স্পেনে এসেছো কেন?

—নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে তাই। ফ্রান্সিস বলল।

—সেভিল্লা যাচ্ছো কেন?

—দেখ, ঐ বন্দী দলে আমার ভাইকিং বন্ধুরা রয়েছে। ওদের বিচারের জন্যে সেভিল্লায় রাজা ফার্নান্দোর দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি যাচ্ছি যদি কোনো

উপায়ে বন্ধুদের মুক্ত করা যায় তার জন্যে।

আমার ব্যাপারটাও তাই। লোকটি বলল, তুমি বন্ধুদের উদ্ধার করতে যাচ্ছো, আমি শুধু আমার বাবাকে মুক্ত করতে যাচ্ছি।

আগে তোমার নামটা বলো, তারপর সমস্ত ঘটনাটা বলো তো। ফ্রান্সিস বলল।

লোকটি বলল, আমার নাম বারাকা। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গেলে এই দক্ষিণ স্পেনের কিছুটা ইতিহাস তোমায় বলতে হয়। একটু থেমে বারাকা বলতে লাগল, প্রায় একশো বছর আগে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন খলিফা ইবন আবি আমীর। তাঁর রাজত্বে রাজধানী ছিল কারডোভা। সেভিল্লা থেকে বেশ কিছুটা দূরে। খলিফা ইবন আবি আমীর কারডোভা থেকে কিছুদূরে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। বারাকা থামল। তারপর বলতে লাগল, খলিফা বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। আমাদের একজন পূর্বপুরুষ তাঁর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। উত্তর স্পেনের এক রাজা কারডোভা আক্রমণ করছিলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে খলিফা নিহত হন। তখন জয়ী রাজা খলিফার ধনভাণ্ডারের খোঁজ করেন। কিন্তু কয়েক বছর ধরে রাজা আর তাঁর অমাত্যরা পুরোনো প্রাসাদ, নতুন প্রাসাদের কোষাগার তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই পাননি। বারাকা থামল।

—তারপর? ফ্রান্সিস বলল।

—আমাদের পূর্বপুরুষ বিপদ আঁচ করে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন। খলিফা আমীরের ধনসম্পদের খোঁজও পেল না কেউ। বারাকা থামল।

—আচ্ছা, মৃত্যুর পূর্বে খলিফা কি কাউকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর ধনসম্পদ তিনি কোথায়, কার জন্যে রেখে যাচ্ছেন? ফ্রান্সিস বলল।

—না, খলিফা আমীর কাউকে কিছু বলে যাননি।

—কোনো চিহ্ন, কোনো-নকশা, কোনো চিঠি? ফ্রান্সিস জিগ্যেস করল।

—না, ওসব কিছুই কেউ পায়নি। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল—খলিফা আমীর কোথায় গোপনে রেখে যেতে পারেন তাঁর ধনসম্পদ? আচ্ছা, এও তো হতে পারে—ফ্রান্সিস ভাবল, ধনসম্পদ যেখানে থাকার কথা সেখানেই রেখে গেছেন অর্থাৎ রাজকোষাগারে। কিন্তু কোনো রাজপ্রাসাদের কোষাগারে? নতুন যে প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন, না পুরনো রাজপ্রাসাদ? ফ্রান্সিস ভেবে দেখল এটা একটা অনুমান মাত্র। সঠিক বুঝতে গেলে পুরনো নতুন দুটো রাজপ্রাসাদই খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

দু'জনে হাঁটতে লাগল। ফ্রান্সিস বলল, তোমার বাবাকে বন্দী করা হয়েছে কেন?

আমাদের পূর্বপুরুষ আমীরের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজা ফার্নান্দোর কেমন বিশ্বাস হয়েছে ইবন আবি আমীর নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বপুরুষকে কোনো সঙ্কেত-নকশা বা সূত্র দিয়ে গেছেন তার গুপ্তধনের।

—সত্যি কি তোমাদের পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত জিনিসের মধ্যে তেমন কিছু



আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—কিচ্ছু না। রাজা ফার্নান্দোর এই দলপতি আমাদের হুয়েনভার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই পায়নি। এবার সেভিল্লায় আমাদের বাড়ি তল্লাশি হবে। জানি না কিছু না পেলে বাবাকে মুক্তি দেবে কিনা। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস বলল, বুঝলে বারাকা, সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে চিন্তা করতে হবে। কিছু কিছু জায়গা দেখতে হবে। তবেই আমি বলতে পারবো খলিফা ইবন আবি আমীরের গুপ্ত ধনভাণ্ডারের হদিস পাওয়া যাবে কিনা।

বিকেল হলো। রোদের তেজ কমল। দলপতি হ্যারিদের দিকে তাকিয়ে হুকুম দিল, তোমরা বাঁ দিকের ঐ জঙ্গলটার কাছে বসে বিশ্রাম নাও। আমি একটু গ্রামটা ঘুরে আসি। হুকুমমতো হ্যারিরা রাস্তা থেকে নেমে চলল জঙ্গলটার দিকে। জঙ্গলের গাছের ছায়ায় বসল হ্যারিরা। কেউ কেউ ঘাসের জমিতে শুয়ে পড়ল। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-পথশ্রমে ক্লান্ত হ্যারিরা বিশ্রাম করতে লাগল।

কয়েকটা কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি বাড়ি। ওটাই একটা গ্রাম। দলপতি ঐ বাড়িগুলোর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। প্রথম যে বাড়িটা পড়ল তার দরজায় আঙুল দিয়ে টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। দেখা গেল একজন বুড়ি দাঁড়িয়ে। বুড়ি ফোকলা মুখে হাসল। বলল, কী চাইছেন?

দলনেতা বলল, রান্না করা কিছু খাবার আছে?

—রান্না করা খাবার তো দুপুরেই খাওয়া হয়ে গেছে। বুড়ি বলল।

—পিঠে-টিঠে এমন কিছু নেই? দলনেতা জিগ্যেস করল।

—হ্যাঁ, আছে। আজকে আমার নাতির জন্মদিন। তাই বেশ কিছু পিঠে তৈরি করেছি। গাঁয়ের লোকজনকে নেমন্তন্ন করেছি। বুড়ি বলল।

—পিঠে কোথায়? নিয়ে এসো। দলপতি বলল।

বুড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকল। একটু পরে একটা কাঠের পাত্রে পিঠে নিয়ে এল। দলনেতা আট-দশটা পিঠে ওখানে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিল। তারপর জামার হাতার ভেতর থেকে একটা রুমাল বের করে বেশ কিছু পিঠে রুমালে বেঁধে নিল। বাড়িটার বাইরে এসে ঘোড়ায় উঠে সে আবার জঙ্গলটার কাছে ফিরে এল। এসে অন্য সৈন্যদের হাতে পিঠে-বাঁধা রুমালটা দিল। দলপতি নিজে ও সৈন্যরা পিঠে খেতে লাগল।

হ্যারিরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের পিঠে খাওয়া। পিঠে খাওয়া শেষ করে দলপতি হাত ঝাড়ল। হ্যারি আশা করেছিল হয়তো এক-আধটা পিঠে ওদের দেবে। হ্যারি নিজের জন্যে চায় না। ক্ষুধার্ত মারিয়ার কষ্টের কথাই ভাবছিল।

ফ্রান্সিস আর বারাকা দূর থেকে দলপতি আর সৈন্যদের পিঠে খাওয়া দেখল। বারাকা বলল, চলো ঐ বাড়িটায়। কিছু খাবার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমার বন্ধুরা এখনও উপবাসী। আমি কিছু খাবো না।

তুমি খেয়ে এসো।

বারাকা তখন ক্ষুধায় অস্থির। ও ছুটল সেই বাড়িটার দিকে, যে বাড়িটায় দলপতি ঢুকেছিল। ফ্রান্সিস রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে বারাকা রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে এল। হেসে বলল, এক বুড়ি তার নাতির জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্যে পিঠে তৈরি করে রেখেছিল। দলপতি অনেক পিঠে খেয়েছে, নিয়েও এসেছে। বাকি পিঠেগুলো আমিই সাবাড় করে এলাম।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। পিঠে খেয়ে পরিতৃপ্ত দলপতি ও সৈন্যরা ঘোড়ায় উঠল। দলপতি গলা চড়িয়ে বলল—এবার চলো সবাই। শাঙ্কোরা সকলেই বনের কাছে ঘাসের ওপর শুয়ে বসেছিল।

শাঙ্কো দলপতিকে বলল—আমরা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এখনও খাওয়া জোটে নি। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে যাবো।

—না-না—দলপতি মাথা নেড়ে বলল—আমাদের তাড়াতাড়ি সেভিল্লানগরে পৌঁছতে হবে।

—তাহলে আপনারা আগে সেভিল্লানগরে চলে যান। আমরা পরে যাচ্ছি। বিস্কো বলল।

—ইয়ার্কি হচ্ছে—না? দলপতি বলল—এক্ষুনি তরোয়ালের এক ঘায়ে মাথা উড়িয়ে দিতে পারি।

—তা পারেন। আমাদের বন্ধুকেও মেরেছেন—এজন্যে আপনার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই। বেশ তারিয়ে তারিয়ে পিঠে খেলেন। শাঙ্কো বলল।

—ভালো করেছি—দলপতি বলল। তারপর বলল—ঠিক আছে আর আধঘন্টা সময় দিচ্ছি। তারপর আর দেরি করা চলবে না। সেভিল্লানগরে যেতে হবে।

—বেশ—তাই হবে। শাঙ্কো বলল।

আসলে শাঙ্কো চাইছিল আরো অন্ধকার নামুক।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

এবার শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—আমার গলার কাছে জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আমার ছোরাটা বের করল। শাঙ্কো বলল—ছোরা ঘষে ঘষে আমার হাতে বাঁধা দড়িটা কাটো।

হ্যারি ছোরাটা কোনরকমে ধরে শাঙ্কোর হাত-বাঁধা দড়িটা ঘষে ঘষে কাটতে লাগল। একটু পরেই দড়ি কেটে গেল। শাঙ্কো এবার ছোরাটা হাতে নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে সবাইর হাতের দড়ি কাটল।

তখনই দলপতি চেঁচিয়ে বলে উঠল—অনেক বিশ্রাম হয়েছে—এবার ওঠো চলো।

অন্ধকারের মধ্যে শাঙ্কো বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল দলপতির ঘোড়াটার কাছে। দলপতি কিছু বোঝার আগেই শাঙ্কো ছোরার এক পোঁচে ঘোড়ার জিন-এর চামড়ার

ফিতেটা কেটে ফেলল। জিন খুলে মাটিতে পড়ে গেল। দলপতিও মাটিতে ছিটকে পড়ল। শাঙ্কো এক লাফে দলপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর দ্রুত ছোরাটা দলপতির বুকে বসিয়ে দিল। দলপতির গলা থেকে শব্দ হল—অঁক। দলপতি বারকয়েক মাথা এপাশ ওপাশ করে স্থির হয়ে গেল। দলপতি মারা গেল। ছোরাটা খুলে নিয়ে ছোরাটা ডানহাতে উঁচু করে ধরে শাঙ্কো চিৎকার করে উঠল—বন্ধুহত্যার প্রতিশোধ নিলাম। ভাইকিং বন্ধুরা চিৎকার করে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো।

শাঙ্কো অন্ধকারের মধ্যে চিৎকার করে বলল—বিস্কো—ফ্রেজার—বাকি সৈন্যদের আহত কর। পালাতে দিও না। দলপতির হাত থেকে ছিটকে পড়া তরোয়ালটা বিস্কো তুলে নিল। ছুটল একজন সৈন্যের দিকে। সৈন্যটি তরোয়াল চালাবার আগেই বিস্কো সৈন্যটির উরুতে তরোয়ালের ঘা বসাল। সৈন্যটি লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। আহত উরু ধরে ও গোঙাতে লাগল।

ওদিকে সাত-আটজন ভাইকিং একটা সৈন্যকে ঘিরে ফেলল। সৈন্যটি ঘোড়ার দু'পা উঁচু করাতে লাগল। ভাইকিংরা সরে সরে যেতে লাগল। এবার বিস্কো তরোয়াল হাতে ছুটে এসে ঘোড়াটার কোমরে তরোয়ালের কোপ বসাল। ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠল। সৈন্যটি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল।'

অন্য সৈন্যটি অবস্থা বেগতিক দেখে জোরে ঘোড়া ছোটাল। কয়েকজন ভাইকিংও ছুটল ঘোড়াটার পেছনে পেছনে। কিন্তু ঘোড়ার দ্রুত গতির সঙ্গে ভাইকিংরা পারবে কেন? অল্পক্ষণের মধ্যেই সৈন্যটি ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল।

অন্ধকারে হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—আমরা এখনও বিপদমুক্ত নই। যে সৈন্যটি পালিয়ে গেল সে নিশ্চয়ই সেভিল্লায় গিয়ে সংবাদ দেবে। আরও সৈন্য আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এখন আমরা কী করবো সেটা ভেবে ঠিক করতে হবে।

শাঙ্কো বলল—এখন আমরা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত। বেশি দূর যেতে পারবো না। এই বনের মধ্যেই আমরা আত্মগোপন করে থাকবো।

—কিন্তু ঐ সৈন্যটি সেভিল্লা গেল। ওদের সেনাপতি সৈন্যদের নিশ্চয়ই এখানে নিয়ে আসবে। এবার ওরা চারদিকে আমাদের খুঁজে বেড়াবে। এই জঙ্গলেও ওরা নিশ্চয়ই তল্লাশি চালাবে। আমরা আবার ধরা পড়বো। হ্যারি বলল।

—কিন্তু এখন এই বনে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না। তারপর ভাগ্যে যা আছে হবে। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—আমরা সারাদিন কিছু খাই নি। তিনটে ঘোড়া আমরা পেয়েছি। ঘোড়ায় চড়ে সেভিল্লা থেকেই হোক বা অন্য গ্রাম ট্রাম থেকেই হোক—কিছু খাবার আর জলের ব্যবস্থা তো করতে হয়।

—ঠিক আছে। আমি বিস্কো আর পেড্রো যাবো খাবার আর জলের খোঁজে। তোমরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়ো। শাঙ্কো বলল।

হ্যারিরা বনের মধ্যে ঢুকে গেল। অন্ধকারে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে চলল। বন খুব ঘন না। ছাড়া ছাড়া ওক গাছ চেস্টনাট গাছ। লতাপাতা। বড় বড় ফার্ন গাছ। একটা ফাঁকে জায়গা পেয়ে হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—তোমরা এখানেই বসো। শাঙ্কোদের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। সবাই ঘাসে ঢাকা মাটিতে বসল। কয়েকজন শুয়েও পড়ল।

হ্যারিও বসল। শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। হ্যারি হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তখনই হঠাৎ দেখল উত্তরদিকে কিছু গাছগাছালির পরেই একটা টিলামত। হ্যারি উঠে পড়ল। ডাকল—ফ্রেজার। ফ্রেজার এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—দ্যাখো তো ওটা কী? ফ্রেজারও অন্ধকারের মধ্যে উঁচু টিলামত দেখল। বলল—মনে হচ্ছে টিলা। খুব বড় নয়।

—চলো তো—দেখে আসি। হ্যারি বলল।

—টিলা দেখে কী হবে। ফ্রেজার বলল।

—ভুলে যেও না আমরা বন্দীদশা থেকে পালিয়েছি। এখনও আমাদের জীবন নিরাপদ নয়। প্রয়োজনে লুকিয়ে আশ্রয় নিতে পারি এমন জায়গা ওটা কিনা দেখতে হবে। চলো। হ্যারি বলল।

হ্যারি আর ফ্রেজার চলল টিলাটার দিকে। কাছে এসে অন্ধকারেও দেখল টিলাটা কালো ছায়ার মত। ফ্রেজার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিলাটা দেখতে লাগল। হ্যারি টিলাটা চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। পশ্চিম দিকে দেখল টিলাটির মধ্যে একটা ছোটমুখ গুহার মত। হ্যারি গুহামুখে এসে দাঁড়াল। দেখল ছোট গুহামুখ দিয়ে একজন মানুষ হামা দিয়ে ঢুকতে পারে। কিন্তু কতদূর ঢুকে যেতে পারবে তা বোঝা যাচ্ছে না। হ্যারি বলল—ফ্রেজার—গুহার ভেতরে একটু যেতে পারবে?

—এটা না পারার কী আছে। ফ্রেজার বলল। তারপর এগিয়ে গেল গুহাটার দিকে। হামা দিয়ে গুহাটার ভেতরে ঢুকল। তখনই ঝট্‌পট্‌ শব্দ তুলে একপাল চামচিকে গুহাটা থেকে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক পালাতে লাগল। প্রথমে ফ্রেজার চমকে উঠল। পরক্ষণে একটু পিছিয়ে এসে গুহা মুখটা খোলা রাখল। চামচিকেগুলোরও বেরিয়ে আসতে অসুবিধে হল না।

এবার ফ্রেজার হামা দিয়ে ঢুকল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হামা দিয়ে চলল। হঠাৎ ওর মনে হল এখন গুহাটা বড় লাগছে। ফ্রেজার উঠে দাঁড়াল। বুঝল গুহার মুখটাই ছোট। ভেতরটা অনেক বড়।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে ফ্রেজার পাথুরে দেয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চলল। হঠাৎ সামনে মনে হল নিরেট পাথর। ফ্রেজার হাত বাড়িয়ে দেখল এবড়ো খেবড়ো পাথরের দেয়াল যেন। ফ্রেজার বুঝল গুহাটা এখানেই শেষ।

ফ্রেজার ফিরে চলল। হামা দিয়ে গুহামুখ থেকে বের হল। তখন ও বেশ হাঁপাচ্ছে। হ্যারি এগিয়ে এল। বলল—কী দেখলে?

—কিছুই না—একটা লম্বা বড় গুহা। মুখটা ছোট হলে কি হবে ভেতরটা বেশ বড়। অনায়াসে হেঁটে এগোনো যায়। কিছুদূর গিয়ে গুহাপথ শেষ। সামনে নিরেট পাথুরে দেয়াল। ফ্রেজার বলল।

দু'জনে বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে বসল। বন্ধুরা জানতে চাইল হ্যারিরা কোথায় গিয়েছিল। হ্যারি টিলার কথা গুহার কথা বলল।

ওদিকে শাঙ্কো বিস্কো আর পেড্রো বড় রাস্তা ধরে ঘোড়ায় চড়ে চলল। কতকটা আন্দাজেই সেভিল্লানগরের দিকে চলল।

পাশে তিনটে গ্রাম পেল। বাড়িঘর ঘোর অন্ধকার। এসব গ্রামে একসঙ্গে অত খাবার দাবার পাওয়া যাবে না।

একসময় সেভিল্লানগরে এসে ওরা পৌঁছল। নগরের নির্জন পথে পথে কোথাও কোথাও মশাল জ্বলছে। বাড়িঘরদোরে আলোর চিহ্নও নেই। সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শাঙ্কো একটা সরাইখানা খুঁজছিল। ওদের কপাল ভালো। একটা সরাইখানা পেল। সরাইখানার মধ্যে মোমবাতির আলো জ্বলছে।

ওরা সরাইখানার বন্ধ দরজার সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল। কাঠের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। দরজা খুলে গেল। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল পাকা দাড়িগোঁফওয়ালা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো এগিয়ে গেল। বলল—দেখুন—আমরা খুব দূর থেকে আসছি। আমাদের বন্ধুরা সেভিল্লার বাইরে অপেক্ষা করছে। আমরা ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত পরিশ্রান্ত। আমাদের জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন?

—নিশ্চয়ই পারবো। আপনারা ভেতরে আসুন। প্রৌঢ় বলল। শাঙ্কোরা সরাইখানার মধ্যে ঢুকল। দেখল—কয়েকজন লোক একতাল ময়দা ঠাসছে। রুটি হবে। এবার প্রৌঢ় বলল—আপনারা সংখ্যায় ক'জন?

—ছাব্বিশ জন। বিস্কো বলল।

—ঠিক আছে। এই ময়দা দিয়ে কালকে সকালের জন্যে রুটি তৈরি হবে। এখন আমরা দোকানের সেই খাবার করবো না। আপনাদের জন্যে রুটি করে দেব। লোকটি বলল।

—রুটির সঙ্গে মাংস করে দিতে পারেন? বিস্কো বলল।

—মাংস রাঁধতে দেরি হবে। আপনারা ক্ষুধার্ত। বেশি দেরি করা চলবে না। আলু আর আনাজপত্র দিয়ে একটা খাবার করে দিচ্ছি। এটা খুব তাড়াতাড়ি হবে।

—ঠিক আছে। শাঙ্কো বলল। তারপর তিনজনে টানা কাঠের বেঞ্চে বসল।

প্রথমে রাঁধুনিরা রুটি তৈরি করল। একটা বুনো লতা দিয়ে তৈরি বেশ বড় ঝুড়িতে রুটি রাখল। এবার আলু আনাজপত্র দিয়ে তরকারিমত করল। শাঙ্কো এগিয়ে এল। বলল তরকারির ঝোলটা কমাও। ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যেতে হবে। চল্‌কে না পড়ে।

রাঁধুনিরা কিছুক্ষণ তরকারিটা ফুটিয়ে ঝোল কমিয়ে আনল।

এবার শাঙ্কো প্রৌঢ় দোকানির কাছে এল। কোমরের ফেট্টি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে প্রৌঢ় দোকানদারকে দিল। বলল—এবার আমাদের এক পীপে জল দিন। প্রৌঢ় রাঁধুনিকে বলল—এক পীপে জলের ব্যবস্থা কর। একজন রাঁধুনি চলে গেল।

শাঙ্কো প্রৌঢ়কে বলল—ঐ রুটির ঝুড়ি তরকারি রাখার কাঠের পাত্র আর জলের পীপে—সব আমরা নিয়ে যাবো। ফেরৎ দিতে পারবো কিনা—বলতে পারছি না। তবে স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এতেই আপনার সবকিছুর দাম উঠে যাবে। প্রৌঢ় খুশির হাসি হাসল।

এবার রাঁধুনি জলভরা পীপে নিয়ে এল। শাঙ্কোরা দোকানের বাইরে এল।

ওরা একটা ঘোড়ার পিঠে রুটির ঝুড়িটা রাখল। বিস্কো ঘোড়াটার পিঠে উঠে রুটির ঝুড়িটা ধরল। পেড্রো নিল জলের পীপেটা। ঘোড়ার পিঠে উঠে পীপেটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডানহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে রইল। শাঙ্কো অন্য ঘোড়াটায় উঠল। রাঁধুনিকে ডাকল। রাঁধুনিদের একজন এল। শাঙ্কো বলল—তরকারির কাঠের পাত্রটা তুলি দিতে। রাঁধুনি পাত্রটা শাঙ্কোর হাতে তুলে দিল।

তিনজনে খাবার আর জল নিয়ে অন্ধকারে সদর রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ চলার পর পেড্রো বলল—এভাবে চললে তো পৌঁছোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—উপায় নেই। এর চেয়ে জোরে ঘোড়া ছোটালে সব ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। শাঙ্কো বলল।

—ঠিক আছে আস্তে আস্তেই চলা যাক। বিস্কো বলল।

ওরা ঘোড়ার গতি বাড়াল না। ঘোড়া চলল ঠুক্ ঠুক করে।

সেভিল্লা নগর শেষ হল। তখনই আকাশে চাঁদ দেখা গেল। জোছনা অনুজ্জ্বল। সামনেই টানা রাস্তা চলে গেছে। সবকিছুই অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ওরা রাস্তা ধরে ঘোড়া চালাল। কিন্তু গতি বাড়াল না।

একটু দেরিই হল। শাঙ্কোরা সেই জঙ্গলের কাছে পৌঁছাল। ঘোড়া থেকে নামল। খাবার আর জলের পীপে নিয়ে ওরা বনে ঢুকল। খুব ঘন বন নয়। এখানে ওখানে অস্পষ্ট জ্যোছনা পড়েছে।

হঠাৎ শাঙ্কো দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—নিঃশব্দে এগোলে বন্ধুরা আমাদের শত্রু ভাবতে পারে। কাজেই হ্যারির নাম ধরে ডেকে ডেকে এগোতে হবে।

তিনজন আবার চলল। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—হ্যারি। বিস্কোও ডাকল—হ্যারি। ডাকতে ডাকতে একটু পরেই হ্যারির ডাক শুনল—শাঙ্কো—তোমরা এদিকে এসো।

হ্যারির ডাক শুনে অন্ধকারে দিক আন্দাজ করে শাঙ্কোরা হ্যারিদের কাছে এল। শাঙ্কো বলল—আগে সবাইকে জল খেতে দাও। জলের পীপেটা মাটিতে

নামিয়ে কাঠের গ্লাসগুলো বিস্কো নিল। পীপের ছিপি খুলে গ্লাস গ্লাস জল সবাইকে দিতে লাগল। তৃষ্ণার্ত ভাইকিং বন্ধুরা জল খেয়ে যেন নতুন জীবন পেল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—সবাই শুকনো পাতা নিয়ে এসো। পাতাগুলো একত্র করে থালার মত বানাও। তারপর রুটি তরকারি নিয়ে খাও। সবাই জঙ্গলের এদিক ওদিক গিয়ে শুকনো বড় পাতা কুড়িয়ে আনল। লাইন দিয়ে বসল। হ্যারি বলল—শাঙ্কো তোমরাও খেতে বসো। আমি আর ফ্রেজার তোমাদের খেতে দিচ্ছি। তোমরা এখন ক্লান্ত।

হ্যারি আর ফ্রেজার সবাইকে রুটি তরকারি দিতে লাগল। মারিয়া কিন্তু খেতে বসল না ক্ষুধার্ত ভাইকিং বন্ধুরা খেতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলের খাওয়া হয়ে গেল। রুটি তরকারি জল খেয়ে ভাইকিং বন্ধুরা তৃপ্ত হল। গায়ে নতুন শক্তি পেল যেন। এবার মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি তোমরা খেতে বসো। হ্যারি আর ফ্রেজার খেতে বসল। মারিয়া ওদের খাবার এগিয়ে দিল। দু'জন খেতে লাগল। দু'জনের খাওয়া হতে মারিয়া খেতে বসল।

খাবার ও জল খেয়ে পরিতৃপ্ত ভাইকিংরা ঘাসে ঢাকা মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু হ্যারি জেগে রইল। ওর মন বলতে লাগল এখনও বিপদ কাটেনি। একজন সৈন্য পালিয়েছে। ও সেভিল্লা গিয়ে নিশ্চয়ই সেনাপতিকে সব কথা বলবে। সেনাপতি অনেক সৈন্য নিয়ে এই বনের ধারে চলে আসবে। দেখবে—দলপতি মারা গেছে আর দু'জন সৈন্য আহত হয়ে পড়ে আছে। সেনাপতি সবই বুঝবে। বনে ঢুকে ওদের তল্লাস করবে। ওদের পেলে সেনাপতি কোনো কথা শুনবে না। সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করবে।

এসব ভাবতে ভাবতে হ্যারির একটু তন্দ্রা এসেছিল। তখনই বনের দক্ষিণ দিকে অনেক ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেল। জেগে থাকা হ্যারি চমকে উঠল। ডাকল—শাঙ্কো—বিস্কো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। চাঁদের আলোয় দেখল—সবাই ঘুমিয়ে আছে।

শাঙ্কো বুঝল—আক্রমণ হবেই। ঘুম ভেঙে শাঙ্কো বিস্কো হ্যারির কাছে এল। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—আমি দক্ষিণদিকে যাচ্ছি। বনের আড়াল থেকে দেখে আসি—ঘোড়ায় চড়ে কারা আসছে।

—যাও—তবে খুব সাবধানে। হ্যারি বলল।

শাঙ্কো চলে গেল। হ্যারিদের কথাবার্তার শব্দে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেল। মারিয়া উঠে হ্যারির কাছে গেল। বলল—কী ব্যাপার হ্যারি?

—কিছু অশ্বারোহী সৈন্য আসছে। এরা কারা জানি না। শাঙ্কো দেখতে গেছে। তবে আমার মনে হয় যে সৈন্যটি পালিয়ে গিয়েছিল সেই বোধহয় রাজার সেনাপতিকে সংবাদ দিয়েছে—আমরা লড়াইয়ে জিতেছি ওরা হেরে গেছে। আমাদের খোঁজে নিশ্চয়ই একদল অশ্বারোহী সৈন্য এসেছে।

—এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—দেখতে হবে—আমরা বনে আশ্রয় নিয়েছি এটা ওরা বুঝতে পেরেছে কিনা। হ্যারি বলল।

—যদি বুঝতে পারে? মারিয়া বলল।

—তাহলে আমরা টিলাটার মধ্যে যে গুহাটা আছে সেই গুহায় আশ্রয় নেব। গুহার মুখটা ছোট। প্রায় হামা দিয়ে ঢুকতে হবে। তারপরে বেশ বড়। দাঁড়িয়ে থাকা যায়। হ্যারি বলল।

—তাহলে সেই গুহাতেই চলো। মারিয়া বলল।

—আগে শাঙ্কো ফিরে আসুক। ওর কাছে সবকিছু শুনি। তারপর গুহায় আশ্রয় নেবার কথা ভাববো। হ্যারি বলল।

ওদিকে গাছের আড়ালে আড়ালে চলে শাঙ্কো বনের দক্ষিণ দিকটায় এলো। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ঐ দিকেই শোনা যাচ্ছিল।

শাঙ্কো বনের গাছের আড়ালে দাঁড়াল। গাছের ফাঁকে লুকিয়ে দেখল কাছেই প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ঘোড় সওয়ার সৈন্য ঘোড়া থেকে নামল।

অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আকাশ সাদাটে হয়ে গেল। বনের গাছগাছালিতে পাখির ডাক শুরু হল।

কিছু পরেই সূর্য উঠল। ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরে বনে স্নিগ্ধ রোদ ছড়াল।

তখনও শাঙ্কো ঠিক বুঝতে পারছে না এই সৈন্যরা কারা? এরা এখানে এসেছে কেন? এদের পরনে ঢোলা হাতা জামা। বুকে বর্ম মাথায় শিরস্ত্রাণ নেই। কোমরের মোটা চামড়ার কোমরবন্ধনী। তাতে তরোয়াল ঝুলছে।

তখনই ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একজন সৈন্য ঘোড়ার গাড়িটা চালাচ্ছে। সৈন্যরা ধরাধরি করে দলপতির মৃতদেহ আর আহত দুই সৈন্যকে গাড়িতে তুলল। গাড়ি চলে গেল।

এইবার শাঙ্কো বুঝতে পারল সেই পলাতক সৈন্যটিই খবর দিয়েছে। তাই রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা শাঙ্কোদের খোঁজে এসেছে। একজন মোটা গোঁফওয়ালা লোক হাত নেড়ে নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছিল। বোঝা গেল এই লোকটাই সেনাপতি।

শাঙ্কো আর দাঁড়াল না। বন্ধুদের খবর দিতে হয়।

শাঙ্কো বনের মধ্যে দিয়ে ছুটল। হ্যারিদের কাছে এসে বলল রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি এসেছে। দলপতি আর আহত দুই সৈন্যকে নিয়ে গেছে। যে ঘোড়া তিনটে আমরা পেয়েছিলাম বনের ধারেই ঐ ঘোড়া তিনটে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয়ই ঘোড়া তিনটে পেয়েছে। বুঝেছে আমরা বেশিদূর যেতে পারি নি। এই বনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি এই সন্দেহ ওদের হবেই। কাজেই দেরি না করে এই বন ছেড়ে পালাতে হবে। শাঙ্কো থামল।

—কিন্তু কোন দিক দিয়ে পালাবো? হ্যারি বলল।

—ওরা রয়েছে বনের দক্ষিণ দিকে। আমরা উত্তর দিক দিয়ে পালাবো। এক্ষুনি পালাতে হবে। শাঙ্কো বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। সবার সামনে শাঙ্কো। ওই নিয়ে চলল ভাইকিং বন্ধুদের। মারিয়ার সঙ্গে হ্যারি চলছিল। দ্রুতই ছুটল সবাই। সাবধানে ছুটতে হচ্ছে গাছগাছালির মধ্য দিয়ে।

উত্তরের দিকের বনভূমি শেষ হল। শাঙ্কো ইঙ্গিতে সবাইকে থামতে বলল। একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল দশ-বারো জন অশ্বারোহী সৈন্য উত্তর দিকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

শাঙ্কো চিন্তায় পড়ে গেল। উত্তর দিকটায় পাহারা রাখা হয়েছে যখন তখন পূব পশ্চিমেও পাহারা রাখা হয়েছে। পালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শাঙ্কো হ্যারির কাছে এল। বলল—হ্যারি—আমরা খুবই বিপদে পড়লাম। কোন দিক দিয়েই আর পালাতে পারবো না। বনটা ঘিরে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে।

—এই বনের প্রায় মাঝামাঝি একটা টিলা। টিলার মধ্যে একটা গুহা আছে। সেখানে আমরা আশ্রয় নিতে পারি। এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। হ্যারি বলল।

—তাহলে সবাই সেই গুহায় চলো। শাঙ্কো গলা চড়িয়ে বলল।

সবাই ফিরে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিলাটার কাছে এল। পেড্রো জলের পীপেটা কাঁধে নিয়ে আসছিল। এবার পীপে মাটিতে নামিয়ে কাঠের গ্লাসে সবাইকে জল খাওয়াল।

তারপর শাঙ্কো এগিয়ে এল। একজন একজন করে হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটার মধ্যে ঢুকতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। হ্যারি মারিয়ার পেছনে পেছনে ঢুকল। গুহার মুখের কাছেই মারিয়াকে বসাল। নিজেও বসল। শাঙ্কো গুহার মুখেই দাঁড়িয়ে রইল।

সময় বয়ে চলল। শাঙ্কোরা শুধু পাখির ডাক কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছিল।

বেলা বাড়তে লাগল। গুহার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া ভাইকিংরা গুহার পাথুরে এবড়ো খেবড়ো দেয়ালে পিঠ রেখে বসে আছে। বাইরে কী হচ্ছে ওরা জানে না। সবাই চুপচাপ বসে আছে।

গুহার গরমে সবাই কমবেশি ঘামছে। কপালের ঘাম নেমে আসছে চোখ পর্যন্ত। ঘাম মুছছে আর অপেক্ষা করছে কখন এই দমবন্ধকরা গুহার বাইরে যাবে।

গুহার মুখে শাঙ্কো সতর্কভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। কান পেতে শব্দ শুনছে। শাঙ্কো ধরেই নিয়েছিল রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা বনের মধ্যে তল্লাশি চালাবে। কিন্তু তেমন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

হঠাৎই শাঙ্কোর কানে এল চড়্চড়্ শব্দ। শব্দটা অস্পষ্ট। শাঙ্কো গুহার মধ্যে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—হ্যারি—একবার এখানে এসো তো।

হ্যারি অন্ধকারে আস্তে আস্তে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। শাঙ্কো বলল—কান পেতে শোন তো কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হ্যারি কান পাতল। তারপর চমকে উঠে বলল—শাঙ্কো—আমরা ভীষণ বিপদে পড়লাম।

—কী হয়েছে? কীসের শব্দ? শাঙ্কো বলল। হ্যারি ভীতস্বরে বলল—সৈন্যরা

বনে আগুন লাগিয়েছে। কাঁচা পাতা পুড়ছে। চড়্‌বড়্‌ শব্দ হচ্ছে।

—সর্বনাশ। শাঙ্কো বলে উঠল। তারপর হ্যারিকে বলল—কী করবে এখন?

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি বনের পশ্চিম দিকে যাও আর বিস্কো থাক পুবদিকে। দেখে এসো ঐ দুই দিকেও আগুন লাগিয়েছে কি না।

শাঙ্কো আর বিস্কো এক মুহূর্ত দেরি করল না। ছুটে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল। বলল—হ্যারি কী হয়েছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে শব্দটব্দ শুনে মনে হচ্ছে সৈন্যরা বনে আগুন লাগিয়েছে। আমাদের পুড়িয়ে মারবে। হ্যারি বলল।

—কী সাংঘাতিক! এখন কী করবে? মারিয়া বলল।

—পালাবার পথ খুঁজতে হবে। শাঙ্কো আর বিস্কো গেছে খোঁজখবর করতে। হ্যারি বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শাঙ্কো আর বিস্কো ফিরে এল। বলল—পুব পশ্চিম দু'দিকেই আগুন লাগানো হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আগুনের বেড়াজালে পড়ে যাবো। মৃত্যু সুনিশ্চিত।

হ্যারি মুখ নিচু করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর গলা চড়িয়ে বলল— ভাইসব —আমরা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। জানি না কী করে এই বিপদ থেকে বাঁচবো। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা এই বনের চারধারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চারদিক থেকে আগুন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এমন একটা অবস্থায় আমরা যে ছুটে পালাবো তারও কোনো উপায় নেই। এবার তোমরা কী করতে চাও বলো। হ্যারি বলল।

—আমরা আগুনের মধ্যে দিয়ে পালাতে পারি। একজন ভাইকিং বলল।

—অসম্ভব। হ্যারি বলল। শাঙ্কো বলল—হ্যারি—আমরা এই গুহায় লুকিয়ে থাকতে পারি। আগুন নিভে গেলে পালাবো।

শাঙ্কো ঠিক বলেছে। বিস্কো বলল।

হ্যারি বলল—আমিও এই উপায়ই ভেবেছি। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে আমরা বাঁচতে পারবো না।

—কিন্তু এই গুহার চারপাশে যখন আগুন এগিয়ে আসবে তখন অসহ্য গরমে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়বো। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ। এদিকটাও আমি ভেবেছি। আর একটা কথাও ভাবতে হবে। চারপাশের আগুন একই সময়ে এই গুহাটার বাইরে আসবে না। আগুন আসবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। কাজেই আমাদের আগুনের উত্তাপ সহ্য করতে হবে দফায় দফায়। সেটা আমরা পারবো। হ্যারি বলল।

—হ্যারি—একটা কথা ভেবেছো? শাঙ্কো বলল।

—কী কথা? হ্যারি বলল।

—লক্ষ্য করে দেখ—এই টিলাটার গায়ে কোনো গাছগাছালি নেই। গাছগাছালি

লতাপাতা ঝোপ রয়েছে প্রায় পঁচিশ তিরিশ হাত দূরে। অতদূরের আগুন আমাদের খুব ক্ষতি করতে পারবে না। শাঙ্কো বলল।

হ্যারি বলল—তবু আগুনের হলকা এই টিলার গায়ে এসে লাগবেই। প্রচণ্ড উত্তাপ আমাদের সহ্য করতে হবে। হ্যারি বলল। কেউ কোনো কথা বলল না।

বিপদের গুরুত্ব বুঝে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি বলল—আগুনের হল্‌কা সহ্য করতে হবে দফায় দফায়। কী পারবে সহ্য করতে? ভাইকিং বন্ধুরা আস্তে ধ্বনি তুলল—ও-হো-হো। হ্যারি বলল—আজ আমাদের সহ্য-শক্তির পরীক্ষা। আগুন নিভে গেলেই আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে যাবো। ফার্নান্দোর সৈন্যরা ধরেই নেবে আমরা আগুনে পুড়ে মরেছি। আগুনের মধ্যে ওরা আর আসবে না দেখতে আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি। রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা চলে গেলেই আমরা মুক্ত।

—তাহলে উপায় নেই—আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আগুনের হল্‌কা সবই সহ্য করতে হবে। একজন ভাইকিং বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল। আরো বলল—আগুন শুকনো গাছপালা লতা ঝোপ পাবে না। কাঁচা গাছপালা লতা ঝোপের আগুন খুব ভয়ঙ্কর হয় না। এটাও মেরির আশীর্বাদ। সবাই মনস্থির করে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করার জন্যে তৈরি হও। এই উত্তাপ সহ্য করতে পারলেই আমাদের মুক্তি।

সবাই চুপ করে বসে রইল।

এবার কাঁচা গাছের পাতা পোড়ার চট্‌চট্‌ শব্দ শোনা গেল। অনেক স্পষ্ট। সবাই বুঝল—আগুন এই টিলাটার চারপাশে চলে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদিকে আগুন ছড়াল। আগুনের হল্‌কা গুহার মধ্যে ঢুকল। সবাই চুপ করে উত্তাপ সহ্য করতে লাগল। চারপাশে আগুন এগিয়ে এল গুহাটার দিকে। এবার আগুনের হল্‌কা প্রচণ্ড বেড়ে গেল। সবাই দর্‌ দর্‌ করে ঘামতে লাগল। কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না।

হঠাৎ গুহার অন্ধকারে মারিয়ার গোঙানি শোনা গেল। শাঙ্কো বন্ধুদের ঠেলে ঠেলে সরিয়ে মারিয়ার কাছে এল। বলল—রাজকুমারী—আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? মারিয়া কথা বলতে পারল না। তারপরে অস্ফুটস্বরে বলল—জ-অ-ল। শাঙ্কো বিস্কোকে ডাকল। বলল—পীপে থেকে এক গ্লাস জল দাও। বিস্কো অন্ধকারে পীপেটা খুঁজে পেল। একটা কাঠের গ্লাসও। গ্লাসে জল ঢেলে বিস্কো শাঙ্কোর দিকে গ্লাসটা এগিয়ে বলল—নাও। শাঙ্কো জলের গ্লাসটা অন্ধকারে হাতড়ে নিল। মারিয়ার হাতে জলের গ্লাসটা দিয়ে বলল—রাজকুমারী জল খান। মারিয়া দুর্বল হাতে গ্লাসটা ধরল। হাতে কোন সাড় নেই যেন। মারিয়া গ্লাসটা ধরে থাকতে পারল না। হাত কাঁপতে কাঁপতে জলসুদ্ধু গ্লাসটা গুহার মেঝেয় পড়ে গেল। মারিয়ার মুখ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে এল। বিস্কো তাড়াতাড়ি আর এক গ্লাস জল ভরে এগিয়ে ধরল। এবার হ্যারি অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়িয়ে বলল—আমাকে জলের গ্লাসটা



দাও। বিস্কো হ্যারির হাতে জল দিল। অন্ধকারে কিছুটা আন্দাজে হ্যারি মারিয়ার কাছে এল। প্রথমে মারিয়াব মাথাটা ধরে আস্তে আস্তে ওঠাল। মারিয়াকে পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাল। হ্যারি আস্তে ডাকল—বাজকুমারী? প্রথম ডাকে মারিয়া সাড়া দিল না। হ্যারি আবার ডাকল—বাজকুমারী? এবার বোধহয় মারিয়া হ্যারির ডাক শুনতে পেল। দুর্বল কণ্ঠে বলল—জ-অ-ল। হ্যারি অন্ধকারেই মারিয়ার মাথাটা ধরল। হ্যারি মাথা থেকে হাত ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে এল। কপাল ভুরু নাম মুখে এসে আঙুল রাখল। আস্তে বলল—রাজকুমারী, মুখ হাঁ করুন, আমি জল ঢেলে দিচ্ছি। মারিয়া মুখ হাঁ করল। হ্যারি আঙুল দিয়ে মারিয়ার মুখের হাঁ-তে আস্তে আস্তে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। মারিয়া জল খেল। আবার পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা ছেড়ে দিয়ে বসে রইল।

বাইরে আগুনে হাওয়া হ্যারিদের গুহাব মুখে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। হ্যারিরা সকলেই দাঁত চেপে প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে লাগল। আগুনের হল্‌কা ঢুকতে লাগল গুহার মুখ দিয়ে। মুখ হাত পা যেন ঝল্‌সে যেতে লাগল।

হঠাৎ হ্যারি মারিয়ার মৃদুস্বরে ডাক শুনল। মাবিয়া কেমন যেন হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে বলল—হ্যারি—আমি—এই—অসহ্য গরমে—শ্বাস নিতে—পারছি —না। আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল—বলেন কি। মারিয়া বলল—আমি মরি —ক্ষতি নেই। তোমরা গুহা থেকে বেবিয়ে ধরা দিও না।

হ্যারি একটু গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব, রাজকুমারী সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে এক্ষুনি গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বাজকুমারীর জীবন বাঁচাতে আমাদের ধরা দিতে হবে।

শাঙ্কো বলল—আমরা তাতে রাজি। এবার রাজকুমারীকে গুহার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

শাঙ্কো অন্ধকারে আন্দাজ করে করে মারিয়াব কাছে এল। অন্ধকারে মারিয়ার ঘাড়ের নিচে ডান হাত রাখল। বাঁ হাতে হাঁটুর কাছটা ধরল। তারপর রাজকুমারীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে অন্ধকার গুহাব মুখে এল। তারপর রাজকুমারীকে পাথুরে মেঝেয় আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল।

হঠাৎ একঝলক হাওয়া গুহার মুখে ঢুকল। হাওয়ার সেই প্রচণ্ড উত্তাপটা আর নেই। কিন্তু মারিয়ার হাঁপধরা ভাবটা একেবারে কমল না। শাঙ্কো বলল—রাজকুমারী—আপনাকে এবার একা হামাগুড়ি দিয়ে গুহার বাইরে বেরোতে হবে।

মারিয়া আস্তে আস্তে উঠে বসল। মৃদুস্বরে থেমে থেমে বলল—এখন আমার শরীর ভালো লাগছে। তোমরা আমার জন্য ধরা দিও না।

—আপনি অসুস্থ হয়েছেন। বাইরে গেলে আপনি ভালোভাবে নিশ্বাস নিতে পারবেন। [illegible] সুস্থ হবেন। শাঙ্কো বলল—

বেবোলে তোমবা সবাই তো ধবা [illegible] আবার সেই

বন্দীজীবন। মারিয়া আস্তে আস্তে বলল। তখনও মারিয়ার হাঁপধরা ভাবটা যায় নি।

—আপনি আমাদের জন্য ভাববেন না। ধরা পড়লেও আবার বন্দী হলেও ফ্রান্সিস মুক্ত আছে। ফ্রান্সিস ঠিক একটা উপায় বের করবে যাতে আমরা আবার মুক্তি পাবো।

মারিয়া আর কোনো কথা বলল না। হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে গুহার মুখটা পার হল। মারিয়ার পেছনে একে একে সবাই বেরিয়ে এল। এটুকু পেরোবার পরিশ্রমেও মারিয়া কাহিল হয়ে পড়ল। আগুনের মত গরম গুহামুখে একটা পাথরে মারিয়া বসে পড়ল। মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগল। হ্যারি সেটা দেখে বুঝল গুহার ভেতরে থাকলে মারিয়াকে বাঁচানো যেত না। ঠিক সময়েই মারিয়াকে বাইরে আনা গেছে।

বাইরে তখন জঙ্গল পুড়ে সব সাফ। দক্ষিণ দিকে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা জড়ো হয়ে এতক্ষণ আগুন দেখছিল। সব জঙ্গল পুড়ে যেতে ফার্নান্দোর সেনাপতি ও সৈন্যরা হ্যারিদের দেখতে পেল। ওরা ধরেই নিয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করা ভাইকিংরাও পুড়ে মরেছে। তাই তারা বেশ আশ্চর্য হল। আগুনের এত উত্তাপের মধ্যে গুহার মধ্যে থেকে ওরা কী করে বাঁচল।

হ্যারি দু'হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী দেখাল। রাজা ফার্নান্দোর সেনাপতি দেখল সেটা।

আগুন তখনও একেবারে নিভে যায় নি। এখানে ওখানে তখনও ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। সেনাপতি একটা ঘোড়ায় উঠল। পোড়া জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে হ্যারিদের কাছে এল।

একটু হাঁপধরা গলায় বলল—তোমরা আমাদের দলনেতাকে হত্যা করেছো। কয়েকজনকে আহত করেছো। সেভিল্লায় রাজা ফার্নান্দোর রাজদরবারে তোমাদের বিচার হবে। তোমরা সবাই বন্দী হলে।

হ্যারি বলল—আপনাদের দলপতি আমাদের এক বন্ধুকে বিনা কারণে হত্যা করেছিল। আমরা তার বদলা নিয়েছি। সেনাপতি বলল—সে সবের বিচার হবে।

হ্যারি বলল—তাহলে এখন আমরা কী করবো? ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমরা অবসন্ন। আগে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করুন। তারপর আমাদের নিয়ে যা করবার করবেন।

—এখনও আগুন সম্পূর্ণ নেভে নি। আগে আগুন নিভুক। এখনই এই পোড়া বন পার হয়ে তোমরা যেতে পারবে না। সেনাপতি বলল।

—তাহলে তো আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হয়। বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—আগুন একেবারে নিভে গেলে তোমরা পোড়া বন পার হতে পারবে। সেনাপতি বলল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে পোড়া বন পার হয়ে সৈন্যদের কাছে ফিরে গেল।

হ্যারিরা উত্তপ্ত পাথরে বসে রইল। মারিয়া এখন অনেকটা সুস্থ। ওদের আর

পালাবার উপায় রইল না।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকার নামল। হ্যারি বলল—এবার চলো—পোড়া জঙ্গল পার হয়ে যাই।

—এখনই? বিস্কো বলল।

—হ্যাঁ—হ্যারি বলল—এখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পোড়া বনের কোথাও আগুন জ্বলা থাকলে সহজেই আমাদের নজরে পড়বে। এখনই পোড়াবন পেরুতে হবে। চলো।

ভাইকিংরা এখানে ওখানে বসেছিল। হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল—ভাইসব—পোড়া বন পার হয়ে চলো! দেখে দেখে—সাবধানে।

ভাইকিংরা সবাই উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কো হ্যারিকে বলল—এই অন্ধকারে আমরা তো পালিয়ে যেতে পারি।

হ্যারি বলল—বনের চারপাশ ঘিরে রেখেছে সৈন্যরা। আমাদের পালাবার উপায় নেই। তখনই বনের চারপাশে মশাল জ্বলে উঠল। উত্তরমুখো মশালের আলোর দিকে লক্ষ্য রেখে হ্যারিরা এগোতে লাগল। পোড়া ছাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ছে।

একসময় হ্যারিরা সেনাপতির সামনে এসে দাঁড়াল। সেনাপতি হুকুম দিল—এদের দু'পাশ থেকে ঘিরে নিয়ে চলো। অশ্বারোহী সৈন্যরা হ্যারিদের দু'পাশে দাঁড়াল। সামনে রইল ঘোড়ার পিঠে সেনাপতি। তারপরেই দু'টো মশাল হাতে দুজন। সবাই রওনা হল।

মশালের যেটুকু আলো তারই সাহায্যে হ্যারিরা চলল। সবচেয়ে বেশি কষ্ট হতে লাগল মারিয়ার। ঐ প্রচণ্ড উত্তপ্ত গুহায় মারিয়া অনেক কষ্ট সহ্য করেছে। তারপরে এখন হেঁটে যেতে হচ্ছে। মারিয়ার পাশে পাশেই হ্যারি হাঁটছিল। হ্যারি বুঝল মারিয়ার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

হ্যারি কিছুটা দূরে ছুটে গিয়ে সেনাপতির সামনে দাঁড়াল। গলা চড়িয়ে বলল—আমার একটা কথা ছিল।

—সেনাপতি ঘোড়ার পিঠে বসা থেকে বলল—বলো।

আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেশের রাজকুমারী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ একটি মেয়েকে তোমাদের সঙ্গে দেখলাম। সে তো রোদেপোড়া একেবারে তামাটে গায়ের রং। পরেছেও এক অদ্ভুত পোশাক। সেই মেয়েটিই তোমাদের রাজকুমারী। সেনাপতি হেসে উঠল। এই অপমানজনক কথা শুনে হ্যারির গা পিত্তি জ্বলে গেল। হ্যারির আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু উপায় নেই। রাজকুমারী এত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বলল—আপনাদের তো অনেক ঘোড়া। একটা ঘোড়া যদি রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্যে দেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব।

—বন্দীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না। সেনাপতি বলল।

—এই নিয়মটা পুরুষ বন্দীদের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু খুবই অসুস্থ কোনো নারী বন্দীর ক্ষেত্রে এই নিয়ম নেই। হ্যারি বলল।

—ঠিক আছে। সেনাপতি একজন ঘোড়সওয়ার সৈন্যকে নেমে আসতে বলল। সৈন্যটি ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল। হ্যারি মারিয়ার কাছে গেল। বলল—রাজকুমারী আপনি একা ঘোড়ায় চড়ে যেতে পারবেন?

—আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি। কিন্তু আমার এখন শরীরের যা অবস্থা সাহস পাচ্ছি না। মারিয়া বলল। হ্যারি শাঙ্কোকে ডাকল। বলল—তুমি ঘোড়ায় চড়ে রাজকুমারীকে নিয়ে যাও।

—বেশ। শাঙ্কো এগিয়ে এল। শাঙ্কো লাফিয়ে ঘোড়াটার পিঠে উঠল। তারপর বলল—হ্যারি তোমরা রাজকুমারীকে তুলে আমার সামনে বসিয়ে দাও। হ্যারি বিস্কোরা কয়েকজন মারিয়াকে তুলে ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। শাঙ্কো মারিয়াকে বাঁ হাতে ধরে রেখে ঘোড়া চালাতে শুরু করল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর হ্যারিরা সেভিল্লা নগরে পৌঁছল। রাস্তার দু'পাশে বাড়িঘর দোর। এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। বাড়িগুলোর জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

হ্যারিদের কয়েদঘরের সামনে নিয়ে আসা হল। কয়েদঘরের পাহারাদার দু'জন এগিয়ে এল। অন্য পাহারাদারটি ঢং-ঢং শব্দে লোহার দরজা খুলল। ভাইকিংরা সবাই ঢুকল। শাঙ্কো মারিয়াকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে এল। মারিয়া এলোমেলো পা ফেলে কয়েদঘরের দরজার দিকে চলল। তাই দেখে হ্যারি দ্রুত সেনাপতির কাছে গেল। বলল—আমাদের রাজকুমারী খুবই অসুস্থ। তাকে যদি রাজার অন্দরমহলে নজরবন্দী রাখা হয় তাহলে খুবই ভালো হয়। কয়েদঘরের ঐ পরিবেশে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

—আমার কিছু করার নেই। রাজাজ্ঞায় তোমাদের বন্দী করেছি। এখন কালকে রাজদরবারে রাজা ফার্নান্দো যে আদেশ দেবেন তাই প্রতিপালিত হবে। সেনাপতি বলল।

হ্যারি বন্ধুদের কাছে ফিরে এল। এক এক করে ভাইকিংরা কয়েদঘরে ঢুকতে লাগল।

কয়েদঘরে জানালা বলে কিছু নেই। সেই উঁচুতে দু'দিকে দুটো বড় খোঁদল। ঐ খোঁদল দুটোই জানালা। কয়েদঘরের পাথুরে দেয়ালের গর্তে দুটো মশাল রাখা হয়েছে। সেই মশালের আলোয় হ্যারি ঘরটা ভালো করে দেখল। পালাবার উপায় নেই।

মেঝেয় শুকনো ঘাস পাতার বিছানা। ভাইকিংরা কেউ কেউ বসল কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। পাথুরে দেয়ালের গায়ে মারিয়াকে হ্যারি ঠেস দিয়ে বসাল। তারপর চলল জলের খোঁজে। এককোনায় দেখল বেশ বড় একটা পীপে। হ্যারি পীপের ঢাকনা খুলে দেখল জল ভরা। ও বন্ধুদের ডেকে বলল—এখানে যথেষ্ট জল আছে।

তোমরা জল খাও।

হ্যারির কথা শুনে ভাইকিংরা উঠে দাঁড়াল। সবাই জল খেতে এল। বেশ ভিড় হয়ে গেল। পীপের পাশে রাখা কাঠের গ্লাস দিয়ে জল তুলে সবাই খেতে লাগল। কয়েকজন জল খেল আর জল তুলে ঘাড়ে মাথায় ঢালল। তৃষ্ণার জল পেয়ে সবাই বাঁচল যেন।

ভিড় কমলে হ্যারি পীপেটার কাছে গেল। কাঠের গ্লাসে জল ভরে নিয়ে এল মারিয়ার কাছে। মারিয়া ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিল। আরও জল নিয়ে এল। মারিয়া খেল। বাকি জলটা মাথায় কপালে ঢালল। মারিয়া এতক্ষনে একটু সুস্থ বোধ করল।

হ্যারি এবার পরপর তিন গ্লাস জল খেল। তারপর চলল দরজার দিকে। লোহার গরাদে মুখ চেপে ডাকল—পাহারাদার—ও পাহারাদার। একজন পাহারাদার এগিয়ে এল। হ্যারি বলল—আমরা খুবই ক্ষুধার্ত। আমাদের খাবারের ব্যবস্থা কর। পাহারাদার কোনো কথা না বলে চলে গেল। এ রকম অভব্য ব্যবহার পেয়ে হ্যারির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। হ্যারি সহজে রেগে যায় না। এখন ভীষণ রাগ হল ওর। হ্যারি লোহার দরজায় ঝাঁকুনি দিল। ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠল। আবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলল। বন্ধুরা অবাক। হ্যারির মত ঠাণ্ডামাথার মানুষ রেগে গেছে। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। ওরা হ্যারির কাছে এল। বিস্কো বলল—হ্যারি কী ব্যাপার?

—ঐ একটা পাহারাদারকে ডেকে খেতে দিতে বললাম—লোকটা কোনো কথাই শুনল না। একটাও কথা না বলে চলে গেল। হ্যারি বলল।

—দাঁড়াও—দেখাচ্ছি মজা। শাঙ্কো বলল। তারপর সবাইকে ডেকে বলল—ভাইসব—এই লোহার দরজা সবাই মিলে ঝাঁকাও। সবাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একসঙ্গে দরজাটা ধরে ঝাঁকাতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দ উঠল। দু'জন পাহারাদারই ছুটে এল। এক পাহারাদার আবার নাকি সুরে কথা বলে। সে চ্যাঁচাতে লাগল—কীঁ হঁচ্ছে? কীঁ হঁচ্ছে। চলল দরজা ঝাঁকানো। একজন পাহারাদার এবার লোহার মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে তরোয়ালের খোঁচা দিতে লাগল। দু'জন ভাইকিং ঘায়েল হল। শাঙ্কো চেঁচিয়ে বলল—ভাইসব—দরজা থেকে সরে এসো। সবাই দ্রুত পিছিয়ে গেল। দরজায় ধাক্কা বন্ধ হল।

হ্যারি শরীরের দিক থেকে বরাবরই দুর্বল। অতক্ষণ আগুন-ঘেরা গুহায় থাকা পথ হাঁটা এত ধকল হ্যারি সহ্য করতে পারল না। শুকনো ঘাসপাতার বিছানায় হাত পা ছেড়ে শুয়ে পড়ল। ওর মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বের হতে লাগল। মারিয়াই প্রথম শুনল সেটা। মারিয়া তাড়াতাড়ি হ্যারির কাছে এল। বসে পড়ল। হ্যারির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মারিয়া ডাকল—শাঙ্কো—এ দিকে এসো। শাঙ্কো কাছে এল। মারিয়া বলল—হ্যারি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শিগগির জল নিয়ে এসো। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে জলের জালার কাছে গেল। এক গ্লাস জল নিয়ে ফিরে এল। গ্লাসটা নিয়ে মারিয়া মুখ নিচু করে বলল—হ্যারি খাবার জল। আস্তে আস্তে

ঢালছি। খেয়ে নাও। হ্যারি আস্তে আস্তে মুখ খুলল। মারিয়া অল্প অল্প করে হ্যারির মুখে জল ঢালতে লাগল। হ্যরি জল খেতে লাগল। গ্লাসের জল শেষ হল। শাঙ্কো আবার জল নিয়ে এল। মারিয়া আধ গ্লাস জল খাওয়াল। বাকি জলে হ্যারির কপাল চোখ ধুইয়ে দিল।

একটু পরে হ্যারি চোখ মেলে তাকাল। গোঙানির শব্দ বন্ধ হল। মারিয়া ঝুঁকে পড়ে বলল—হ্যারি এখন কেমন লাগছে?

হ্যারি অল্প হাসল। আস্তে বলল—ভালো লাগছে। মারিয়া ও অন্য বন্ধুরা এতক্ষণে হাসল।

শাঙ্কো বিছানায় উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ভাইসব—সারাদিন আমরা কিছু খাই নি। ক্ষুধায় আমাদের শরীর টলছে। রাতের খাবার আমরা এখুনি খাবো। ভাইকিং বন্ধুরা হৈ হৈ করে শাঙ্কোর কথা সমর্থন করল।

এবার শাঙ্কো লোহার দরজার কাছে এল। দেখল এখন চারজন পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। সেই থুতনিতে দাড়িওয়ালা পাহারাদারটিও আছে। শাঙ্কো তাকেই বলল—ও ভাই—আমদের খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি কথাটা কানেই তুলল না। শাঙ্কো আবার বলল। পাহারাদারটি কোনো কথাই বলল না।

ততক্ষণে কয়েকজন ভাইকিং উঠে এসে শাঙ্কোর পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল নজরদার পেড্রো। পেড্রো বন্ধুদের পেছনে লাগতে ওস্তাদ। পেড্রো দেখল ব্যাপারটা। ও প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল—এই ছাগলদাড়ি। চিৎকার শুনে পাহারাদার দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ল। আরো কয়েকজন ভাইকিং দরজার কাছে এল।

দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি তরোয়াল উঁচিয়ে ছুটে এল। নাকিসুরে বলল—কেঁ? কেঁ বঁলেছে কঁথাটা? পেড্রো এগিয়ে এসে নাকিসুরে বলল—আঁমি—আঁমি বঁলেছি কঁথাটা।

পাহারাদারটি একবার সঙ্গীদের দিকে আর একবার পেড্রোর দিকে তাকাতে লাগল। কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

এবার পেড্রো নাকিসুরে বলল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি খেঁতে দেঁ তাঁড়াতাঁড়ি।

এবার ভাইকিংরা কয়েকজন পেড্রোর সঙ্গে গলা মেলাল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি—খেঁতে দেঁ তাঁড়াতাঁড়ি। আস্তে আস্তে সব ভাইকিংরা দরজায় এসে ভিড় করল। সমস্বরে বলতে লাগল—এঁই ব্যাঁটা ছাঁগলদাঁড়ি—খেঁতে দেঁ তাঁড়াতাঁড়ি।

এবারে দাড়িওয়ালা পাহারাদারটি বলল—দাঁড়াও—দেঁখাচ্ছি মঁজা। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটল। ভাইকিংরাও চুপ করল।

কিছু পরে দেখা গেল সেনাপতি আসছে। সঙ্গে সেই পাহারাদার।

ওরা লোহার দরজার সামনে এল।

সেনাপতি বলল—আমাদের প্রহরীকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছো কেন?

—খিদের জ্বালায়। শাঙ্কো বলল।

—তার মানে? সেনাপতি বলল।

হুয়েনভা থেকে এই সেভিল্লায় হাত বাঁধা অবস্থায় আমাদের হাঁটিয়ে আনা হয়েছে। আমরা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত। এখানে খাবার জল পেয়েছি। কিন্তু এখনও খাবার পাই নি। আপনার প্রহরীকে এই কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাদের কথা কানেও তুলল না। বিস্কো বলল।

সেনাপতি একটু ভাবল। তারপর বলল—তোমাদের রাতের খাবার এখনই দেওয়া হবে। কোনরকম গোলমাল পাকালে চাবুক খেতে হবে। মনে থাকে যেন।

সেনাপতি দরজার কাছ থেকে সরে গেল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। দলপতি চলল তার পেছনে পেছনে। ভাইকিংরা গিয়ে বিছানায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল।

দাড়িওয়ালা পাহারাদারের জায়গায় অন্য এক পাহারাদারকে দেখা গেল।

সেনাপতির হুকুমেই বোধহয় হ্যারিদের তাড়াতাড়ি খেতে দেওয়া হল। খাবার খেয়ে হ্যারিরা শুয়ে বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

ওদিকে ফ্রান্সিস আর বারাকা গাছের আড়াল থেকে হ্যারিদের দেখছিল। হ্যারিরা তখন বনের পাশের ঘাস-ঢাকা প্রান্তরে শুয়েবসে বিশ্রাম করছিল।

বারাকা বলল—এখন এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। তোমার বন্ধুদের এখন মুক্ত করা যাবে না। তাই বলছিলাম চলো আমরা সেভিল্লা নগরে চলে যাই। ওখানে কয়েদঘরের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করি। দলপতি নিশ্চয়ই ওদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখবে। ফ্রান্সিসও ভেবে দেখলো এখন কিছুতেই বন্ধুদের মারিয়াকে মুক্ত করা যাবে না। বরং সেভিল্লা নগরে গিয়ে কয়েদঘরের কাছে অপেক্ষা করা ভাল। কয়েদঘরের পাহারাদারদের পাহারা দেওয়ার নিয়ম জানা যাবে হ্যারিদের কীভাবে মুক্ত করা যায় তাও ভেবে ঠিক করা যাবে। ফ্রান্সিস বলল—চলো—আমরা আগেই চলে যাই।

ফ্রান্সিস আর বারাকা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চলল সেভিল্লা নগরের দিকে।

সেভিল্লা নগরে যখন এসে পৌঁছল তখন সন্ধে হয়েছে। সদর রাস্তায় কোথাও কোথাও মশাল জ্বলছে। বাড়িঘরদোরে মোমবাতির আলো।

বারাকা কয়েদঘরের কাছে ফ্রান্সিসকে নিয়ে এল। কয়েদঘরের দরজায় দুটো মশাল জ্বলছে। দু'জন সশস্ত্র পাহারাদার খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

ফ্রান্সিস কয়েদঘরের সামনে মাঠটায় বসল। বারাকাও ওর পাশে বসল।

সময় বয়ে চলল। কিন্তু হ্যারিদের দেখা নেই।

বারাকা বলল—চলো—তোমার বন্ধুদের আসার আগে আমরা কিছু খেয়ে আসি গে। ফ্রান্সিস হেসে মাথা নাড়ল। বলল—বন্ধুরা এখনও উপবাসী। আমি কী করে খাবো? ওরা আসুক—এখানে খাবার খাক্ জলটল খাক্—তবেই আমি খেতে যাবো।

বারাকা একটু আশ্চর্যই হল। বলল—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমিও উপোস করে থাকবে?

—হ্যাঁ—আমি এখন কিছু খাবো না। তুমি খেয়ে এসো। ফ্রান্সিস বলল। বারাকা কী ভাবল। বলল—না তোমার বন্ধুরা না খাওয়া পর্যন্ত আমিও কিছু খাবো না।

দু'জনে মাঠটায় বসে রইল।

রাত বাড়তে লাগল। বন্ধুদের দেখা নেই।

একসময়ে ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—বারাকা এখানে বসে থেকে বন্ধুদের খোঁজ পাওয়া যাবে না। আমাদের সেই বনের কাছে যেতে হবে। ঐ বনের ধারেই বন্ধুরা বিশ্রাম করছিল।

—বেশ চলো। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে হুয়েনভা থেকে হেঁটে এখানে এসেছি। আবার হাঁটবে? বারাকা বলল।

—উপায় নেই। বন্ধুরা কোথায় আছে কেমন আছে এটা না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বন্ধুদের জন্যে খুব ভাবো—তাই না? বারাকা বলল।

—বন্ধুরাও আমার জন্যে ভাবে। ফ্রান্সিস বলল। বারাকা উঠে দাঁড়াল। বলল—চলো তাহলে।

দু'জন সদর রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। বেশ রাত হয়েছে। রাস্তাঘাট নির্জন।

একসময় ফ্রান্সিস বলল—বারাকা—তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তুমি এখানে খেয়ে নিতে পারো।

—না। বারাকা মাথা নেড়ে বলল—তুমি তোমার বন্ধুরা যখন খাবে আমিও তখন খাবো।

নগর ছাড়িয়ে দু'জনে চলল সেই বনভূমির দিকে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর দু'জনে সেই বনভূমির কাছে এল।

অন্ধকারে যতটা দেখল তাতে বুঝল বন্ধুরা এখানে নেই। তবে ওরা গেল কোথায়?

হঠাৎই গোঙানি শুনল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোঙানির শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল ফ্রান্সিস অন্ধকারে সেইদিকে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্রান্সিস দেখল অন্ধকারে কে ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। ফ্রান্সিস কাছে গেল। এবার অন্ধকারে দেখে ও বুঝল লোকটি রাজা ফার্নান্দোর সৈন্য।

ফ্রান্সিস মাটিতে বসল। সৈন্যটিকে জিজ্ঞেস করল—কী ব্যাপার ভাই? তুমি আহত হয়েছো। এখানে কি লড়াই হয়েছে? সৈন্যটি জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

—আমি ভাইকিং। আমার বন্ধুদেরই তোমরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলে। তারা কোথায়? তাদের কী হয়েছে? তোমরা কি আমার নিরস্ত্র বন্ধুদের মেরে ফেলেছো? সৈন্যটি মাথা নেড়ে বলল—না। তোমার বন্ধুরাই দলপতিকে হত্যা করে আমাদের আহত করে গেছে। শুধু একজন সৈন্যই পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

—আমার বন্ধুরা কোথায়?

—তা জানি না। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ে নি। সৈন্যটি বলল—ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। বলল—তাহলে তোমাদের মধ্যে যে সৈন্যটি পালাতে পেরেছিল সে নিশ্চয়ই সেনাপতিকে এই সংবাদ দেবে। সেনাপতিও সৈন্য নিয়ে আমাদের বন্ধুদের খুঁজতে আসবে।

—আর এসে কী হবে? সবাই পালিয়ে গেছে। সৈন্যটি বলল।

—কোনদিকে পালালো?

—কাঁধে তরোয়ালের ঘা লেগেছে। এই অবস্থায় আমি আমার কথাই ভাবছি—কতক্ষণে ওষুধ পড়বে—আমি অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবো। আর কারো কথা ভাবি নি। সৈন্যটি বলল।

ফ্রান্সিস বলল—বারাকা—বন্ধুরা নিশ্চয়ই হুয়েনভা বন্দরে আমাদের জাহাজে চলে গেছে। আমার ফেরার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। চলো আমাদের হুয়েনভা বন্দরে যেতে হবে।

—বেশ—চলো। আবার সেই হেঁটে। আমি তো তবু কিছু খেয়েছি পেটপুরে, জলও খেয়েছি। তুমি তো নির্জলা উপোসী। পারবে হেঁটে যেতে। বারাকা বলল।

—নিশ্চয়ই পারবো। পারতেই হবে। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি বন্ধুদের খুব ভালোবাসো—তাই না? বারাকা বলল।

—হ্যাঁ—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। ওরাও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ফ্রান্সিস বলল।

এবার দু'জনে চলল হুয়েনভা বন্দরের দিকে। যখন ওরা হুয়েনভা বন্দরে পৌঁছল তখন ভোর হল। ফ্রান্সিসের চোখে রোদ পড়তে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। রোদ ছড়াল চারদিকে।

ফ্রান্সিস বেশ ছুটেই ওদের জাহাজের কাছে এল। ও হাঁপাচ্ছে তখন। জাহাজ জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। তার মানে বন্ধুরা জাহাজে ফেরে নি। তবে কোথায় গেল ওরা?

জাহাজের মাস্তুলের আড়াল থেকে কে যেন মুখ বাড়াল। তাহলে একজন তো আছে। বন্ধুটি মাস্তুলের আড়াল থেকে আবার মুখ বার করল। আরে! এ তো ভেন।

ফ্রান্সিস বারাকাকে ডাকল—চলো—জাহাজে উঠবো। দু'জনে পাতা কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে জাহাজে উঠল।

ভেন মাস্তুলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। ফ্রান্সিস ভেনকে জড়িয়ে ধরল। বলল—ভেন—তোমার খোঁজ রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা পায় নি।

—আমি আটা ময়দার বস্তার পেছনে লুকিয়েছিলাম। আমাকে তাই ধরতে পারে নি। ভেন হেসে বলল। ওরা ডেক-এ বসল।

এবার ফ্রান্সিস ভেনকে সব ঘটনা বলল। শেষে বলল—এখনও বন্ধুদের কোনো খোঁজ পেলাম না। এবার সেই বনের ধারে যেতে হবে। বনেও ঢুকতে হবে। হয়তো

হ্যারিরা বনে আশ্রয় নিয়েছে।

—ঠিক আছে। তাই যাও। তার আগে উপোসী তুমি কিছু খেয়ে যাও। ভেন বলল।

—অসম্ভব। বন্ধুরা মারিয়া কেউ খায় নি এখনও। ফ্রান্সিস বলল।

—ফ্রান্সিস—আমি একজন চিকিৎসক। আমি বলছি—এই উপোসে থাকা আর এইসব দুশ্চিন্তা তোমার দেহের ক্ষতিই করবে। তুমি এতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তুমি অসুস্থ হলে আমরা দিশেহারা হয়ে যাবো। একটু থেমে ভেন বলল—ফ্রান্সিস কথা শোন। তোমাকে সুস্থ থাকতেই হবে। খেতে এসো। আমার খাবার তৈরিই আছে। তোমরা খাবে এসো।

তিনজনেই খাবার ঘরে এল। ভেন দু'জনকে কাঠের থালা গ্লাস দিল। খাবার দিল। জল দিল। ফ্রান্সিস পরপর তিন গ্লাস জল খেল।

ফ্রান্সিস হেসে বলল—ভেন—এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি আমি কতখানি তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত। ভেন বলল—ফ্রান্সিস—আমরা সবাই তোমার নির্দেশেই চলি। সেই তোমাকে এখন সুস্থ সবল থাকতে হবে। নাও খেতে শুরু কর। মোটা রুটি আর মাংসের ঝোল। ফ্রান্সিস হাপুস্ হাপুস্ খেতে লাগল। বারাকাও সমান আগ্রহে খেতে লাগল।

খাওয়া শেষ হল। ফ্রান্সিস বলল—তোমার খাবার আমাদের দিলে।

—তাতে কি? আমি রেঁধে নেব। ভেন বলল—তোমাকে এই বিপদের সময় সুস্থ থাকতে হবে সবল থাকতে হবে।

তিনজনে জাহাজের ডেক-এ উঠে এল। তারপর পাতা পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে তীরে উঠল।

এবার দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চলল সেভিল্লার দিকে। একসময় বারাকা বলল—তোমার বন্ধুরা কোথায় আছে বলে তোমার ধারণা।

—ঐ বনে। ওরা দলপতির সৈন্যদের লড়াইয়ে হারিয়ে ঐ বনেই আত্মগোপন করে আছে। এটা আমি আগে ভাবিনি। এখন ভাবছি। ফ্রান্সিস বলল।

—তোমার কী মনে হয়? তোমার বন্ধুরা ঐ বনে লুকিয়ে আছে এই সংবাদটা কি সেনাপতি পেয়েছে? বারাকা বলল।

—নিশ্চয়ই পেয়েছে আর এতক্ষণে সেই বনভূমিতে তল্লাশি শুরু করেছে। বন্ধুরা ধরা পড়বেই। আমি ধরে নিয়েছিলাম ওরা লড়াইয়ে জিতেই জাহাজে ফিরে আসবে। কিন্তু ওরা তা করে নি। ফ্রান্সিস বলল।

—এটা তো বোকামির কাজ হল। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস মৃদু হেসে বলল—বারাকা—আমরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালোবাসি। আমাকে না নিয়ে ওরা জাহাজে ফিরবেই না।

—তোমাদের মধ্যে এত বন্ধুপ্রীতি? বারাকা বলল। ফ্রান্সিস হাসল।

দু'জনে রাস্তার এমন একটা জায়গায় এল যেখান থেকে ঐ বনটা দেখা যায়।

সেখানে এসে দু'জনে দেখল বনের মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডুলি। তার মানে বনে আগুন লাগানো হয়েছে। ফ্রান্সিস অস্ফুটস্বরে বলল—কি মর্মান্তিক। তারপর দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বলল—বারাকা তাড়াতাড়ি এসো। বারাকা গতি বাড়াল। ও ভেবে আশ্চর্য হল—সেই কাল রাত থেকে ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। এখনও হাঁটছে। অথচ ফ্রান্সিসের এখনও কোনো ক্লান্তি নেই কোনো কষ্ট নেই। সটান হেঁটে চলেছে। শুধু ওর জোরে-জোরে শ্বাস পড়ছে।

দু'জনে দূর থেকে দেখল সেই জ্বলন্ত বনটা ঘিরে রাজা ফার্নান্দোর সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে। কিছু অশ্বারোহী সৈন্যও রয়েছে। সেনানায়ক ঘোড়ায় চড়ে বনের আগুনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আশেপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আগুন দেখতে এসেছে। তারা গোল হয়ে সৈন্যদের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিস আর বারাকা তাদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রইল।

আগুন উঁচুতে উঠল। কাঁচা গাছগাছালি লতাপাতা ঝোপ পুড়ছে। জোর চট্ চট্ শব্দ উঠেছে। শুকনো বন নয়। তাই আগুন খুব একটা তেজি আগুন নয়।

কিছুক্ষণ সময় গেল। ফ্রান্সিস এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আগুনের দিকে।

হঠাৎ বারাকা লক্ষ্য করল—ফ্রান্সিসের দু' চোখ জলে ভিজে উঠেছে। ফ্রান্সিস জামার হাতা দিয়ে দু'চোখ মুছল। অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলল—যদি আমার একজন বন্ধুও পুড়ে মরে তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি প্রথমে সেনাপতিকে আর পরে রাজা ফার্নান্দোকে আমি হত্যা করবো। তাতে যদি আমার জীবন যায়—পরোয়া নেই।

আস্তে আস্তে আগুনের তেজ কমে আসতে লাগল। গাঢ় ধোঁয়া উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আগুন নিভু নিভু হল। এখানে ওখানে তখনও আগুন। ধোঁয়া উঠছে।

তখনই ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল টিলাটা। টিলাটার গায়ে আগুনের কালচে দাগ। ফ্রান্সিস তখন পায়চারি করতে লাগল। আগুন আরও নিভে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এখনও ঐ ছাইচাপা আগুন পার হয়ে দেখতে যাওয়া যাবে না।

তখনই ফ্রান্সিস দেখল হ্যারি টিলাটার সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনে শাঙ্কো মারিয়াকে ধরে ধরে একটা পাথরের চাঙ-এর ওপর বসাল। হ্যারি দু'হাত ওপরে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী করল।

ফ্রান্সিস জীবিত মারিয়া হ্যারিদের দেখে চিৎকার করে উঠল—ও-হো-হো। সেই ধ্বনি অবশ্য হ্যারিরা শুনতে পেল না।

ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল—চলো—মাঠটায় বসি।

দু'জনে এসে মাঠটায় বসলো।

তখন সন্ধে হয়েছে। চারদিকে সৈন্যরা মশাল জ্বালল।

হ্যারিরা পোড়া বনের ছাইয়ের ওপর দিয়ে সাবধানে এল। আত্মসমর্পণ করল। সেনাপতির নির্দেশে হ্যারিদের দু'পাশে ঘিরে নিয়ে সবাই চলল সেভিল্লার দিকে। অন্ধকারে পেছনে পেছনে ফ্রান্সিস আর বারাকাও চলল।

সেভিল্লা নগর পৌঁছল সবাই।

হ্যারিদের কয়েদঘরে বন্দী করে রাখা হল।

ফ্রান্সিসরা অন্ধকারে মাঠে বসে রইল।

রাত বাড়ল।

হ্যারিদের যখন খেতে দেওয়া হল তখন ফ্রান্সিস বলল—বারাকা এবার তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো।

চলো। বারাকা বলল। দু'জনে রাস্তায় এল। চলল পূর্বদিকে।

দু'জনে যখন বারাকার বাড়িতে পৌঁছল, অন্ধকারের মধ্যেও দেখে ফ্রান্সিস বুঝল বাড়িটা বেশ বড়। কাঠ আর পাথরে তৈরি। কাঠের দরজাটার সামনে এসে বারাকা দাঁড়াল। তারপর দরজায় আঙুল ঠুকে শব্দ করল। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। বড় জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির মুখেচোখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার ছাপ। বারাকাকে দেখে ও বলে উঠল, দাদা, বাবা ছাড়া পেল না?

—না। বারাকা দরজা পার হয়ে বলল, ফ্রান্সিস, এসো।

ফ্রান্সিসকে নিয়ে বারাকা ভেতরের ঘরে এল। দেখল এক শুভ্রশয্যায় একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। বারাকা বলল, মা, বাবাকে এই সেভিল্লায় আনা হয়েছে।

—তাহলে এই বাড়িটাও তল্লাশি করা হবে। মা বললেন।

—হ্যাঁ। এসব তল্লাশি খোঁজখবরের পর হয়তো রাজা ফার্নান্দো বাবাকে মুক্তি দেবেন। বারাকা বলল।

—হ্যাঁ, এখন শুধু অপেক্ষা করে থাকা। মা বললেন।

ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বারাকা বলল, মা, এর নাম ফ্রান্সিস। আমার বন্ধু। মা একটু শুকনো হাসি হেসে ফ্রান্সিসের দিকে তাকালেন। ফ্রান্সিস মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল। মা বললে, আমার যা মনের অবস্থা, মানে, তোমার সঙ্গে—কথা বল মানে—

ঠিক আছে, ফ্রান্সিস বলে উঠল, পরে কথা হবে।

দু'জনে বারাকার ঘরে এল। বারাকা একটা আবলুশ কাঠের গদিওয়ালা চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসো। তখনই বারাকার বোন মোমবাতি হাতে ঘরে ঢুকল। একটা ছ' কোনা টেবিলের ওপর রুপোর বাতিদানে মোমবাতিটা রেখে বলল, দাদা, বাবার মুক্তির ব্যবস্থা কী করবি?

—দেখি। বারাকা বলল। বারাকার বোন চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, যা বুঝতে পারছি, তোমার বাবাকে আর আমার বন্ধুদের কাল সকালেই ফার্নান্দোর সামনে হাজির করানো হবে। ওদের কথা শোনার পরেই আমি রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সেটা কী করে হবে বুঝতে পারছি না।

বারাকা বলল, সে ব্যবস্থা করা যাবে। রাজদরবারের নাজির আমার খুবই

পরিচিত। একটা স্বর্ণমুদ্রা দিলেই সে রাজার সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দেবে।

—কিন্তু আমার কাছে তো স্বর্ণমুদ্রা নেই। ফ্রান্সিস বলল।

—সে আমি দেব'খন। বারাকা বলল।

—তাহলে এখুনি চল। নাজিরকে কাল সকালে হয়তো পাবো না। ফ্রান্সিস বলল।

—চলো তাহলে। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নিই। সারাদিন তুমি না খেয়ে আছ। বলে বারাকা বোনকে ডেকে তাদের খাবার দিতে বলল।

খাওয়া শেষ করে ফ্রান্সিস বলল, আচ্ছা বারাকা, তোমার একটা পোশাক দাও তো। দেখি আমাব গায়ে ঠিক লাগে কিনা।

—বেশ তো। বারাকা আলমারি খুলে ফ্রান্সিসকে ঢোলাহাতা পোশাক দিল। ফ্রান্সিস নিজের পোশাকের ওপরেই পরল সেটা। মোটামুটি লেগে গেল।

দু'জনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তার এখানে-ওখানে মশাল জ্বলছে। সেসবের আলো রাস্তায় যতটা পড়েছে তাই দেখে চলল দু'জনে।

নাজিরের বাড়িতে এল ওরা। নাজিরের মূর চাকর দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের বাইরের ঘরে বসাল।

একটু পরেই নাজির এল। নাজিরের সাদা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় পাতলা কাপড়ের টুপিমতো। তিনি গদি-আঁটা চেয়ারে বসতেই ফ্রান্সিস বলল, আমি যাতে রাজা ফার্নান্দোর সঙ্গে কথা বলতে পারি, আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থাটা করে দেবেন? নাজির রাজী হলো। বারাকার স্বর্ণমুদ্রাও নিল। ফ্রান্সিসের পোশাক দেখে বুঝল ফ্রান্সিস এখানকারই লোক।

পরদিন সকালে দলপতি কয়েদখানায় এল। হ্যারিদের বলল, তোমরা কয়েকজন এসো। বারাকার বাবাকেও আসতে বলল।

হ্যারি, মারিয়া আর বিস্কো চলল রাজপ্রাসাদের দিকে। বারাকার বাবাও চললেন। দু'পাশে দু'দল সৈন্যও চলল।

রাজদরবারে তখন অমাত্যরা বসেছেন। নাজির বিচারের ব্যাপারটা লিখবে বলে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে। হ্যারিরা এসে দাঁড়াল।

একটু পরেই রাজা ফার্নান্দো দরবারে এলেন। নাজির প্রথমে বারাকার বাবাকে ডাকল। রাজা ফার্নান্দো বললেন, খলিফা ইবন আমীরের গোপন ধনভাণ্ডারের হদিস নিশ্চয়ই আপনাদের পরিবারের কোনো কিছুর মধ্যে আছে। আপনাদের সেভিল্লর বাড়ি তল্লাশি করতে হবে। আরো কিছু জায়গা দেখতে হবে। এখনও বন্দী থাকতে হবে।

এবার দলপতি হ্যারিদের নিয়ে এগিয়ে এল। দলপতি মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে হ্যারিদের গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করল। হ্যারির দিকে তাকিয়ে রাজা ফার্নান্দো বললেন, এই অভিযোগের উত্তরে তোমরা কী বলতে

চাও বলো।

হ্যারি এগিয়ে এল। মাথা একটু নুইয়ে সম্মান জানাল। বলল, মাননীয় রাজা, আমরা ক্যামেরিনাল বন্দর শহরে আমাদের জাহাজ থামিয়েছিলাম জল, খাদ্য সংগ্রহের জন্যে। শুনেছিলাম ঐ অঞ্চলের রাজা গার্সিয়া। এর বেশি আর কিছুই আমরা জানি না।

—ঠিক আছে, হুয়েনভা বন্দর শহরে লোক পাঠানো হবে। খোঁজ নেওয়া হবে আমার ভাই রাজা গার্সিয়া তোমাদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে পাঠিয়েছিল কিনা। এখন কয়েদঘরে থাকতে হবে। রাজা বললেন।

এবার হ্যারি মৃদুস্বরে বলল, রাজকুমারী, আপনাকে রাজঅন্তঃপুরে রাখার কথা বলি?

মারিয়া মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকবো।

হ্যারি বলল, দোহাই, আমার ব্যবস্থাটা মেনে নিন। আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের বিপদের শেষ থাকবে না। অনুরোধ করছি, যা বলছি শুনুন।

রাজা ফার্নান্দো বললেন, তোমাদের আর কিছু বলার আছে?

হ্যারি মারিয়াকে দেখিয়ে বলল, ইনি আমাদের দেশের রাজকুমারী। কয়েদঘরের কষ্টকর জীবন ইনি সহ্য করতে পারবেন না। বিনীত প্রার্থনা, রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে রাখা হোক।

রাজা ফার্নান্দো দলপতির দিকে তাকালেন। বললেন, এই রাজকুমারীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। পরিচারিকাদের বলো এঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতে।

দলনেতা মারিয়ার কাছে এসে বলল, আমার সঙ্গে আসুন।

ঠিক তখনই নাজির ফ্রান্সিসকে নাম ধরে ডাকল। মারিয়া চমকে পেছন ফিরে তাকাল। হ্যারি, বিস্কোও তাকাল এদেশের পোশাক পরা ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে তাদের দেশীয় ভাষায় বলল, আমাকে চেনো না, সবাই স্বাভাবিক থাকো। ভয় নেই।

রাজা ফার্নান্দো ফ্রান্সিসকে বললেন, বলো, তোমার কী বলার আছে।

ফ্রান্সিস একটু মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে বলল, মহামান্য রাজা, আমি শুনেছি যে একশো বছর আগে খলিফা ইবন আবি আমীর এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। এক যুদ্ধে যাবার সময় বা তারও আগে তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি তিনি যে কোথায় লুকিয়ে রাখেন তা কাউকে বলে জাননি। তাঁর গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিশ্চয়ই তারপর কোনো কোনো রাজা খুঁজেছিলেন। কিন্তু কেউই তার হদিস পাননি।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছো। রাজা বললেন।

—এখন মাননীয় রাজা আমাকে যদি কিছুদিন সময় দেন তাহলে সবরকম খোঁজখবর করে আমি ঐ গুপ্ত ধনভাণ্ডার উদ্ধারের চেষ্টা করব। ফ্রান্সিস বলল।

—তুমি কি জানো আমিও খোঁজখবর চালাচ্ছি? রাজা বললেন।

—জানি মান্যবর রাজা। শুধু আমাকে একবার সুযোগ দিন, এই অনুরোধ।

—বেশ। রাজা ফার্নান্দো বললেন।

ফ্রান্সিস বলল, আর একটা অনুরোধ আমাদের স্বাধীন চলাফেরায় কেউ যেন বাধা না দেয়।

—বেশ, তোমাকে রাজপাঞ্জা দেওয়া হবে। রাজা বললেন।

দলপতি হ্যারিদের নিয়ে চলে গেল। ফ্রান্সিস বারাকার সঙ্গে প্রাসাদের বাইরে এল। চলল তার বাড়ির দিকে। পথে কিছুটা যেতেই ফ্রান্সিস দেখল পেছনে ঘোড়ায় চড়ে দলনেতা আসছে। দলনেতা ফ্রান্সিসদের সামনে এসে ঘোড়া থামাল। কোমর থেকে গোলমতো একটা পিতলের চাকতি বের করে বারাকার হাতে দিল। বলল, রাজা তোমাদের এই রাজপাঞ্জা দিয়েছেন। দলনেতা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না। এখনই কারডোভা চলো। আজকে থেকেই কাজে নামবো।

—বেশ, চলো। বারাকা বলল।

—কারডোভা কি খুব বেশি দূরে? ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—তা একটু দূরে বৈকি। তবে আমাদের আস্তাবল থেকে দুটো ঘোড়া নেব।

—তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। ফ্রান্সিস বলল।

বারাকা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল, ঘোড়া তৈরি। চলো।

বারাকাদের বাড়ির বাইরে দু'জনে এল। দেখল একজন সহিস দুটো ঘোড়া নিয়ে এসেছে।

দু'জনে ঘোড়ায় উঠল। বারাকা আর ফ্রান্সিস চলল কারডোভার দিকে।

বিকেল নাগাদ দু'জনে কারডোভা পৌঁছল। কারডোভা একসময় রাজধানী ছিল। কাজেই রাস্তার দু'পাশে অনেক বাড়িঘর। যথেষ্ট লোকবসতি এখানে। রাস্তায় বেশ ভিড়। ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, আমার শহরটা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি খলিফা ইবন আমীরের তৈরি নতুন রাজপ্রাসাদে, তারপর পুরনো রাজপ্রাসাদে নিয়ে চলো।

বারাকা প্রথমে নতুন রাজপ্রাসাদে এল। ঘোড়া থেকে নামল দু'জনে। একটা প্রান্তরের মধ্যে পাথরের প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদটি। প্রাচীরটার অনেক জায়গাতেই ভাঙন ধরেছে।

দু'জনে প্রধান ফটকে এল। প্রহরীরা ওদের আটকাল। বারাকা রাজপাঞ্জা দেখাল। প্রহরীরা সরে দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকল দুজনে। কিছুটা পাথর-বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে প্রাসাদ। ওটা পার হতে হতে বারাকা বলল, এখানে আলতোয়াইফ থাকেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে হবে।

প্রাসাদে প্রবেশের দরজার কাছে দ্বারীরা পাহারায় রয়েছে। তাদের রাজপাঞ্জা দেখিয়ে বারাকা বলল, আলতোয়াইফের সঙ্গে দেখা করবো। তাঁকে খবর দাও।

একজন দ্বাররক্ষী প্রাসাদে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল, আসুন আপনারা। সদর দরজার পরেই একটা পাথরের ঘর। ঘরের মাঝখানে শ্বেত-

পাথরের গোল টেবিল। আবলুশ কাঠের গদি-আঁটা চেয়ার টেবিল ঘিরে। ফ্রান্সিসরা বসল।

একটু পরেই ঢোলাহাতা দামী কাপড়ের জোব্বা পরা আলতোয়াইফ ঢুকলেন। ফ্রান্সিসরা উঠে দাঁড়াল। নিজে বসে ফ্রান্সিসদের বসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিসরা বসল।

বারাকা বলল, ফ্রান্সিস, তোমার যা বলার বলো।

ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় মহাশয়, খলিফা ইবন আবি আমীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিপুল ধনভাণ্ডারের কোনো হদিস কাউকে দিয়ে যাননি। আমরা সেই গোপন ধনভাণ্ডার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি। এই প্রাসাদেই খলিফা মৃত্যুর পূর্বে ছিলেন। কাজেই এই প্রাসাদের কোথাও খলিফা কোনো চিহ্ন বা নকশা রেখে গেছেন কিনা সেটাই আমরা খুঁজে দেখতে এসেছি। এজন্যে আপনার সাহায্য চাই।

—অন্দরমহল বাদে আপনারা সারা প্রাসাদই খুঁজে দেখতে পারেন। তবে শুনেছি খলিফার ধনসম্পদ অনেকেই খুঁজেছে। কেউ হদিস করতে পারেনি। আলতোয়াইফ বললেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অন্দরের দিকে চলে গেলেন।

ফ্রান্সিস আর বারাকা এবার প্রাসাদের ঘরগুলো দেখতে লাগল। কোনো ঘরে অস্ত্রশস্ত্র রাখা, কোনো ঘরে বেশ কয়েকটা লোহার সিন্দুক রাখা। প্রায় একশো বছর আগে তৈরি প্রাসাদের বেশ কয়েকটা ঘর এখন ভঙা পাথরের স্তূপ। সেখানে ফ্রান্সিস পাথরের স্তূপের পাথর তুলে সরাতে লাগল। বারাকাও হাত লাগাল। পাথরের স্তূপ সরিয়ে ওরা দেখল গোপন জায়গা বলে কিছু নেই।

আর একবার সব দেখেশুনে দু'জনে বাইরের ঘরে এসে বসল। ফ্রান্সিস বলল, বুঝেছো বারাকা, এই প্রাসাদে গোপনীয় জায়গা বলতে কিছু পাওয়া গেল না। লোহার সিন্দুক যে ক'টা আছে সবই খোলা হয়েছে। কাঠের আলমারিগুলোও দেখা হয়েছে। এবার পুরনো প্রাসাদে চলো।

ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে পুরনো প্রাসাদে এল। এখন নামেই প্রাসাদ। কয়েকটা পাথরের থাম শুধু দাঁড়িয়ে আছে। আর সব জায়গাতেই পাথরের স্তূপ।

ঘোড়া থেকে নেমে এল দু'জন। ফ্রান্সিস পাথরের পাটা ছড়ানো জায়গায় এদিক-ওদিক লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। বোঝা গেল ধ্বংসের হাত থেকে কোনো ঘর বাঁচেনি। স্তূপের আকারে পাথরের পাটা ছড়িয়ে থাকায় বোঝাও যাচ্ছে না কোথায় কোথায় ঘর ছিল। সে-সব ঘর দেখতে গেলে আগে সব পাথরের পাটার স্তূপ সরাতে হবে। তার জন্য লোক চাই অন্তত পঞ্চাশ জন। তবেই পাথরের স্তূপ সরানো সম্ভব।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়েছে তখন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাবে না। দু'জনে ঘোড়ায় উঠল। ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, এবার রাতের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

বারাকা জানাল, আমার জানাশুনো একটা সরাইখানা আছে বাজার এলাকায়। সেখানে চলো।

ফ্রান্সিস বলল, তার আগে আতোয়াইফের সঙ্গে দেখা করে আসি চলো।

ওরা নতুন প্রাসাদে এল। ভেতরে দ্বাররক্ষীদের একজনকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে ফ্রান্সিসরা বাইরের ঘরে বসল। একটু পরে আলতোয়াইফ এলেন। ফ্রান্সিস বলল, মাননীয় মহাশয়, আপনার কাছে একটু সাহায্য চাই।

—বলো কী সাহায্য চাও।

—এখানে কি বন্দীশালা আছে? ফ্রান্সিস বলল।

—হ্যাঁ, একটা ছোট কয়েদঘর আছে। সেখানে এখন কয়েকজন বন্দী আছে।

—আজ রাতেই আপনি সেভিল্লায় দূত পাঠান। রাজা ফার্নান্দোকে অনুরোধ করুন কাল সকালে যেন সেভিল্লার বন্দীশালা থেকে জনা পঞ্চাশেক বন্দী এখানে পাঠিয়ে দেন।

—কেন বলো তো?

—এখানে পুরনো প্রাসাদের ধ্বংস্তূপ সরাতে হবে। ধ্বংসস্তূপ সরাতে পারলে মেঝেগুলো দেখে মোটামুটি আন্দাজ করা যাবে কোথায় কোথায় ঘর ছিল। এটা জানা খুবই দরকার।

—বেশ, লোক পাঠাচ্ছি। আলতোয়াইফ বললেন।

ঘোড়া চালিয়ে দু'জনে বারাকার জানাশুনো সরাইখানায় এল। রাতে খেয়েদেয়ে দু'জনে শুয়ে পড়ল। ফ্রান্সিসের মাথায় অনেক চিন্তা। ও ইচ্ছে করেই সেভিল্লা থেকে বন্দী বন্ধুদের এখানে আনার ব্যবস্থা করল। এখন চিন্তা গুপ্ত ধনসম্পদ ঐ ভাঙা প্রাসাদে পাওয়া যাবে কিনা।

পরের দিন একটু বেলাতেই ফ্রান্সিসের ঘুম ভাঙল। দেখল বারাকার ঘুম তখনও ভাঙেনি। ফ্রান্সিস ধাক্কা দিয়ে ওকে তুলল। সরাইখানায় সকালের খাবার খেয়েই ওরা ঘোড়ায় উঠল। চলল নতুন রাজপ্রাসাদের দিকে।

ফ্রান্সিস দূর থেকেই দেখল প্রাসাদের সামনের প্রান্তরে কিছু লোক বসে-দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু এগিয়ে এসে পোশাক দেখেই ফ্রান্সিস বুঝল হ্যারিদের আনা হয়েছে। ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, এই বন্দীদের মধ্যে তোমার বাবা আছেন?

না। বারাকা বলল।

ফ্রান্সিস বুঝল হঠাৎ হ্যারিদের সামনে হাজির হলে ওরা চমকে উঠবে। হৈ হৈ করবে। সেটা এই মুহূর্তে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ও তাই বারাকাকে বলল, বারাকা, তুমি ঐ বন্দীদের সমানে যাও। বলবে, এদেশীয় একজন লোক নাম ফ্রান্সিস, তোমাদের কিছু কাজের কথা বলবে। তোমরা চুপ করে শুনবে।

বারাকা হ্যারিদের সামনে এসে ফ্রান্সিসের শেখানো কথাগুলো বলল। ফ্রান্সিস ঘোড়ায় চড়ে হ্যারিদের সামনে আসার সময় বেশ জোরে ওদের দেশীয় ভাষায় বলল, মনে রাখবে তোমরা কেউ আমাকে চেনো না।

হ্যারি গলা চড়িয়ে বলল, সবাই চুপ। কোনো কথা নয়।

ফ্রান্সিস এবার বলতে লাগল, এখান থেকে কিছুদূরে-কারডোভা। ওখানে একটা

পুরনো রাজপ্রাসাদ আছে। এখন পাথরের স্তূপ। সেই পাথরের স্তূপ সরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এই তোমাদের কাজ। সকালের খাবার খেয়ে আমরা কারডোভা যাবো।

সকালের খাবারের ব্যবস্থা দেখছিল দলপতি। ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, যে ক'টা বেলচা যোগাড় করতে পার, নিয়ে এসো। সকালের খাবার খেয়ে সবাই তৈরি হলো।

সকলের সামনে চলল ঘোড়ায় চড়ে দলপতি। বন্দীদের দু'পাশে প্রায় জনা দশেক অশ্বারহী সৈন্য। হঠাৎ ফ্রান্সিস হ্যারির সামনে এসে ঘোড়া থামাল। নিজে দ্রুত নেমে এসে হ্যারিকে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে। ফ্রান্সিস চুপ করে থাকতে বলেছে তাই হ্যারিও কোনো কথা বলল না। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাল। ফ্রান্সিস সবার পেছনে হাঁটতে লাগল।

একটু বেলায় সবাই ভাঙা প্রাসাদের সামনে এল। ফ্রান্সিস দলপতিকে বলল, সকলের হাতের বাঁধন খুলে দিন। নইলে পাথর সরাবে কী করে! দলপতি একজন সৈন্যকে বলল সব বন্দীর হাতের বাঁধন খুলে দিতে।

ফ্রান্সিস চারদিকে নজর বোলাতে বোলাতে দেখল ভাঙা স্তূপের পরে বেশ বড় একটা গর্ত মতো। বোঝা গেল এখানে একটা জলাশয় ছিল। এখন শুকনো। ঐ জায়গাটা দেখিয়ে ফ্রান্সিস চিৎকার করে বলল, পাথরের আস্ত বা ভাঙা পাটাগুলো এই গর্তটায় ফেল। সবাই কাজ শুরু কর। ততক্ষণে বারাকা পাঁচটা বেলচা নিয়ে এসেছে।

সব বন্দীরা কাজে নামল। পাঁচজনকে বেলচা দেওয়া হলো। ওরা ভাঙা পাথরের টুকরো একটা জায়গায় জড়ো করতে লাগল। বাকিরা হাত লাগাল পাথরের পাটা সরাতে। ফ্রান্সিস আর বারাকাও কাজে নামল। চলল পাথর ঠোকাঠুকির শব্দ। এলাকার কৌতূহলী লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। চারদিকে অশ্বারোহী সৈন্যরা নজর রাখতে লাগল যাতে কোনো বন্দী পালাতে না পারে।

সূর্য মাথার ওপরে। চড়া রোদের মধ্যে বন্দীরা কাজ করতে লাগল। এবার ফ্রান্সিস দলপতির কাছে এসে বলল, এদের দুপুরের খাবার তো দিতে হয়।

দলপতি বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। একটু পরেই খাবার নিয়ে এখানকার কয়েদঘরের প্রহরীরা আসবে।

যাক! নিশ্চিত হলাম। ফ্রান্সিস বলল।

দলপতি এবার একটু হেসে বলল, রাজা ফার্নান্দো হুকুম দিয়েছেন গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারে তোমাকে যেন সবসময় সাহায্য করা হয়।

ভালো, তবে এতে দায়িত্বটা বেড়ে গেল। ফ্রান্সিস বলল।

একটু পরেই কয়েকজন প্রহরী খাবার নিয়ে এল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে বন্দীরা সবাই পাশের প্রান্তরে খেতে বসে গেল। ফ্রান্সিস, বারাকা, দলনেতা, সৈন্যরাও খেতে বসল। লম্বাটে পাতায় গোল করে কাটা রুটি, আনাজের ঝোল, পাখির মাংসে

খেতে দেওয়া হলো।

খাওয়াদাওয়ার পর শুরু হলো পাথর সরানোর কাজ।

বিকেল হলো। ফ্রান্সিস সব ঘুরে ঘরে দেখতে লাগল। ভাঙা দেয়ালের অংশ, পাথরের চৌকোনা মেঝে দেখে বুঝল ঘরগুলো কোথায় ছিল। ফ্রান্সিসের উদ্দেশ্য ছিল—রাজকোষাগার খুঁজে বের করা। দেখল অর্ধেকেরও বেশি জায়গা থেকে পাথর সরানো হয়েছে। কালকের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন ঘরগুলোর মেঝে দেখে আন্দাজ করা যাবে কোথায় কোথায় ঘর ছিল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, আজকের মতো এখানেই কাজ শেষ। সবাই বসে জিরিয়ে নাও।

সন্ধের আগেই সবাই ফিরে চলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিল। নিজে আর সব বন্দীর সঙ্গে হেঁটে চলল।

দলপতি সব বন্দীকে নিয়ে চলল ওখানকার কয়েদঘরটার দিকে। ফ্রান্সিস আর বারাকা সরাইখানায় ফিরে এল।

পরদিন আবার পাথর সরানোর কাজ চলল। দুপুরে খাবার খেতে বন্দীরা কাজ থামাল। তারপর আবার শুরু হলো কাজ—পাথর ঠোকাঠুকির শব্দ।

বিকেলের আগেই পাথরের স্তূপ সরানো শেষ হলো। ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, এবার সবাই বিশ্রাম কর। বন্দীরা যে যেখানে পারল বসে পড়ল। বিশ্রাম করতে লাগল।

ফ্রান্সিস ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখতে লাগল। প্রথমে দেখল বড় ঘরটা। বোঝা গেল এটাই ছিল রাজদরবার। অন্য ঘরগুলোও দেখল। কোনটা মন্ত্রণাকক্ষ, কোনটা অস্ত্রশস্ত্র রাখার ঘর, অন্তঃপুরের ঘর কোনগুলো তাও বুঝে নিল। দু'কোণায় দুটো ঘরের কোনটা মহাফেজখানা কোনটা রাজকোষাগার সেটা বুঝতে পারল না।

আলো কমে এসেছে। ফ্রান্সিস উঠে এল। এখন ভালো করে দেখা যাবে না।

বন্দীদের নিয়ে সবাই চলল। ফ্রান্সিস হ্যারিকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিজে হেঁটে চলল পাশে পাশে। হ্যারি মৃদুস্বরে ওদের দেশের ভাষায় বলল, ফ্রান্সিস, তুমি যা খুঁজছো তার কিছু হদিস পেয়েছো?

ফ্রান্সিসও গলা নামিয়ে বলল, বলতে পারো সাফল্যের দোরগোড়ায়।

এখানকার কয়েদঘরটা এত ছোট যে আমরা ভালো করে ঘুমুতে পারছি না।

আজকের রাতটা কোনোরকমে কষ্ট করে থাকো। কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে। ফ্রান্সিস বলল। সেইদিন রাতেই হ্যারিদের সেভিল্লা নিয়ে যাওয়া হল। কয়েদঘরে রাখা হল।

পরের দিন সকালেই ফ্রান্সিস আর বারাকা ঘোড়া ছুটিয়ে ভাঙা প্রাসাদে এল।

ফ্রান্সিস পাথরে ভর রেখে নিচে নেমে এল। দুকোনার ঘর দুটোর মেঝে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল কোন ঘরটা ছিল রাজকোষাগার। হিসেব করতে গিয়ে দেখল পুবকোনার ঘরটাই প্রধান প্রবেশপথ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে।

তাহলে এটাই ছিল রাজকোষাগার।

ফ্রান্সিস ভাঙা ঘরের পাথরের মেঝেয় পায়চারি করতে লাগল। ভাবতে লাগল এই ঘরেই একশো বছর আগে ইবন আবি আমীর তাঁর অর্থসম্পদ রাখতেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেসব কোথায় রেখে যান তা কাউকে জানিয়ে যেতে পারেননি। নাকি ইচ্ছে করেই জানাননি!

ফ্রান্সিস পায়চারি করছে। হঠাৎ মনে হলো একটা পাথরের পাটা কেমন নড়ে উঠল। ফ্রান্সিস এবার আস্তে হাঁটতে লাগল। নড়ে-ওঠা পাটার ওপর দাঁড়াল। পায়ের চাপ এদিক-ওদিক করল। বুঝল পাটাটা নড়ছে। হিসেব করে দেখল—ঠিক মেঝের মাঝখানের পাটাটা নড়ছে। পাশের পাটাটায় পায়ের চাপ দিল। ওটাও নড়ছে। তবে পাশেরটার চেয়ে কম। ফ্রান্সিস বারাকাকে ডেকে বলল, দ্যাখো তো এই দুটো পাটা নড়ছে কিনা। বারাকা এসে দাঁড়াল ঐ দুটো পাটারে ওপর। পা চাপল। তারপর বলল, সত্যি দুটো নড়ছে। একটা বেশি, অন্যটা কম।

ফ্রান্সিস বলল, বারাকা, এই দুটো পাটাই কুড়ুল চালিয়ে তুলতে হবে। তুমি যে ক'টা কুড়ুল পাও নিয়ে এসো। কয়েকজন শক্তসমর্থ লোকও নিয়ে এসো। বলবে এখানে একটা কাজ করতে হবে। বদলে মজুরি পাবে।

বারাকা খাদ থেকে উঠে চলে গেল। ফ্রান্সিস ভালো করে নড়া পাটা দুটো দেখতে লাগল। পাটা দুটো বারবার নড়িয়ে বুঝল দুটো পাটাই পরে বসানো হয়েছে। এটা করা হয়েছে গোপনে একটা কিছু রাখার জন্যে।

বারাকা ফিরে এল। সঙ্গে কুড়ুল হাতে পাঁচটি যুবককেও নিয়ে এসেছে। ফ্রান্সিস ঐ যুবকদের পাথরের পাটাটা তুলতে বলল। দু'-তিনজন মিলে পাটা দুটো নাড়িয়ে নাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করল। পারল না। ফ্রান্সিস বলল, কুড়ুলের ঘা মেরে পাটা দুটো ভাঙো। তারপর টুকরোগুলো সরিয়ে ফেল। পাঁচ জনে পরপর কুড়ুলের ঘা মারল। পাথরের পাটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল। ওরা টুকরোগুলো সরালো। ফ্রান্সিস হাঁটু গেড়ে বসে দেখল লোহার পাত মতো। যুবকদের বলল, অন্য পাটাটাও ভাঙো। যুবকদের আরো দুটো পাটা কুড়ুল মেরে ভাঙাল। ভাঙা পাথরগুলো তুলে সরিয়ে রাখল। এবার ফ্রান্সিস লোহার জিনিসটা পুরো দেখতে পেল। বুঝল এটা একটা লোহার সিন্দুক। যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা সিন্দুকটা তুলে আনো। ওরা আরো কয়েকটা পাটা ভেঙে গর্তটা বড় করল। তারপর সবাই হাত লাগিয়ে সিন্দুকটা আস্তে আস্তে তুলে এনে মেঝেয় রাখল।

ফ্রান্সিস ঝুঁকে পড়ে সিন্দুকটা দেখতে লাগল। সিন্দুকটা সাধারণ সিন্দুকের মতোই। রঙটা কালো। সিন্দুকটার সামনে-পেছনে দেখতে একই রকম। দু'পাশেই দুটো হাতল আছে। ফ্রান্সিস বুঝল সাধারণ সিন্দুকের মতো দেখতে হলেও এই সিন্দুকটা নির্দেশমতো তৈরি হয়েছে। সিন্দুকটার সামনে বা পেছনে কোথাও চাবির ফুটো নেই। ফ্রান্সিস বেশ আশ্চর্য হলো। বুঝল এই সিন্দুকে মূল্যবান কিছু নিশ্চয়ই আছে। তাই এই ব্যবস্থা।

ফ্রান্সিস যুবকদের দু'ভাগে ভাগ করল। নিজে আর বারাকাও হাত লাগাল। দু'দলে ভাগ হয়ে ফ্রান্সিসরা দু'দিকের হাতল ধরে প্রচণ্ড জোরে টানল। সিন্দুকের ডালা খুলল না। এরকম কয়েকবারই টানা হলো। কিন্তু সিন্দুকের ডালা খুলল না।

ফ্রান্সিস মেঝেয় বসে পড়ল। সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল বিশেষভাবে তৈরি সিন্দুকটা যাতে খোলা না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই কীভাবে সিন্দুকটা খুলবে সেটা আগে বুঝতে হবে।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। বারাকা বলল, ফ্রান্সিস, এবার খেতে চলো।

ফ্রান্সিস চিন্তিতস্বরে বলল, আমি খাবো না তুমি আর ঐ যুবকরা খেয়ে এসো।

—তুমিও এসো। উপবাসে থাকলে তোমার কষ্ট হবে। বারাকা বলল।

—আমার অভ্যেস আছে। তোমরা যাও।

বারাকারা খেতে চলে গেল।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার পাশে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ লক্ষ্য করল একদিকের ডালার ধারে ওপর থেকে নিচে একটা লোহার পাত বসানো। ভালো করে দেখে বুঝল পাতটা পরে বসানো হয়েছে। সিন্দুকের অন্যদিকে এরকম পাত বসানো নেই। ফ্রান্সিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই লোহার পাতটা দেখতে লাগল। বুঝল ছেনি-হাতুড়ি হলে লোহার লম্বা পাতটা খুলে ফেলা যাবে।

বারাকা আর যুবকরা ফিরে এল। ফ্রান্সিস যুবকদের বলল, ছেনি-হাতুড়ি আনতে পারবে কেউ?

একটি যুবক বলল, আমি আনতে পারবো।

ফ্রান্সিস বলল, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। এতক্ষণে ফ্রান্সিস খাদের ওপরের দিকে তাকাল। দেখল খাদ ঘিরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। ওরা দেখছে ফ্রান্সিস কী করছে।

যুবকটি ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে এলে ফ্রান্সিস লোহার পাতের খাঁজে ছেনি বসিয়ে হাতুড়ি চালাল। আশ্চর্য! একটা ঘা পড়তেই লোহার লম্বাটে পাতটা নড়ে গেল। এতক্ষণে ফ্রান্সিস হাসল। বারাকার দিকে তাকিয়ে বলল, বারাকা, আমার অনুমান সত্যি হতে চলেছে। লোহার লম্বা পাতটা উঠে এলেই সিন্দুকের রহস্যটা বোঝা যাবে।

ফ্রান্সিস আবার হাতুড়ি চালাল। লোহার লম্বা পাতটা আরো খুলল। পরপর দু'-তিনটে হাতুড়ির ঘায়ে লোহার পাতটা উঠে এল। দেখা গেল একটা রুপোর চাবি সিন্দুকের গায়ে আটকানো। তার নিচেই একটা চাবির ফুটো। ফ্রান্সিস চাবিটা খুলে নিল। তারপর ফুটোয় চাবিটা ঢোকাল। ডান দিকে চাপ দিয়ে ঘোরাতেই কট করে একটা শব্দ হলো। সিন্দুকের ডালা খুলে গেল। ডালাটা আটকাবার আগেই চারটে স্বর্ণমুদ্রা পাথরের মেঝেয় পড়ল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে ডালাটা সজোরে চেপে বন্ধ করল। যাতে আর কিছু দামী জিনিস বেরিয়ে না আসে। চাবি ঘুরিয়ে ডালা বন্ধ করে সে চারটে সোনার চাকতি কোমরে গুঁজল। খাদের ওপরে তাকিয়ে দেখল

অনেক লোক জমে গেছে। দু'-তিনজন লোক ফ্রান্সিসের কাছে এল। একজন বলল, সিন্দুক থেকে সোনার চাকতি পড়ল দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গীরাও বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরাও দেখেছি।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাই, ওগুলো স্বর্ণমুদ্রা। আমার কোমরের ফেট্টি থেকে কী করে খুলে পড়ে গেছে। তোমরা সেই স্বর্ণমুদ্রাই দেখেছো। ওরা ঠিক বিশ্বাস করল না। তবে এই সোনার চাকতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল। চারপাশের কিছু লোক এগিয়ে এল। জটলা চলল। ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে ডাকল, বারাকা, কাছে এসো। বারাকা কাছে এল। ফ্রান্সিস চাপা গলায় বলল, তুমি ঘোড়ায় চড়ে এক্ষুণি আলতোয়াইফের কাছে যাও। বলবে, আমরা আমীরের গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি। উনি যত শীঘ্র সম্ভব একদল সৈন্য নিয়ে যেন এখানে আসেন। যাও—জলদি।

ফ্রান্সিস সিন্দুকটার পাশে মেঝেয় বসে পড়ল। চাবিটা সিন্দুকের নিচে ঠেলে দিল। যে ভয়টা ফ্রান্সিস করছিল, এখন ঘটনা সেদিকেই মোড় নিল। সিন্দুকটা থেকে সোনার চাকতি বেরিয়েছে—খবরটা দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চার পাঁচ জনের একটি দল খাদে নেমে ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়াল। একজন বলল, আমরা দেখছি তুমি চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলেছিলে।

ফ্রান্সিস হেসে বলল, ভুল দেখেছিলে, চাবিটা লাগেইনি।

অন্যজন বলল, আমরা দেখেছি সিন্দুক থেকে সোনার চাকতি গড়িয়ে পড়েছে।

ফ্রান্সিস আবার হেসে বলল, ভুল দেখেছো। আমার কোমরের ফেট্টি থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পড়ে গিয়েছিল।

আর একজন বলল, তুমি চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলেছিলে?

না, সেই চাবিতে সিন্দুক খোলেনি। ফ্রান্সিস বলল।

আর একজন চড়া গলায় বলল, ঠিক আছে, তুমি চাবিটা দাও, আমরা দেখবো সেই চাবিতে সিন্দুক খোলে কিনা।

ফ্রান্সিস এরকম কিছু আগেই আন্দাজ করেছিল। হেসে বলল, সেই চাবি তো আমার কাছে নেই। এখানকার আলতোয়াইফের কাছে লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

চড়া মেজাজের লোকটি বলল, না। তুমি মিথ্যে কথা বলছো। চাবিটা তোমার কাছেই আছে।

ফ্রান্সিস দু' হাত তুলে হেসে বলল, ঠিক আছে, আমাকে তল্লাশি কর।

চড়া মেজাজের লোকটি এগিয়ে এল। ফ্রান্সিসের পোশাক, কোমর সব দেখল। চাবি পাওয়া গেল না। ফ্রান্সিস আগেই ভেবেছিল জড়ো হওয়া লোকগুলো যদি চাবি পেয়ে সিন্দুক খোলে, সব ধনভাণ্ডার অল্পক্ষণের মধ্যেই লুঠ হয়ে যাবে। নিরস্ত্র ফ্রান্সিস কিছুই করতে পারবে না।

ফ্রান্সিস বারবার রাস্তার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আলতোয়াইফ আসছেন

না। এবার দলে দলে লোকজন খাদে নেমে আসতে লাগল। সিন্দুকটার গায়ে হাত দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ফ্রান্সিস কাউকে বাধা দিল না। বাধা দিলে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে, নিশ্চয়ই সিন্দুকের মধ্যে দামী কিছু আছে।

ফ্রান্সিস তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। হঠাৎ দেখল ধূলো উড়ছে। অশ্বারোহী সৈন্যদল আসছে। সামনে আলতোয়াইফ আর বারাকা।

সবাই খাদের কাছে এসে থামল। আলতোয়াইফ খাদে নেমে ফ্রান্সিসের কাছে এলেন। সিন্দুকটা দেখিয়ে বললেন, এটাতে কি গুপ্তধন আছে?

ফ্রান্সিস বলল, ঠিক বলতে পারবো না। সিন্দুকটা আপনার প্রাসাদে গিয়ে খুলতে হবে। তখন দেখা যাবে এই সিন্দুকেই গুপ্তধন রাখা হয়েছিল কিনা।

—আমার মনে হয় এই সিন্দুকের মধ্যে কিছু পুরনো দলিল-দস্তাবেজ আছে। আলতোয়াইফ বললেন।

—তাও হতে পারে। ফ্রান্সিস বলল।

আলতোয়াইফ সৈন্যদের দলনেতাকে ডাকলেন। সে কাছে এলে বললেন, একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি যোগাড় কর। এই সিন্দুকটা গাড়িতে তুলে আমার প্রাসাদে নিয়ে এসো। সিন্দুকটা মহাফেজখানায় রাখবে।

আলতোয়াইফ এসে ঘোড়ায় উঠলেন। ফ্রান্সিসরাও এসে ঘোড়ায় উঠল। কিছু সৈন্য দলনেতার কাছে রইল, সিন্দুক গাড়িতে তুলে নিয়ে আসবে বলে।

সবাই চলল নতুন প্রাসাদের দিকে।

সন্ধের আগেই সিন্দুকটা এনে মহাফেজখানায় রাখা হলো। ফ্রান্সিস আর বারাকা প্রাসাদের বাইরের ঘরটায় বসেছিল। সিন্দুক রাখার পর ফ্রান্সিস বারাকাকে বলল, আলতোয়াইফকে বলো আমি তাঁর সামনেই সিন্দুকটা খুলব। বারাকা একজন দ্বাররক্ষী মারফৎ এই আর্জি জানাল আলতোয়াইফকে। দ্বাররক্ষী কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, উনি তোমাদের মহাফেজখানায় যেতে বলেছেন।

ফ্রান্সিস আর বারাকা মহাফেজখানায় চলল। ফ্রান্সিস চাবিটা সিন্দুকের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল। একসময় সকলের অলক্ষ্যে চাবিটা তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে রেখেছিল।

ওরা মহাফেজখানায় এল। মশালের আলোয় দেখল আলতোয়াইফ দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্রান্সিসদের দেখে বললেন, সিন্দুক খোলার জন্যে এত তাড়াহুড়ো করছো কেন?

ফ্রান্সিস এবার কোমরের ফেট্টি থেকে চারটে সোনার চাকতি খুলে আলতোয়াইফের দিকে এগিয়ে ধরল। আলতোয়াইফ বেশ চমকে উঠলেন। ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন।

ফ্রান্সিস বলল, এই সোনার চাকতিগুলো ঐ সিন্দুক থেকেই গড়িয়ে পড়েছিল। আলতোয়াইফ সোনার চাকতি ক'টা হাতে নিলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন।

ফ্রান্সিস বলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সিন্দুকেই গোপনে রাখা হয়েছিল ইবন

আবি আমীরের ধনভাণ্ডার।

আলতোয়াইফ সায় দিয়ে বললেন, আমার এখন তাই মনে হচ্ছে। এবার সিন্দুকটা খোল তো।

ফ্রান্সিস সিন্দুকের সামনে এল।

সিন্দুকের ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাল। কিছু সোনার চাকতি নিচে ডালার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। এবার ফ্রান্সিস এক হ্যাঁচকা টানে ডালাটা খুলে ফেলল। মুঠো মুঠো সোনার চাকতি মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

মশালের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল সোনার চাকতিগুলো। সিন্দুকের নিচের তাকটায় চেপে ভরা ছিল চাকতিগুলো। এবার ওপরের তাকেও দেখা গেল হীরে, মণিমুক্তোর কত অলংকার। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল মণি-মাণিক্যগুলো। তিনজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেই দিকে।

কিছু পরে আলতোয়াইফ বললেন, সিন্দুক বন্ধ কর। ফ্রান্সিস আর বারাকা মেঝে থেকে সোনার চাকতিগুলো তুলে সিন্দুকে চেপে চেপে ভরল। তারপর ফ্রান্সিস সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে রুপোর চাবিটা আলতোয়াইফকে দিল। বলল, মাননীয় মহাশয়, কাজের সুবিধের জন্য আমি এই দেশের পোশাক পরে আছি। আসলে জাতিতে আমি ভাইকিং। আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের নিয়ে ক্যামেরিনাল বন্দর শহর হয়ে হুয়েনভা বন্দরে জাহাজ চালিয়ে এসেছিলাম। সেখানে আমাদের বন্দী করা হয়। রাজা ফার্নান্দো সন্দেহ করেছিলেন আমরা তাঁর ভাই ক্যামেরিনালের রাজা গার্সিয়ার গুপ্তচর। আমার বন্ধুদের সেভিল্লা নগরে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সিস থামল। তারপর বলল, রাজা ফার্নান্দোর অনুমতি নিয়ে আমি ইবন আমীরের গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। এবার আমার স্ত্রী আর বন্ধুদের মুক্তির ব্যবস্থা আপনি করুন।

বারাকা বলল, এই ইবন আমীরের গুপ্তধনের হদিস আমার বাবা জানেন, এই সন্দেহে আমার বাবাকেও সেভিল্লায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। আপনি তাঁরও মুক্তির ব্যবস্থা করুন।

আলতোয়াইফ বললেন, কাল ভোরে এই সিন্দুকের গুপ্ত ধনভাণ্ডার নিয়ে আমি সেভিল্লায় যাবো। রাজা ফার্নান্দোকে দেব ধনসম্পদ আর তোমাদের কথা বলবো।

পরের দিন ভোরে আলতোয়াইফের সঙ্গে ফ্রান্সিস আর বারাকা ঘোড়ায় চড়ে চলল। ঘোড়ায় টানা গাড়িতে সিন্দুকটাও নিয়ে চলল।

তখনও রাজদরবার শুরু হয়নি। আলতোয়াইফের নির্দেশে সিন্দুকটা রাজদরবারের মাঝখানে রাখা হলো।

রাজা ফার্নান্দো রাজদরবারে এলেন। সিংহাসনে বসে আলতোয়াইফকে তাঁর সামনে আসার অনুমতি দিলেন। আলতোয়াইফ সামনে এগিয়ে গিয়ে রাজাকে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা ফার্নান্দো বললেন, আপনার পাঠানো দূত মারফৎ কাল রাতেই আমি জানতে পেরেছি ইবন আবি আমীরের গুপ্ত

ধনভাণ্ডার আবিষ্কার করা হয়েছে।

আলতোয়াইফ পেছন ফিরে ফ্রান্সিসকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে দাঁড়াল। আলতোয়াইফ ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বললেন, এই যুবকটিই নিজের বুদ্ধিকৌশলে গুপ্তধন আবিষ্কার করেছে।

রাজা ফ্রান্সিসকে বললেন, বলো এর পুরস্কার হিসেবে তুমি কী চাও, এই গুপ্ত সম্পদের কিছু অংশ যদি তুমি চাও অবশ্যই তা পাবে।

ফ্রান্সিস বলল, মহামান্য রাজা, আমি অর্থসম্পদ চাই না। আমি চাই আমার স্ত্রী ও বন্ধুদের মুক্তি দেওয়া হোক। বারাকার বাবাকেও মুক্তি দেওয়া হোক।

রাজা ফার্নান্দো সেনাপতিকে ডাকলেন। কিছু আদেশও দিলেন। সেনাপতি ফ্রান্সিসের কাছে এসে বলল, আমার সঙ্গে এসো।

তখন আলতোয়াইফ সিন্দুকটা খুলছেন। রাজ-দরবারের সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সিন্দুকটার দিকে।

সেনাপতি বন্দীশালার সামনে এল। ফ্রান্সিসকে বলল, তোমার বন্ধুদেব বলো বেরিয়ে আসতে। সেনাপতির ইঙ্গিতে প্রহরীরা বন্দীশালার লোহার দরজা ঢং ঢং শব্দে খুলে দিল।

ফ্রান্সিস গলা চড়িয়ে বলল, ভাইসব, তোমরা মুক্ত। বাইরে এসো।

ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে বাইরে এল। প্রহরীরা ওদের হাতের বাঁধন কেটে দিতে লাগল। ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, ও-হো-হো।

.দেখা গেল বাজপ্রাসাদের দিক থেকে একজন পরিচারিকা মারিয়াকে নিয়ে আসছে। মারিয়ার আর তর সইছিল না। মারিয়া হাসতে হাসতে প্রান্তরটা ছুটে পার হয়ে ফ্রান্সিসদের কাছে এল। তখনও হাঁপাচ্ছে, মারিয়াকে সুস্থ দেখে ফ্রান্সিস খুশি হলো।

মারিয়া আসতেই আবার ভাইকিংদের ধ্বনি উঠল—ও-হো-হো। ফ্রান্সিস বলল —এবার হুয়েনভা চলো—আমাদের জাহাজে।